হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

২০

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

প্রকাশিকা
শ্রীমতী গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৭

লিপি বিন্যাস
এ পি সি লেজার
৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীকার্তিক কুণ্ডু ও শ্রীতরুণ কুণ্ডু
ইউনিক কলার প্রিন্টার্স
২০এ পটুয়াটোলা লেন ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
রমেন আচার্য
কলকাতা-৭০০ ০৫৯

অলংকরণ
প্রণব হাজরা

বাঁধাই
মালক্ষ্মী বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
বি/১০১বি/এইচ/২, বৈঠকখানা রোড ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা
মাঘ ১১, ১৪১২
জানুয়ারি ২৫, ২০০৬

ISBN 81-7942-021-3

দাম — ৫০.০০

সম্পাদকের নিবেদন

২০০৬ কলকাতা বইমেলায় হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর বিংশ খণ্ডটির প্রকাশ ঘটল। ঘটল নির্ধারিত কর্মসূচির ছন্দেই। কিন্তু ছন্দপতন ঘটে গেল এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানিতে। ২৫ নভেম্বর ২০০৫। চলে গেলেন সংস্থার কর্ণধার, শিশুসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মৃণাল দত্ত। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর প্রকাশ পরিকল্পনার নতুনত্বে বাংলা প্রকাশন, বিশেষত শিশুসাহিত্য প্রকাশন জগতে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন তিনি। হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর প্রকাশ যার মধ্যে অন্যতম। হেমেন্দ্রকুমারের গ্রন্থগুলির (যার মধ্যে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও রয়েছে) সংগ্রহ ও সযত্ন প্রকাশের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠক, বিশেষত হেমেন্দ্র-অনুরাগীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন মৃণালবাবু। হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডগুলির পরিকল্পনাও করে গেছেন তিনি। খণ্ডগুলির যথাযথ প্রকাশই হবে তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে দুটি উপন্যাস, একটি বড়োগল্প, একটি ঐতিহাসিক আখ্যান ও একটি গল্পগ্রন্থ রাখা হয়েছে।

জয়ন্ত-মানিকের সঙ্গে বিমল-কুমারের যৌথ অভিযান সব সময়ই পাঠকদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করে। ফিলিপাইনের উত্তরে সুলু সাগরের মধ্যে রহস্যময় ভয়াবহ সারাঙ্গানি দ্বীপে বোম্বেটে সর্দার সারাঙ্গানির রত্নগুহা আবিষ্কার-অভিযানের কাহিনি 'সুলু সাগরের ভুতুড়ে দেশ' উপন্যাসটি। 'বাঘরাজের অভিযান' উপন্যাসটি দেব সাহিত্য কুটিরের বিচিত্রা সিরিজের দ্বিতীয় বই। এই সিরিজের প্রথম বই 'গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন' ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর ঊনবিংশ খণ্ডে। এই সিরিজের পরবর্তী গ্রন্থগুলিও রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডগুলিতে রাখা হবে।

'নিতান্ত হালকা মামলা' বড়োগল্পটিতে ভূপেন দারোগার নিতান্ত 'হালকা' মামলাটি রহস্যের ভারে ক্রমেই জটিল ও ভারী হয়ে ওঠে। আবার জয়ন্ত-মানিকের তৎপরতায় খোলে সেই রহস্যের জট, প্রকৃতই সার্থকনামা হয়ে ওঠে গল্পটি। আটটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ 'ভূত আর অদ্ভুত' প্রকাশিত হয় শ্রীকালী প্রকাশনী থেকে। অধুনা দুষ্প্রাপ্য গল্পগ্রন্থটিকে সংকলনভুক্ত করা হল বর্তমান খণ্ডটিতে।

দেব সাহিত্য কুটিরের বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত 'আলেকজেন্ডার দি গ্রেট' প্রকাশিত হয় ১৩৫৭-র দোল পূর্ণিমায়। দিগ্‌বিজয়ী বীরের বর্ণময় জীবন-আখ্যানটিও অন্তর্ভুক্ত হল বর্তমান সংকলনটিতে।

বিষয়-বৈচিত্রে বর্তমান সংকলনটিও হেমেন্দ্র-অনুরাগীদের কাছে আদরণীয় হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমান খণ্ডের কয়েকটি রচনার সংগ্রহে শ্রীশোভনকুমার রায়, শ্রীসায়ন্তন রায় ও শ্রীঅরুণাভ মজুমদার আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি এরকম রচনার সংগ্রহে কেউ এগিয়ে এলে, আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকব এবং গ্রন্থে তার যথাযোগ্য স্বীকৃতিও রাখব।

বিনীত
গীতা দত্ত

সূচিপত্র

সুলু সাগরের ভূতুড়ে দেশ

প্রথম

সূচের ছ্যাঁদায় কাছি

—'হ্যালো!'

—'হ্যালো!.....কে?'

—'হুম! তুমি জয়ন্ত?'

—'বুঝেছি। ব্যাপার কী সুন্দরবাবু?'

—'গুরুতর।'

—'মানে?'

—'খুনের মামলা।'

—'কে খুন হল?'

—'মনোহরবাবু।'

—'তাঁর পরিচয়?'

—'পরিচয় দেবার মতো বেশি কিছুই নেই। মালয়ে কারবার করতেন। জাপানিদের আক্রমণের সময়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলেন প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু প্রাণ তাঁর বাঁচল না।'

—'আমাকে যখন স্মরণ করেছেন, খুনি নিশ্চয়ই ধরা পড়েনি?'

—'না।'

—'মামলাটা কি জটিল?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে।'

—'কেন?'

—'খুনি কোনও মূল্যবান জিনিস নিয়ে যায়নি। চুরির জন্যে খুন নয়, অথচ সে দেরাজ নিয়ে টানাটানি করেছিল।'

—'তারপর?'

—'মনোহরবাবুর ভাই বলেন, দেরাজের ভিতর থেকে কিছু চুরি যায়নি।'

—'খুনি তবে দেরাজ নিয়ে টানাটানি করেছিল কেন?'

—'হুম। প্রশ্নের উত্তর নেই।'

—'কারুর উপরে আপনার সন্দেহ হয়েছে?'

—'কার উপরে সন্দেহ করব? মনোহরবাবু নির্বিরোধী লোক, কারুর সঙ্গে তাঁর শত্রুতা নেই। এখানকার সকলেই তাঁকে ভালোবাসত।'

—'তারপর?'

—'আবার বলে—'তারপর'? আরে, তারপর যা শোনবার এখানে এসে শোনো! ফোনে কি সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনানো যায়? শিগগির এসো। আমি তোমার সাহায্য চাই।'

—'আপনি কোথায়?'

—'আমি ঘটনাস্থল থেকেই ফোন করছি।'

—'ঠিকানা?'

—'সাত নম্বর মণি মিত্র স্ট্রিট। নামেই স্ট্রিট, আসলে গলি। রাস্তাটা জানো তো?'

—'জানি।'

—'তবে চটপট এসো।'

—'উত্তম। ফোন ছাড়লুম।'

—'হুম!'

'রিসিভার' ত্যাগ করে ফিরে দাঁড়াল জয়ন্ত।

মানিক অদূরেই চেয়ারের উপরে বসেছিল। চোখের ইশারায় জানতে চাইলে, ব্যাপার কী?

—'সুন্দরবাবুর জরুরি হুকুম, কে মনোহরবাবুর প্রাণহরণ করেছে তা আবিষ্কার করবার জন্যে এখনই আমাদের ঘটনাস্থলে যাত্রা করতে হবে।'

মানিক একটু বিরক্ত স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু কি সব মামলাই আমাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করবেন?'

—'না মানিক, মামলা জটিল না হলে তো সুন্দরবাবু আমাদের ডাকেন না! আমি এখনই যাচ্ছি, তুমিও যাবে তো?'

—'সেকথা আবার বলতে? তুমি কায়া আমি ছায়া!'

—'তবে ওঠো।'

* * *

একখানা বড়ো সেকেলে বাড়ি। তিনতলা। তিন-চারখানা করে ঘর নিয়ে কয়েকটি পরিবার বাড়ির ভিতরে বাস করে।

সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে সুন্দরবাবু নীচেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

—'খুনি বাইরে থেকে কেমন করে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলে, সেইটেই বোঝবার চেষ্টা করছি।'

—'বুঝতে পারলেন?'

বাড়ির দোতলার এক জায়গায় অঙ্গুলিনির্দেশ করে সুন্দরবাবু বললেন, 'খুন হয়েছে ওই ঘরের ভিতরে। ওর সামনেই বারান্দা দেখছ তো? বারান্দার দিকের ঘরের দরজা খোলা ছিল, সেই দরজা দিয়েই খুনি প্রবেশ আর প্রস্থান করেছে। এখন এইদিকে এসো। এই বাড়ির আর পাশের বাড়ির মাঝখানে খুব সরু গলিটা দ্যাখো। চওড়ায় দেড় হাতের বেশি নয়। যে কোনও লোক দুই দিকের দেওয়ালে হাত আর পা রেখে খুব সহজেই উপরের বারান্দায় গিয়ে উঠতে পারে।'

—'ঠিক!' বলেই জয়ন্ত ঠিক সেই উপায়েই দুই দিকের দেওয়াল অবলম্বন করে বারান্দার উপরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হাসতে হাসতে বললে, 'খুনির পথ ধরে এই আমি উপরে এলুম। আপনিও আসবেন নাকি?'

সুন্দরবাবু একবার সেই সরু গলিটার এবং আর একবার নিজের হৃষ্টপুষ্ট মস্ত ভুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন নিতান্ত করুণ ও হতাশ ভাবে।

মানিক ওষ্ঠাধরে দুষ্ট হাসি মাখিয়ে বললে, 'জয়ন্ত, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? তুমি কী বলছ! তুমি কি ছুঁচের ছ্যাঁদার ভেতরে জাহাজের কাছি ঢোকাতে চাও?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই রে, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! মানিকের বিষাক্ত জিভের ছোবল আর আমি সহ্য করতে পারব না!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি আমলে আনেন বলেই তো মানিক অমন করে আপনাকে খ্যাপাতে চায়! এখন বাজে কথা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসুন।'

দ্বিতীয়

'সারাঙ্গানি'

মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে একটি ছোটো লোহার সিন্দুক, একটি টেবিলের সামনে একখানা চেয়ার এবং আর একদিকে একখানা খাট। ঘরের ভিতরে অন্য কোনও আসবাব নেই।

খাটের পাশেই ঘরের রক্তরাঙা মেঝের উপরে কাপড়-ঢাকা যা পড়ে রয়েছে তার দিকে তাকালেই চোখ ওঠে চমকে। কাপড়ের গায়ে ফুটে উঠেছে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শায়িত একটা দেহের রেখা। তলাতেই যে আছে একটা নিশ্চেষ্ট মনুষ্য-মূর্তি সেটা বুঝতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

জয়ন্ত শুধোলে, 'সুন্দরবাবু, কাল রাত্রে কখন ঘটনাটা ঘটেছে?'

—'রাত তিনটের পরেই।'

—'খুব সম্ভব মনোহরবাবু তখন ঘুমোচ্ছিলেন?'

—'তাই তো মনে হয়।'

—'আপনার তদন্ত শেষ হয়েছে?'

—'প্রায়।'

—'ঘটনার মোটামুটি বিবরণ শুনেছেন তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'আগে আমি সেইটেই শুনতে চাই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মনোহর তাঁর স্ত্রী আর ভাইকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে বাস করতেন। তাঁর ব্যাবসা ছিল সেখানকার ভারতীয়দের কাছে ভারত থেকে নানা শ্রেণির চালানি মাল বিক্রয় করা। তিনি নিঃসন্তান। তাঁর ভাই অবিবাহিত, নাম মহীতোষ।

'মনোহরের কারবার চলছিল বেশ ভালোই। ব্যাংকে তিনি লক্ষাধিক টাকাও জমিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ জাপানিদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে গেল। মনোহর বুদ্ধিমান লোক। ইংরেজদের শক্তি সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। তাই জাপানিরা সিঙ্গাপুর আক্রমণ করবার আগেই তিনি সপরিবারে পালিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়।

'এখানে তাড়াতাড়িতে তিনি ভালো বাসা—অর্থাৎ একখানা সম্পূর্ণ নিজস্ব বাড়ি না পেয়ে এই দু-খানি ঘরই ভাড়া নিতে বাধ্য হলেন এবং স্থানাভাবের জন্যে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন বাপের বাড়িতে। তারপর থেকে তিনি এইখানেই বাস করতেন। শুনছি শ্যামবাজার অঞ্চলে তিনি একখানি বাড়ি কিনেছেন, আসছে মাসেই তাঁর সেখানে উঠে যাবার কথা। মনোহরের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু জানবার কথা নেই।

'দু-খানি ঘরে মনোহররা দুই ভাই বাস করতেন। তাঁদের খাবার আসত এই পাড়ারই একটি হোটেল থেকে।

'কাল রাত্রের আহারাদি সেরে মনোহর ও মহীতোষ দশটার সময়ে যে যার ঘরে ঢুকে শয্যাগ্রহণ

করেন। মনোহরের ঘরে বাড়ির ভিতর দিকের দরজা বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যে দক্ষিণের বারান্দার দরজা খোলাই ছিল—মনোহরের মৃত্যুর কারণ হল তাই-ই।

'জয়ন্ত, আমি অনেক মামালাতেই লক্ষ করেছি এইরকম অসাবধানতার সাংঘাতিক পরিণাম। বহু লোকেরই বদঅভ্যাস, তারা বাড়ির ভিতরে নিজেদের এত নিরাপদ মনে করে যে, রাত্রে শয়নগৃহের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে না। ভারত-বিখ্যাত বলদা খুনের মামলা জানো তো? ঢাকার জমিদার এবং সাহিত্যিক নরেন চৌধুরির একমাত্র পুত্র গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন? তাঁর অভ্যাস ছিল, রাত্রে শয়নগৃহের দরজা খুলে রাখা। ঠিক এই একই কারণে আরও যে কত নরহত্যার অনুষ্ঠান হয়েছে, এখানে তার হিসাব দাখিল করবার দরকার নেই। হুম! প্রত্যেকেরই এরকম কুঅভ্যাস ত্যাগ করা উচিত!

'রাত তিনটে বাজবার পরেই কাল মহীতোষের ঘুম হঠাৎ ভেঙে যায়। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেই তিনি শুনলেন, পাশের ঘর থেকে মনোহর আর্তনাদের পর আর্তনাদ করলেন—পরে পরে দুইবার।

'মহীতোষ তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে মনোহরের ঘরের ভিতর দিকের দরজার উপরে ধাক্কার পর ধাক্কা মারতে লাগলেন। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটিয়ারাও সভয়ে সেখানে ছুটে এল। তারপর সকলের ধাক্কা এবং পদাঘাত সহ্য করতে না পেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ঘরের দরজা।

'ভিতরে ঢুকে বৈদ্যুতিক আলোকে দেখা গেল ভীষণ দৃশ্য! খাটের পাশে মেঝের উপরে পড়ে রক্তাক্ত দেহে ছটফট করছেন মনোহর এবং ঘরের ভিতরে অন্য কেউ নেই।

'সকলের স্তম্ভিত নেত্রের সামনেই মনোহরের ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল। মহীতোষ যখন সক্রন্দনে 'দাদা, দাদা' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, মনোহর তখন ত্যাগ করেছেন শেষ-নিশ্বাস!

'জয়ন্ত! আমি এই পর্যন্তই জানতে পেরেছি। অনেক মাথা ঘামিয়েও আমি বুঝতে পারছি না, এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের কারণ কী? মহীতোষ বলেন, তাঁর দাদার ঘর থেকে মূল্যবান কোনও জিনিসই অদৃশ্য হয়নি। লোহার সিন্দুকের ভিতরে নগদে আর গহনায় প্রায় পনেরো হাজার টাকার সম্পত্তি ছিল, হত্যাকারী কিন্তু লোহার সিন্দুক স্পর্শ করেছে বলেও মনে হয় না। টেবিলের ওই দেরাজটা খুব সম্ভব হত্যাকারীই বাইরে টেনে বার করেছিল, আর তার ভিতরে নগদ পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল, কিন্তু হত্যাকারী তাও নিয়ে যায়নি। মনোহরের কোনও শত্রুও নেই—তবে কে তাঁকে খুন করলে, আর কেনই বা করলে? হত্যা কখনও উদ্দেশ্যহীন হয় না—দীর্ঘকাল পুলিশে কাজ করে এইটুকুই সার বুঝেছি। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? এটা আবিষ্কার করবার ভার রইল তোমারই উপরে। হুম!'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এগিয়ে গিয়ে মনোহরের শবদেহের পাশে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে দেহের উপর থেকে তুলে নিলে চাদরের আবরণী।

মনোহরের দুই চক্ষু মুদ্রিত, মুখ প্রশান্ত। ঠিক যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে! কিন্তু তার সর্বাঙ্গ ভয়াবহরূপে রক্তাক্ত। কপালের উপরে এবং বুকের কাছে অস্ত্রাঘাতের গভীর চিহ্ন।

জয়ন্ত বললে, 'মনোহরবাবু দু-বার আর্তনাদ করেছিলেন, হত্যাকারী তাঁর দেহের উপরেও দুইবার অস্ত্রাঘাত করেছে। কোন আঘাত মারাত্মক হয়েছে, ডাক্তারি পরীক্ষাতেই জানতে পারা যাবে। ক্ষতচিহ্ন দেখলে বোধহয়, হত্যাকারীর হাতে ছিল একখানা খুব বড়ো ছোরা। হত্যাকারী সাধারণ চোর নয়, সে নরহত্যা করবে বলে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, এটুকু তো আমিও বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এই মৃতদেহের ভিতর থেকে কি আর কিছু সূত্র পাওয়া যায় না?'

জয়ন্ত বললে, 'একটা সূত্র পাচ্ছি বটে, কিন্তু আপাতত সেটা কোনও কাজে লাগবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

—'কী সূত্র?'

—'হত্যাকারী অত্যন্ত দীর্ঘাকার, সে যদি সাত ফুট লম্বা হয় তাহলেও আমি বিস্মিত হব না।'

—'কী করে বুঝলে?'

—'মনোহরবাবুর দেহ দেখছেন? এঁর দেহের মাপ পাঁচ ফুটের বেশি নয়। কিন্তু এঁর দেহের ক্ষতচিহ্ন দুটো দেখুন। অত্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী—একেবারে অসাধারণ।'

—'তাতে কী প্রমাণিত হয়?'

—'প্রমাণিত হয় যে, কেউ যেন খুব উঁচু থেকে এই দেহের উপরে অস্ত্রাঘাত করেছে। এর একমাত্র কারণ হতে পারে, মনোহরের আততায়ীর দেহ অতিশয় সুদীর্ঘ, হত ব্যক্তির মাথার অনেক উপর থেকে অস্ত্র তুলে সে নীচের দিকে আঘাত করেছে।'

—'হুম! তোমার অনুমান সঙ্গত। কিন্তু হত্যাকারীর যখন পাত্তা নেই, তোমার এই আবিষ্কার তো আপাতত আমাদের কোনওই কাজে লাগবে না!'

জয়ন্ত কিন্তু সুন্দরবাবুর কথা শুনছিল না! সে বিড়বিড় করে আপন মনে বললে, 'লাশের বাঁ হাতের আঙুলগুলো ছড়ানো, কিন্তু ডান হাতটা মুঠো করা কেন?'

মৃত মনোহরের মুঠো করা ডান হাতের আঙুলগুলো জয়ন্ত খোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু প্রথম চেষ্টায় পারলে না, মৃত্যুমুখে পড়েও মনোহর যেন হাত মুঠো করে ছিল প্রাণপণে। জয়ন্ত প্রয়োগ করলে তখন নিজের অসাধারণ দৈহিক শক্তি! একটা শব্দ হল, যেন মৃতদেহের আঙুলের হাড় গেল মট করে ভেঙে! মুঠো খুলে গেল।

মুঠোর ভিতরে রয়েছে একটা কাগজের পিণ্ড!

সুন্দরবাবু বললেন, 'ও আবার কী?'

—'সেইটেই তো দ্রষ্টব্য।' —বলে জয়ন্ত সেই পিণ্ডাকৃতি কাগজ নিয়ে তার এলোমেলো ভাঁজ খুলতে লাগল।

একখানা ছেঁড়া কাগজ। তার উপরে গোটাকয়েক রেখার টান।

মানিক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'ওটা কী, জয়?'

জয়ন্ত কাগজখানার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'কতগুলো রেখা দেখছি। উপরদিকে কতগুলো কালো ফুটকি—একটা ফুটকি লাল রঙের। উপরের ডান দিকে এক জায়গায় লেখা রয়েছে একটি অক্ষর—'সু'। তারপরেও বোধহয় আরও অক্ষর ছিল, কিন্তু সে-সব আর দেখবার উপায় নেই—কারণ তার পরের অংশটা কেউ যেন ছিঁড়ে নিয়েছে!'

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'হুম, হুম, হুম! জয়ন্ত, তুমি একটা মস্ত আবিষ্কার করেছ! এই ছেঁড়া কাগজখানার ভিতরেই বোধ হয় পাওয়া যাবে, হত্যা-রহস্যের চাবিকাঠি!'

জয়ন্ত দুই চক্ষু মুদে বললে, 'চোখের সামনে আমি যেন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি! মনোহরবাবু শয্যায় নিদ্রিত। অন্ধকার ঘরের ভিতরে চুপিচুপি বাইরের লোকের প্রবেশ। নিশ্চয়ই তার হাতে ছিল 'টর্চ'। সে এদিক-ওদিক দেখে ওই টেবিলের কাছে গেল। একটা দেরাজ টেনে খুললে এবং 'টর্চ' জ্বেলে দেরাজের ভিতর খুঁজে বার করলে একখানা কাগজ। মনোহরবাবুর ঘুম সজাগ। দেরাজ টানার শব্দ শুনেই তাঁর ঘুম গেল ভেঙে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে চাবি টিপে জ্বেলে দিলেন বিজলি-বাতি! ঘরের

ভিতরে বাইরের লোক দেখেই তিনি সবিস্ময়ে খাট থেকে নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরিচিত কিংবা পরিচিত ব্যক্তি ছুটে এসে করলে তাঁকে আক্রমণ! কিন্তু ইতিমধ্যেই মনোহরবাবু দেখে নিয়েছিলেন, এই অপ্রার্থিত অতিথি তাঁর টেবিলের দেরাজ থেকে বার করে নিয়েছে কী একটা জিনিস! সেটা যে কী তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সে তাঁকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই (কিংবা তার আগেই) তিনি তার হাত থেকে কাগজখানা ছিনিয়ে নিতে গেলেন—যদিও কাগজখানার সবটা তিনি পেলেন না। তারপর আবার অস্ত্রাঘাত—মনোহরবাবুর পতন। হত্যাকারী নিশ্চয়ই কাগজের বাকি অংশটাও তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিত, কিন্তু তার আগেই মহীতোষ আর বাড়ির অন্য সব লোক উঠল জেগে! বাইরে হই-চই, দরজায় আঘাতের পর আঘাতের পর আঘাত, ধরা পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি হত্যাকারীর পলায়ন! সুন্দরবাবু, চিরদিনই জানেন যে, আমি কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করি—আপনারা যা করেন না। কিন্তু বলুন দেখি, আমি যা বললুম সেইটাই কি সম্ভবপর নয়?'

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, তুমি একটা আশ্চর্য গল্প বললে! পুলিশে চাকরি করি, কল্পনা-টল্পনা নিয়ে চাকরি করা চলে না। কিন্তু যা বললে, তাই কি সত্যি?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সত্যি-মিথ্যে জানি না সুন্দরবাবু! তবে মনে হচ্ছে, হত্যাকারীর মতো আমাদেরও উচিত, ওই টেবিলের দেরাজটা একবার পরীক্ষা করা! এসো মানিক, তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

জয়ন্ত ও মানিক টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—সুন্দরবাবুও গেলেন পিছনে পিছনে।

দেরাজটা তখনও খোলাই ছিল। তার ভিতরে পাওয়া গেল কয়েকখানা হিসাবের খাতা, একতাড়া চিঠি এবং একখানা ডায়ারি।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি বললেন দেরাজের ভিতরে নাকি পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল?'

—'ছিল। সেগুলো এখন আমার জিম্মায় আছে।'

জয়ন্ত আগে হিসাবের খাতাগুলোর উপরে চোখ বুলিয়ে গেল। বললে, 'ধেৎ! কেবল টাকা-আনা-পয়সার অঙ্ক, দেখলেই গায়ে জ্বর আসে!'

সে চিঠির তাড়াটা তুলে নিলে। একে একে চিঠির উপরে চোখ বুলোতে বুলোতে বললে, 'মানিক, ততক্ষণে তুমি ডায়ারির পাতাগুলো উলটে দ্যাখো।'

মানিক ডায়ারিখানা তুলে নিয়ে তার মধ্যে দৃষ্টি চালনা করতে করতে বললে, 'জানবার মতন কোনও তথ্যই দেখছি না। সুন্দরবাবু, এ খবরটা শুনে আপনার জিভ বোধকরি সরস হয়ে উঠবে। এ পাতায় লেখা রয়েছে,—'আজ কলকাতা থেকে পাঁচটা বায়ুশূন্য টিনে করে বাগবাজারের রসগোল্লা এসেছে!' সিঙ্গাপুরে বাগবাজারের রসগোল্লার আবির্ভাব নিশ্চয়ই স্মরণীয়, মনোহরবাবু তাই ডায়ারিতে খবরটা লিখে না রেখে পারেননি! ......তারপর, এ আবার কী?' সে একেবারে চুপ মেরে গিয়ে সাগ্রহে কী পড়তে লাগল।

জয়ন্ত চিঠির তাড়া থেকে চোখ তুলে বললে, 'কী সংবাদ বন্ধু?'

—'শোনো। ডায়ারির এখানে লেখা রয়েছে: 'বুড়ো মামুদ আমার ধার শোধ করতে না পেরে আমাকে একটা অদ্ভুত জিনিস উপহার দিয়ে বলে গেছে—বাবু, আমার সম্বলও নেই সহায়ও নেই, এটা তুমিই নাও, আমি কোনও কাজে লাগাতে পারব না।' জিনিসটা বিশেষ কিছুই নয়, একখানা

নকশার মতন কী, তার একপ্রান্তে লেখা কতগুলো অঙ্ক। ছাইভস্ম কিছুই বুঝলাম না। মামুদ আরও যেসব কথা বলে গেল, শুনলে হাসি পায়। সারাঙ্গানি! রত্নগুহা! রূপকথা বিশ্বাস করবার মতো বয়স আমার নয়।' জয়ন্ত, এটুকু তথ্য তোমার কোন কাজে লাগবে?'

জয়ন্ত উত্তেজিত স্বরে বললে, 'ডায়ারির পাতা ওলটাও মানিক, ডায়ারির পাতা ওলটাও! দ্যাখো, ও বিষয়ে আর কোনও কথা আছে কি না!'

পাতা ওলটাতে ওলটাতে আর এক জায়গায় থেমে মানিক বললে, 'আবার শোনো : আজ 'পাবলো নামে একটা মস্ত ঢ্যাঙা লোক এসেছিল, সে নাকি ফিলিপাইন দ্বীপের বাসিন্দা। মামুদের নকশাখানা সে অনেক টাকা দিয়ে কিনতে চায়, আমি রাজি হইনি। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, মামুদের কথা বোধহয় রূপকথা নয়।' আরও খানকয় পাতার পরে লেখা আছে : 'আজ কদিন ধরে দেখছি, আমার বাসার আশেপাশে জনকয় গুন্ডার মতন লোক ঘোরাফেরা করছে। তারা কেউই স্থানীয় লোক নয়। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারছি না।' তারপর আর এক জায়গায় লেখা : 'কাল রাত্রে আমার বাসায় চোর এসেছিল। সে আমার শোবার ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা জেগে উঠতেই পালিয়ে গিয়েছে।' ব্যাস, এইখানেই ডায়ারি শেষ!'

জয়ন্ত বললে, 'ডায়ারি শেষ হলেও ক্ষতি নেই। যতটুকু আশা করেছিলুম, তার চেয়ে ঢের বেশি কথা আমরা জানতে পেরেছি! এতক্ষণে মামলাটা একেবারে জলের মতন সোজা হয়ে গেল।'

সুন্দরবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'সন্দেহ হচ্ছে, আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে—হুম!'

—'কী সন্দেহ?'

—'ওই পাবলোকে আমার সন্দেহ হচ্ছে—ওই মস্ত ঢ্যাঙা ফিলিপিনোটাই খুনি না হয়ে যায় না।'

—'কেন?'

—'তুমিই তো বললে, মনোহরকে যে খুন করেছে মাথায় সে হয়তো সাত ফুট লম্বা!'

—'দুনিয়ায় পাবলো ছাড়া আরও মস্ত ঢ্যাঙা লোক তো থাকতে পারে?'

—'আরে, তাদের সঙ্গে এ মামলার সম্পর্ক কী? তারা তো মনোহরের নকশার জন্যে লোভপ্রকাশ করেনি! মনে ভেবে দ্যাখো, পাবলো এই নকশাখানা অনেক টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল। তারপরে সিঙ্গাপুরে খুব সম্ভব সেই-ই মনোহরের বাসা থেকে নকশাখানা আর-একবার চুরি করবারও চেষ্টা করেছিল। তারপর জাপানিরা যুদ্ধ ঘোষণা করে। মনোহর কলকাতায় পালিয়ে আসেন। ও-অঞ্চল থেকে ভারতে আসবার পথ বন্ধ হয়, পাবলো এতদিন তাই মনোহরের উপরে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেনি। যুদ্ধ থামতেই সে এখানে এসে নিজের কার্যোদ্ধার করেছে। কেমন, আমার এ অনুমান কি অসঙ্গত? কী বলো হে মানিক?'

মানিক বললে, 'আলবাত! আপনার অনুমানই তো প্রমাণ!'

—'হুম, ঠাট্টা নয় মানিক, ঠাট্টা নয়! আজ থেকেই আমি পাবলোব্যাটার সন্ধানে ফিরব।'

জয়ন্ত বললে, 'আমি এখন অন্য কথা ভাবছি। মনোহরের ডায়ারিতে পাওয়া গিয়েছে 'সারাঙ্গানি' বলে একটা শব্দ। তার অর্থ কী? আর তার সঙ্গে 'রত্নগুহা'রই বা সম্পর্ক কী? তারপর এই ছেঁড়া নকশাখানা দ্যাখো। এর উপরে কতগুলো রেখা টানা রয়েছে। কতগুলো কালো আর একটিমাত্র লাল রঙের ফুটকিও দেখা যাচ্ছে। এসব কী? আর ওই 'সু' অক্ষরটা! ওটা কোন কথার আদ্য অক্ষর?'

মানিক বললে, 'মনোহরের ডায়ারিতে প্রকাশ, নকশার একপ্রান্তে ছিল কতগুলো অঙ্ক। এই ছেঁড়া নকশায় তা নেই। নিশ্চয়ই নকশার সেই অংশটা আছে খুনির কাছেই। পুরো কাগজখানা না পেলে বোধহয় আমরা নকশার আসল অর্থ উদ্ধার করতে পারব না।'

জয়ন্ত বললে, 'মাথা ঘামালে এই নকশার কিছু কিছু অর্থ হয়তো আমি আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু আমাদের অতটা মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তার চেয়ে এক কাজ করি এসো।'

—'কী?'

—'চলো, সকলে মিলে বিমল আর কুমারবাবুর কাছে যাওয়া যাক। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই মামলাটার পিছনে আছে রত্নগুহা বা যকের ধন। এসব ব্যাপারে বিমলবাবুদের মাথা খুব খোলে। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলে কেমন হয়?'

মানিক উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'চমৎকার প্রস্তাব!'

তৃতীয়

সারাঙ্গানির গুপ্তকথা

দু-দিকে দু-খানা কৌচে অর্ধশয়ান অবস্থায় বিমল এবং কুমার।

দরজার কাছে মেঝের উপরে উপু হয়ে বসে রামহরি বুরুশ-চালনা করছিল বাঘার দেহের উপরে।

বিমল শুধোলে, 'কুমার হে!'

কুমার বললে, 'উঁ!'

—'আর তো পারা যায় না।'

—'একেবারেই না।'

—'কী পারা যায় না, বুঝেছ?'

—'বুঝিনি আবার, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।'

—'কী বুঝেছ বলো দেখি?'

—'আজ ছ-মাস ধরে আমাদের ছ-মেসে ধরেছে।'

—'অর্থাৎ?'

—'আজ ছ-মাস ধরে আমরা যাপন করছি শয্যাশায়ী বিলাসীর জীবন! আমাদের দেহের হাড়গুলো যদি লোহার হত তাহলে এতদিনে সেগুলো মর্চে পড়ে অকেজো হয়ে যেত!'

—'আজ ছ-মাস ধরে রোজ সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজছি, প্রাতরাশ খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, কিছুক্ষণ দাবা-বোড়ে খেলে মধ্যাহ্ন-আহার সেরে আবার শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি, বৈকালি চায়ের পালা সাঙ্গ করে বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা মারছি, তারপর রাত্রে বাড়ি ফিরে ডান হাতের ব্যাপার সেরে আবার ঘুমিয়ে পড়ছি! উঃ!'

—'কী ভয়ানক!'

—'রামচন্দ্রঃ!'

—'মহাভারত!'

—'এই কি জীবন?'

—'আমরা কি সেই বিমল, সেই কুমার?'

—'এ যে বেঁচে থেকে মরে থাকা!'

রামহরি ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'থামো থামো, আর ফাজলামি করতে হবে না! তোমরা মন্দটা কী আছ বাপু? খাচ্ছ-দাচ্ছ, রাজার মতো বসে আছ পায়ের ওপরে পা দিয়ে! দুনিয়ার লোক তো এই চায়!'

বিমল বললে, 'তোমার মোটাবুদ্ধিতে আমাদের দুঃখ তুমি বুঝবে না রামহরি! আমার আত্মহত্যা করতে সাধ হচ্ছে।'

কুমার বললে, 'আমারও। অন্তত সেটাও একটা বৈচিত্র্য হবে। মরে ভূত হয়ে আমরা রামহরির ঘাড় মটকাতে আসব!'

রামহরি বললে, 'ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষণ বুকে আছেন ভয়টা আমার কী?'

বাঘা হঠাৎ দুই কান খাড়া করে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

রামহরি বললে, 'কী হল রে বাঘা, চ্যাঁচাস কেন? ও, কাদের পায়ের শব্দ শুনেছিস বুঝি? হ্যাঁ, কারা যেন আসছে।'

অত্যন্ত অবসাদ-ভরে বিমল ও কুমার নিজেদের দুই চক্ষু মুদে ফেললে।

ঘরের ভিতরে তিন মূর্তির আবির্ভাব। সুন্দরবাবু, জয়ন্ত ও মানিক।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে আরে, এ কী মশাই? এই অবেলায় ঘুম?'

বিমল চোখ খুলে বললে, 'আমরা ঘুমোচ্ছি না।'

কুমার চোখ খুলে বললে, 'আমরা মরবার চেষ্টা করছি।'

—'সে কী মশাই, কেন, কেন?

বিমল বললে, 'হাতে কোনও কাজ নেই।'

কুমার বললে, 'জীবন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।'

জয়ন্ত বললে, 'উঠুন। আমরা আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।'

বিমল কিছুমাত্র উৎসাহপ্রকাশ না করে বললে, 'পরামর্শ? কীসের পরামর্শ?'

কুমার ম্রিয়মান ভাবে বললে, 'কোন ছিঁচকে চোর কার ঘটি-বাটি চুরি করেছে, তা নিয়ে আলোচনা করতে আমরা মোটেই রাজি নই!'

—'উঁহু! এ ঘটি-বাটি চুরি নয়! এ হচ্ছে খুন, আর রত্নগুহার নকশা চুরি!'

বিমল তৎক্ষণাৎ কৌচের উপরে সিধে হয়ে উঠে বসে বললে, 'কী বললেন?'

কুমার লাফ মেরে কৌচ থেকে নেমে পড়ে বললে, 'রত্নগুহা? 'হতাশ পথিক,—সে কোথায়, সে কোথায়'?'

অকস্মাৎ দুই বন্ধুর এই অত্যন্ত জীবন্ত ভাব লক্ষ করে জয়ন্ত কোনওরকমে হাসি চাপতে চাপতে বললে, 'রত্নগুহা যে কোথায় আছে তা যদি আমরা জানতুম, তাহলে আমরা আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসতুম না। কিন্তু দেখুন দেখি, এই নকশাখানার রহস্য কী?' সে পকেট থেকে নকশাখানা বার করে বিমল ও কুমারের সাগ্রহ-দৃষ্টির সামনে খুলে ধরলে।

বিমল গম্ভীর ভাবে খানিকক্ষণ অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে কাগজখানা দেখতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'মনে হচ্ছে এই কাগজখানার উপরে আঁকা রয়েছে কয়েকটা দ্বীপের খানিক খানিক অংশ। এখানা হচ্ছে ম্যাপ। কুমার, এশিয়ার একখানা ছাপানো ম্যাপ নিয়ে এসো তো!'

কুমার তখনই বন্ধুর কথামতো কাজ করলে।

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, 'হুঁ! যা ভেবেছি তাই! এই কাগজখানার উপরে আঁকা আছে উত্তর—অর্থাৎ 'ব্রিটিশ'-বোর্নিয়োর, আর ফিলিপাইন দ্বীপের খানিক খানিক অংশ। আর দ্বীপগুলোর মাঝখানে সুলু সাগর—দক্ষিণ চিন সাগরের পূর্ব দিকের এক অংশের নাম সুলু সাগর। ওইখানে অনেকগুলো খুব ছোটো ছোটো দ্বীপ আছে, এই ম্যাপে কালো কালো ফুটকি দিয়ে তাই দেখানো হয়েছে। কিন্তু একটা ফুটকি লাল রঙের—খুব সম্ভব ওই দ্বীপটির দিকেই বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'কাগজের উপরে লেখা রয়েছে 'সু', ওটা তাহলে 'সুলু সাগরেরই প্রথম অক্ষর?'

—'নিশ্চয়ই। ম্যাপখানা দেখছি ছেঁড়া। গোটা ম্যাপে নিশ্চয়ই লেখা ছিল 'সুলু সাগর'।'

জয়ন্ত বললে, 'দুর্ভাগ্যক্রমে ম্যাপের অন্য অংশ এখন অপরের হস্তগত হয়েছে। সেই অংশে খালি সুলু সাগরের সব অক্ষর নয়, কতকগুলো রহস্যময় অঙ্কও ছিল। কিন্তু আপাতত তা দেখবার আর কোনও উপায়ই নেই।'

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, এ ম্যাপ দেখে তো কিছুই বুঝছি না। আপনারা আমাদের সঙ্গে কী পরামর্শ করতে এসেছেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা বিমলবাবু, আপনি কি জানেন, 'সারাঙ্গানি' বলতে কী বোঝায়?'

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল। তারপর থেমে থেমে বললে, 'সারাঙ্গানি...... সারাঙ্গানি......মনে হচ্ছে কথাটা যেন পরিচিত!......আচ্ছা কুমার, আমাদের 'স্ক্র্যাপ বুক'খানা একবার নিয়ে এসো তো!—সারাঙ্গানি......সারাঙ্গানি! হ্যাঁ, ও-কথাটা আমি আগেও শুনেছি। আমি একবার যা শুনি, একবার যা দেখি, তা আর ভুলি না—আমার স্মৃতিশক্তিকে আমি নিজেই ধন্যবাদ দিতে পারি!'

কুমার একখানা খুব মোটা আর লম্বা-চওড়া 'স্ক্যাপ বুক' এনে স্থাপন করলে বিমলের সামনে। তার ভিতরে দেশি-বিলাতি নানা পত্রিকার অংশবিশেষ কেটে নিয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে।

পাতার পর পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে বিমল সহর্ষে বলে উঠল, 'পেয়েছি! পেয়েছি! এই তো 'সারাঙ্গানি' দ্বীপের কাহিনি!'

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'সারাঙ্গানি দ্বীপ! সে আবার কোথায়?'

বিমল বললে, 'সুলু সাগরে।'

—'সুলু সাগরে! তবে কি ওই লাল ফুটকি দিয়ে সেই দ্বীপেরই অবস্থান দেখানো হয়েছে?'

—'হতে পারে। আচ্ছা, আগে দেখা যাক সারাঙ্গানি দ্বীপের ভিতরে কী আছে? জয়ন্তবাবু, আমি কোনও মন-গড়া কথা বলতে চাই না, এইবারে আমি ১৯৩৯ অব্দের ২৫শে জুন, রবিবারের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ হুবহু বাংলায় অনুবাদ করে আপনাদের শোনাব। সংবাদটি হচ্ছে এই :

'রত্নদ্বীপ

'ফিলিপাইনের অনেক উত্তরে, সুলু সমুদ্রের মধ্যে আছে অত্যন্ত রহস্যময় ও ভয়াবহ সারাঙ্গানি দ্বীপ।

'যেসব ইউরোপীয় ওখানে গিয়েছেন তাঁরা সবাই বলেন, মনে হয় যেন ওই দ্বীপের উপরে স্তম্ভিত হয়ে আছে একটা স্থির বায়ু আর রহস্যপূর্ণ স্তব্ধতা!

'চারিদিক যেন বিযাক্ত এবং চারিদিক থেকেই যেন ফুটে উঠেছে শ্মশান-শ্মশান ভাব! অথচ পেলব শ্যামলতায় সুন্দর সেই দ্বীপ এবং তার ভূমিও উর্বর।

'কিন্তু এই দ্বীপের সঙ্গে জড়ানো আছে একটি প্রাচীন কাহিনি। সারাঙ্গানি ছিল সাংঘাতিক জলদস্যু, তার নামে সবাই ভয়ে কাঁপত।

'ও-অঞ্চলে তখন স্পানিয়ার্ডদের প্রভুত্ব। তারা বার বার চেষ্টা করেও সারাঙ্গানিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তারপর বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে সে বোম্বেটে-ব্যবসায় ছেড়ে দেয়।

'তারপর রাত্রের অন্ধকারে কয়েক দিন ধরে সে তার সমস্ত ধনসম্পত্তি একটি দ্বীপে স্থানান্তরিত করে। তার ঐশ্বর্য বহন করে নিয়ে যেত কয়েকজন ক্রীতদাসী। রাত্রির পর রাত্রি নৌকায় চড়ে সে ক্রীতদাসীদের নিয়ে দ্বীপে গমন করত। কিন্তু ফিরে আসত একাকী।

'দ্বীপে ঐশ্বর্য বহন করবার জন্যে সে যেসব ক্রীতদাসী নির্বাচন করত, তারা ভয়ে কাঁপতে বলির পাঁঠার মতো। তাদের ভয় পাবার যথেষ্ট কারণও ছিল। জীবন্ত ক্রীতদাসীদেরও সে মাটির ভিতরে পুঁতে রেখে আসত ধনরত্নের সঙ্গে! সে নিজে ছাড়া গুপ্তধনের ঠিকানা আর কেউ যে জানতে পারবে, এটা তার অভিপ্রেত ছিল না।

অবশেষে সারাঙ্গানির শেষ দিন ঘনিয়ে এল। সে যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'পঞ্চাশ বছর বোম্বেটেগিরি করে তুমি যে ঐশ্বর্য অর্জন করেছ তা লুকিয়ে রেখেছ কোথায়?'

'সে জবাব দিলে,—খুঁজে দ্যাখো। গুপ্তধন পেলেও পেতে পারো।'

'কিন্তু সে দ্বীপের মধ্যে বাইরের কারুর প্রবেশ নিষেধ!

'সারাঙ্গানি মরবার সময়ে অভিশাপ দিয়ে গিয়েছে,—গুপ্তধনের লোভে যে আমার দ্বীপে গিয়ে নামবে, প্রাণ নিয়ে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না।'

'এই রত্নদ্বীপের কথা অনেকেই জানে। কিন্তু এ-অঞ্চলের বাসিন্দারা কেহই ভয়ে ওই দ্বীপের ত্রিসীমানায় যেতে চায় না।'

জয়ন্তবাবু, ওই দ্বীপটিই এখন সারাঙ্গানি দ্বীপ নামে বিখ্যাত।'

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'স্টেটসম্যানের লেখক বলছেন, 'সারাঙ্গানি দ্বীপের অবস্থান হচ্ছে ফিলিপাইনের অনেক উত্তরে, সুলু সমুদ্রের মধ্যে।' কিন্তু মনোহরের ম্যাপে লাল ফুটকি দিয়ে যে দ্বীপটি দেখানো হয়েছে, ওটি তো আছে দেখছি একেবারে দক্ষিণ ফিলিপাইনের পশ্চিম দিকে। সুতরাং ওই লাল ফুটকিটিকে কী করে আমরা সারাঙ্গানি দ্বীপ বলে গ্রহণ করব?'

বিমল বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে, স্টেটসম্যানের লেখকই এখানে মস্তবড়ো একটা ভ্রম করেছেন। আসল ছাপানো ম্যাপ দেখুন। সুলু সমুদ্র রয়েছে ফিলিপাইনের নীচের দিকে পশ্চিম পাশে। ফিলিপাইনের উত্তর দিকে আছে চিন সাগর। সুলু সমুদ্রের অবস্থান বোর্নিয়োর উত্তর দিকে—ফিলিপাইনের উত্তরে নয়।'

কুমার বললে, 'জয়ন্তবাবু, এই সারাঙ্গানি দ্বীপের ম্যাপখানা আপনার হাতে এল কেমন করে?'

—'তাহলে গোড়া থেকেই সব কথা শুনুন।' জয়ন্ত তখন একে একে মনোহরের হত্যা-সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনার কথাই বর্ণনা করে গেল। তারপর বললে, 'এখন আমাদের কী করা উচিত? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে আছে ফিলিপিনো পাবলো।'

বিমল বললে, 'কিন্তু সে তো পলাতক।'

—'আমার মনে হয় তাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হবে না।'

—'তবে আগে সেই চেষ্টাই করুন। কেবল খুনের জন্যে নয়, পাবলোকে আমাদের দরকার আর এক কারণে।'

—'আর এক কারণে?'

—'হ্যাঁ। পাবলোর কাছে এই ছেঁড়া ম্যাপের বাকি অংশ আছে—যার উপরে আছে অঙ্কের মতন কিছু। মনে হচ্ছে তার ভিতরেই গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে।'

জয়ন্ত বললে, 'সেটা পেলে আপনার কী লাভ হবে?'

বিমল বললে, 'লাভ-লোকসান জানি না, এই বিষম একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে চাই।'

—'মানে?'

'আমি সারাঙ্গানি দ্বীপে যেতে চাই একান্ত স্থির জীবন-সমুদ্রকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল করে তোলবার জন্যে।'

কুমারও সমুজ্জ্বল নেত্রে বললে, 'আমিও কবিতার ভাষায় বলি—'

হোক-গে এ গুপ্তধন যার খুশি তার—
দুর্দান্ত জীবন চাই—দৃপ্ত, দুর্নিবার!

হ্যাঁ! সেই অশান্ত জীবন চাই—যা জলে-স্থলে শূন্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে কালবোশেখীর মতো!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনারা ভুলে যাবেন না যেন, রত্নদ্বীপে অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ! সারাঙ্গানির অভিশাপে রত্নদ্বীপ এখন মৃত্যুদ্বীপ।'

বিমল হেসে উঠে বললে, 'ওসব কুসংস্কার আমরা মানি না। জীবনে বহুবার মৃত্যুকে কলা দেখিয়েছি, এবারেও দেখাতে পারব। কিন্তু আপাতত আমাদের সর্বাগ্রে দরকার ছেঁড়া ম্যাপের বাকি অংশটাকে। দোহাই জয়ন্তবাবু, আগে সেই চেষ্টাই করুন!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মনে হয়, মনোহরের মুঠোর ভিতরে আমরা ম্যাপের যে অংশটুকু পেয়েছি সেটা না পেলেও পাবলোর চলবে। রত্নদ্বীপের অবস্থান ও-অঞ্চলের অনেকেই যখন জানে তখন পাবলোর কাছেও নিশ্চয়ই তা অজানা নেই। সে কেবল জানে না, দ্বীপের ঠিক কোন জায়গায় গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ম্যাপের যে অংশ সে পেয়েছে তার ভিতরেই আছে গুপ্তধন ভাণ্ডারের আসল চাবিকাঠি। এখন ভেবে দেখা যাক, পাবলোর উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়েছে, তখন অতঃপর তার পক্ষে কী করা উচিত? সে বিদেশি, কলকাতায় খুব সহজেই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সুতরাং নরহত্যার পর সে যে প্রথম সুযোগেই এই বিপজ্জনক শহর ত্যাগ করবে, সে- বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কোন দিকে যাবে? যে দিকে আছে রত্নদ্বীপ—নিশ্চয়ই সেই দিকে! সুন্দরবাবু, আমি জানি, কাল সকালেই সিঙ্গাপুরগামী একখানা জাহাজ ছাড়বে। যথাস্থানে যথাসময়ে হাজির হতে পারলে আমরা হয়তো দেখতে পাব, সেই জাহাজের যাত্রী হয়েছে ফিলিপিনো পাবলো!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! ঠিক এই উপায়েই আমরা আর একজন বোর্নিয়োগামী আসামিকে গ্রেপ্তার করেছিলুম না?'*

—'হ্যাঁ, এ শ্রেণির আসামিরা ধরা পড়ে প্রায় এক ভাবেই।'

* * *

*'হত্যা এবং তারপর' দ্রষ্টব্য।

পরদিন দুপুরেই জয়ন্ত ও মানিক এল বিমল ও কুমারের কাছে।

বিমল বললে, 'মুখ দেখেই বুঝেছি, আপনারা সুখবর এনেছেন।'

জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ বিমলবাবু, খবর শুভ।'

—'পাবলো ধরা পড়েছে?'

—'হ্যাঁ, জাহাজ-ঘাটে।'

—'সেই ছেঁড়া ম্যাপের বাকি অংশ?'

—'তাও পেয়েছি। এই নিন।'

জয়ন্তের হাত থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে বিমল সাগ্রহে তার উপরে ঝুঁকে পড়ল।

ছেঁড়া কাগজ। একপ্রান্তে এই অক্ষর কয়টি আছে—

লু সাগর।

তার পাশেই ইংরেজিতে লেখা :

দক্ষিণের বাঁশঝাড় ও পাঁচটি নারিকেলগাছ। উত্তরে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০; পূর্বে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ থেকে ১০০ পর্যন্ত। পূর্ব-দক্ষিণে : ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত। উত্তরে : ১ থেকে ৫৮ পর্যন্ত। নীচে : ১ থেকে ৩৮ পর্যন্ত।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন যন্ত্র।

কুমার 'ফোন' ধরেই শুনলে সুন্দরবাবু ব্যস্ত কণ্ঠে জয়ন্তকে ডাকছেন।

জয়ন্ত বললে, 'হ্যালো! ব্যাপার কী?'

—'ব্যাপার আর কী, মাথা আর মুণ্ডু! পাবলো বেটা লম্বা দিয়েছে!'

—'সে কী? কেমন করে?'

—'পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে হাতকড়ি পরে পাবলো রাস্তা দিয়ে থানার দিকে আসছিল। হঠাৎ কোথা থেকে একখানা প্রাইভেট মোটর হুড়মুড় করে পাহারাওয়ালাদের উপরে এসে পড়ে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পর-মুহূর্তে পাবলো একলাফে মোটরে উঠে পড়ে, আর গাড়িখানাও চোখের নিমেষে উল্কাবেগে অদৃশ্য হয়ে যায়। জয়ন্ত, কলকাতায় পাবলো সহায়হীন নয়, নিশ্চয় তার বন্ধুরাই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।'

—'সুন্দরবাবু, যে দুধ মাটিতে পড়ে গিয়েছে তা নিয়ে আর দুঃপ্রকাশ করব না। পারেন তো একবার বিমলবাবুর বাড়িতে আসুন।'

চার

বিদ্যুৎ-গতির যুগে

পাবলোর পলায়ন-কাহিনি শুনে বিমল কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'পাবলো পালিয়েছে? তাহলে আমাদের কর্তব্য কিঞ্চিৎ কঠিন হয়ে উঠল দেখছি!'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন?'

—'আমাদের সুলু সাগর ভ্রমণ হয়তো ততটা নিরাপদ হবে না!'

—'তার মানে?'

—'পাবলো হয়তো আমাদের বাধা দেবে।'

—'আপনি সত্যসত্যই সুলু সাগরে যেতে চান?'

—'নিশ্চয়ই!'

—'গুপ্তধন আনতে?'

—'ধরুন তাই।'

—'কিন্তু গুপ্তধন তো আমরা আনতে যেতে পারি না।'

—'কেন?'

—'মনোহরবাবু পরলোকে। আপাতত এই গুপ্তধনের উপরে দাবি আছে কেবলমাত্র তাঁর উত্তরাধিকারীর।'

—'এখানে দাবির কথা তোলা বৃথা। গুপ্তধন কোনওদিনই আইনসঙ্গত উপায়ে লাভ করা যায় না। আইনের কথা যদি ধরেন, তাহলে সুলু সাগরের ওই দ্বীপটি যে গভর্নমেন্টের অধীন, গুপ্তধনের উপরে এখন একমাত্র অধিকার আছে তারই। কিন্তু এখানে তার কথা ধর্তব্যই নয়। তবে সে-গুপ্তধন অধিকার করতে পারে কে? পাবলোও পারে, আমরাও পারি। যার বুদ্ধি বেশি, গুপ্তধন হবে তার!'

—'যুক্তিটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলুন।'

—'ম্যাপের কোণে লেখা হেঁয়ালিটা দেখেছেন তো? যে ওই হেঁয়ালির পাঠোদ্ধার করতে পারবে, সেই হবে গুপ্তধনের যথার্থ অধিকারী। মনোহরবাবু যে ওই হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারেননি, তাঁর ডায়েরি পড়লেই সেটা বেশ জানা যায়। তারপর ওই পাবলো। যতদূর আন্দাজ করা যায়, সে সারাঙ্গানি দ্বীপের অবস্থান আর গুপ্তধনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু ম্যাপের হেঁয়ালি তার জানা থাকলে সে এই দূর দেশে নিজের জীবন বিপন্ন করে ম্যাপখানা চুরি করতে আসত না। ম্যাপের প্রান্তে লেখা হেঁয়ালির অংশটা সে হস্তগত করতেও পেরেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে-অংশটা আবার আমরা তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পেরেছি। খুব সম্ভব হেঁয়ালির অর্থ এখনও সে আবিষ্কার করতে পারেনি। আর পারলেও হেঁয়ালিটা এখন আর তার কাছে নেই। এইবারে আমাদের নিজেদের কথা ধরুন, কারণ হেঁয়ালি আছে আমাদেরই কাছে।'

—'কিন্তু হেঁয়ালিটা আমরা বুঝতে পেরেছি কি?'

—'উত্তরে আমিও একটা প্রশ্ন করি। বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন কি?'

—'তা অবশ্য করিনি।'

—'কিন্তু আমি বোঝবার চেষ্টা করেছি।'

—'কিছু বুঝেছেন?'

—'নিশ্চয়!'

—'বলেন কী, এত তাড়াতাড়ি!'

—'জয়ন্তবাবু, ছেলেবেলা থেকেই এইরকম সব সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধার করে আসছি। ওটা আমার একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ইংরেজিতে ও-সম্বন্ধে অনেক কেতাবও আছে। সেসব পড়লে বোঝা যায়, পৃথিবীতে সাংকেতিক লিপি রচনার নিয়ম আর কৌশল আছে কতরকম! এ-এক বিচিত্র 'সাহিত্য'! সাংকেতিক লিপি রচনার কোনও পদ্ধতিই আজ আর বোধহয় অজানা নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ বিমলবাবু, এই অদ্ভুত 'সাহিত্য' নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি আমিও। সময়ে সময়ে তার সাহায্যে অনেক রহস্যময় মামলার কিনারাও করতে পেরেছি।'

—'আধুনিক ডিটেকটিভ কাহিনির জন্মদাতা এডগার অ্যালেন পো সাহেবও এইরকম সাংকেতিক লিপির রহস্যউদ্ধারের জন্যে অনেক গবেষণা করে গিয়েছেন। বলতে কী, তাঁর 'Gold bug' নামে বিখ্যাত গল্পটি পড়েই এদিকে আমার প্রথম ঝোঁক জাগে।'

মানিক বললে, 'বিমলবাবু, খুব হালেই জয়ন্ত যে 'সোনার আনারস' * মামলার কিনারা করেছিল, আপনি তার কথা শোনেননি বুঝি?'

—'না।'

—'তার ভিতরেও ছিল একটি অদ্ভুত সাংকেতিক ছড়া। বহুকাল ধরে কেউ তার অর্থ আবিষ্কার করতে পারেনি, কিন্তু জয়ন্ত তার রহস্য ভেদ করে অবাক করে দিয়েছিল সবাইকেই!'

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে মৌনব্রত ভঙ্গ করে বললেন, 'হুম! বাব্বা, সে কী কাণ্ড! জয়ন্তের বুদ্ধি হচ্ছে যাকে বলে ক্ষুরধার! আমার মতন লোকও ওর কাছে পদে পদে হার মানতে বাধ্য হয়, অথচ পুলিশে চাকরি করে আমি মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম। হুঁ হু, এ বড়ো চারটি-খানেক কথা নয়!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, জয়ন্তবাবুর তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর কারুর চেয়েই কম নয়!'

জয়ন্ত লজ্জিত কণ্ঠে বললে, 'আপনারা দয়া করে থামুন। সামনা-সামনি প্রশংসা আমার মনে হয় গালাগালির মতো।'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'কিন্তু সামনা-সামনি গালাগালিকে আপনি প্রশংসা বলে মনে করতে পারেন?'

—'না, তাও পারি না। আমার মত কী জানেন? সামনা-সামনি প্রশংসা আর গালাগালি, ও দুটো ব্যাপারই হচ্ছে ভদ্রলোকের পক্ষে অসহনীয়। আমি ওর কোনওটারই পক্ষপাতী নই। হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল! কথায় কথায় আসল কথাই চাপা পড়ে যাচ্ছে। তাহলে বিমলবাবু, আপনি ওই ম্যাপের হেঁয়ালির মানে বুঝতে পেরেছেন?'

—'পেরেছি।'

—'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অর্থ উদ্ধার করলেন কেমন করে?'

—'কারণ এর সংকেতগুলো অত্যন্ত সহজ। যারা দীর্ঘকাল ধরে সাংকেতিক লিপি নিয়ে আলোচনা করেছে, তাদের কাছে এই ম্যাপের সংকেতগুলো হচ্ছে ক-খ-গ-ঘ-এর মতন সোজা।'

—'বেশ, আপনার কথাই মানলুম। ম্যাপের রহস্য কী, আপাতত তাও আমি জানতে চাই না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

—'অনায়াসে।'

—'আপনি তো সুলু সাগরের ওই বোম্বেটে দ্বীপে যেতে চান?'

—'অবশ্য।'

—'গুপ্তধন উদ্ধার করতে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আইন বা অন্যান্য কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু সাধারণ আইনের উপরে আর-একটা উচ্চতর আইন আছে। একথা আপনি মানেন তো? সে আইনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের উচ্চতর হৃদয়?'

---

*'সোনার আনারস' উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

বিমল দাঁড়িয়ে উঠল। জয়ন্তের একখানি হাত নিজের ডান হাতের মুষ্টির ভিতরে গ্রহণ করে মৃদু হাসি হাসতে হাসতে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝেছি। আমরা যদি গুপ্তকথা জানতে পেরে গোপনে গুপ্তধন উদ্ধার করে নিজেদের মধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা করে নি, তাহলে চলতি কোনও আইনই আমাদের বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু এই যে একখানি ছোট্ট ম্যাপের অজানা হেঁয়ালি, এর জন্যেই মনোহরবাবু কিছু ভালো করে না জেনেও নিজের প্রাণ দিয়ে সহধর্মিনী আর অন্যান্য পোষ্যদের অনাথ করে গিয়েছেন। সুতরাং এই ম্যাপেরই সাহায্যে যদি সত্যসত্যই গুপ্তধন পাওয়া যায়, তাহলে তার উপরে দাবি-দাওয়া থাকা উচিত কেবল মনোহরবাবুর পরিবারবর্গেরই। কেমন, আপনি এই কথাই বলতে চান তো?'

—'হ্যাঁ বিমলবাবু।'

—'কিন্তু একথা তো বলাই বাহুল্য! জেনে রাখুন, গুপ্তধন যদি পাই তা আমরা স্পর্শও করব না।'

সুন্দরবাবু একটু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'তবে গুপ্তধন আনতে যাবার জন্যে আপনার এত বেশি আগ্রহ কেন?'

বিমল পরিপূর্ণ স্বরে বললে, 'আগ্রহ কেন? আগ্রহ কেন? গুপ্তধন পেলেও তার উপরে অধিকার থাকবে কেবলমাত্র মনোহরবাবুর পরিবারবর্গের। কিন্তু আসলে গুপ্তধনের জন্যে আমাদের নিজেদের কোনওই আগ্রহ নেই। আমরা সুলু সাগরে তরণী ভাসাতে চাই অন্য কারণে।'

পুলিশের পুরাতন কর্মচারী সুন্দরবাবু। দীর্ঘকাল ধরে চোর-ডাকাত-খুনিদের সংসর্গে থেকে থেকে মানুষের নিঃস্বার্থতা ও উচ্চতর প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। কাজেই একটু চাপা হাসি হেসে বললেন, 'কারণটা কী শুনতে পাই না?'

জয়ন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'আঃ! সুন্দরবাবু, কী বলছেন!'

কিন্তু ইতিমধ্যে কুমার উঠেছে দাঁড়িয়ে। সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'কারণটা কী, শুনতে চান? আমরা কারুর মুখাপেক্ষী নই, কারুর দাসত্বও আমরা করি না! ভগবান আমাদের যে ঐশ্বর্য দিয়েছেন, অনায়াসেই আমরা রাজা বা মহারাজা খেতাব লাভ করতে পারতুম—বুঝেছেন সুন্দরবাবু? ঐশ্বর্য বাড়াবার জন্যে আমরা গুপ্তধন আনতে যাচ্ছি না—আমরা যেতে চাই কেবল এই সুযোগে বিপুলা ধরণীর জলেস্থলে অথবা শূন্যে আর একবার নিজেদের ছড়িয়ে দিতে দিকে দিকে! চাই ঘটনা, চাই উত্তেজনা, চাই উন্মাদনা! মোহরের স্তূপ অন্বেষণ করুক লক্ষ্মীপেচকরা, কিন্তু আমরা খুঁজতে চাই বারুদের স্তূপ—পদে পদে যেখানে বিপদের সম্ভাবনা! বিপদের মধ্যে কতখানি 'রোমান্স' আছে আপনি তার কতটুকু খবর রাখেন সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বাস রে বাস, বিপদের মধ্যে 'রোমান্স'! আপনারা দেখছি জয়ন্ত আর মানিকের উপরেও টেক্কা মারতে চান! বিপদের মধ্যে আবার 'রোমান্স' কী-রে বাবা?'

মানিক বললে, 'সে তো আপনি বুঝবেন না সুন্দরবাবু! ভগবান কোনও কোনও জীবকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন কেবল ভারবহন করবার জন্যে, তাদের তো 'রোমান্সে'র খবর রাখবার কথা নয়!'

সুন্দরবাবু দুই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এর মানেটা কী হল? আমি হচ্ছি ভারবাহী জীব? আমি হচ্ছি গর্দভ?'

মানিক ঠোঁট টিপে হেসে বললে, 'সে কী কথা? গর্দভের তো লাঙ্গুল থাকে, আপনার লাঙ্গুল কই?'

—'হুম! তুমি হচ্ছ প্রচণ্ড নচ্ছার! আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই না!' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত বললে, 'বড্ড বাজে কথা হচ্ছে! এখন কাজের কথা হোক। বিমলবাবু, আবার জিজ্ঞাসা করি, তাহলে আপনি সুলু সাগরে যাত্রা করতে চান?'

—'ও-সম্বন্ধে কি এখনও আপনার সন্দেহ আছে?'

—'আপনার সঙ্গী তো চাই?'

—'নিশ্চয়!'

—'সঙ্গে যাবেন কে কে?'

—'আপনি, মানিক, কুমার—আর যদি ইচ্ছা করেন তো সুন্দরবাবু।'

—'হুম, আমি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কিন্তু এই বুড়ো বয়সে আমি কি তোমাদের ওই বিপদের 'রোমান্স' হজম করতে পারব?'

—'পুলিশ হয়ে এই কথা বলছেন!'

—'ভায়া, পুলিশের চাকরিতে যে পদে পদে বিপদের ভয় একথা মানি। তবে কী জানেন, সে-সব হচ্ছে চেনা বিপদ, তাদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর আছে আমার নখদর্পণে। কিন্তু আপনারা যে- সব অজানা বিপদকে জলে-স্থলে-শূন্যে খুঁজে বেড়ান, আমার ধারণায় তারা ধরা পড়ে না! এই যে সারাঙ্গানি দ্বীপ নামে একটা উদ্ভুট্টে জায়গায় যাবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ করছেন, ওখানে কি মানুষে যায়? একে তো শুনছি সে হচ্ছে শ্মশানের মতন ঠাঁই, কোন অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় সে-অঞ্চলের বাসিন্দারা পর্যন্ত গুপ্তধনের লোভেও সেখানে পা বাড়াতে ভরসা পায় না, তার উপরে সেই বোম্বেটে বেটা নাকি মরবার সময়ে অভিশাপ দিয়ে গিয়েছে—ও-দ্বীপে যে যাবে সে আর ফিরবে না। এমন অভিশাপের অর্থ কী? বোম্বেটেটা যেসব নারীকে দ্বীপে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে, তারা কি আজ যক হয়ে পাহারা দিচ্ছে গুপ্তধনের উপরে?'

মানিক বললে, 'যক নয় সুন্দরবাবু, যক্ষিণী।'

—'যক্ষিণী?'

—'হ্যাঁ। সংস্কৃতে 'যক'কে বলে 'যক্ষ'। আর যক্ষের বউকে বলে 'যক্ষিণী'। কাজেই সারাঙ্গানি দ্বীপে যেসব স্ত্রীলোককে হত্যা করা হয়েছে, তাদের প্রেতাত্মাকে যক্ষিণী বলেই ডাকা উচিত।'

—'ও বাবা!'

—'আমরা সব জোয়ান পুরুষ-মানুষ, মেয়ে-ভূতকে আবার ভয়টা কীসের? যক্ষিণী কখনও দেখিনি, এইবারে দেখবার সুযোগ পাব?'

—'আমি যক্ষিণী দেখতে রাজি নই।'

—'রাজি নই বললে কি চলে? আমরা যখন যাচ্ছি, আপনাকে যেতেই হবে!'

—'কী একটা গানে আছে না—'ছাড়বে না সন্ন্যাসী তোমায় কাশী দেখাবে'—তোমরাও তাই করতে চাও নাকি?'

—'হুম!'

—'আমাকে যেতেই হবে?'

—'হুম!'

—'আরে গেল, বার বার 'হুম' বলছ কেন?

—'আপনি বার বার 'হুম' বলতে পারেন, আমি পারি না? 'হুম' শব্দটা কি আপনারই একচেটে?'

সুন্দরবাবু হেসে ফেলে বললেন, 'ও, আমাকে রাগাবার চেষ্টা হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা দেখি, কেমন করে তুমি আমাকে রাগাও? আজ আমি কিছুতেই রাগব না!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'যাক, সুন্দরবাবু তবে আজ ক্রোধকে 'বয়কট' করলেন, বাঁচা গেল! তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তো?'

—'অগত্যা। ছিনে জোঁকদের পাল্লায় পড়েছি, উপায় কী?'

—'এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে, কবে আমরা যাত্রা করব বিমলবাবু?'

—'দিন-চারেক লাগবে জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিতে।'

—'কী রকম জিনিস-পত্তর?'

—'এই ধরুন, সর্বাগ্রে দরকার একটা মেশিনগান।'

—'মেশিনগান?'

—'হ্যাঁ। আমাদের সঙ্গে অটোমেটিক বন্দুক, রিভলভার আর হাত-বোমা প্রভৃতি অস্ত্র থাকবে বটে, কিন্তু তার উপরেও চাই অন্তত একটা মেশিনগান।'

—'কিন্তু মেশিনগান পাবেন কোথায়?'

—'একটু চেষ্টা করলেই মেশিনগান জোগাড় করতে পারি।'

—'বৈধ, না অবৈধ উপায়ে?'

—'বৈধ উপায়েই। অবশ্য সুপারিশের দরকার।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু মেশিনগান কী হবে? কাদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব?'

মানিক বললে, 'যক্ষিণীদের সঙ্গে। বিনা যুদ্ধে তারা গুপ্তধন ছাড়বে কেন?'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না মানিক, ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে।'

বিমল হাস্যমুখে বললে, 'আশ্বস্ত হোন সুন্দরবাবু, আশ্বস্ত হোন। যাচ্ছি অজানা দ্বীপে, না-জানা বিপদ-আপদের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে তো? মেশিনগানের মতো একটা অস্ত্র সঙ্গে থাকলে দলে ভারী না হলেও আমরা মনের ভিতরে জোর পাব কতখানি! কী বলেন জয়ন্তবাবু?'

—'সে কথা ঠিক। কিন্তু কবে, কোথা থেকে আমরা কোন জাহাজে উঠব?'

—'জাহাজ? জাহাজ কেন? জাহাজ, রেলগাড়ি ওসব তো সেকেলে ব্যাপার! এ যুগ হচ্ছে 'স্পিডে'র যুগ, মানুষ চায় বিদ্যুৎ-গতির সঙ্গে ছুটতে। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের গতি করে তুলেছে অধিকতর দ্রুত। ভেবে দেখুন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। মানুষ তখন কেবল পায়ে হেঁটে চলা-ফেরা করত। তারপর বেশি সভ্য হয়ে সে ঘোড়া, হাতি, উটদের বশ করলে, আরও তাড়াতাড়ি এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার জন্যে। কিছুকাল পরে তাতেও তার পোষাল না, আবিষ্কার করলে বেগবান বাষ্পীয় পোত, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি। তারপর এসেছে আধুনিক—অর্থাৎ আজকের যুগ। আজ মানুষ আরও বেগে ছুটতে চায়, তাই আবিষ্কার করেছে বিমানপোত। জয়ন্তবাবু, আমরা যাব এরোপ্লেনে!'

সুন্দরবাবু চমকে লাফিয়ে উঠলেন। সভয়ে বললেন, 'এরোপ্লেন? অসম্ভব!'

—'কেন?'

—'ছেলেবেলায় নাগরদোলায় চড়লেই বন বন করে আমার মাথা ঘুরত। এ বয়সে এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে আকাশে ঘুরতে আমি পারব না।'

জয়ন্ত বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সবতাতেই আপনার আপত্তি!'

সুন্দরবাবু আবার বসে পড়ে কাঁচুমাচু মুখে করুণ স্বরে বললেন, 'ভায়া, তোমরা বুঝছ না। আমি হচ্ছি গত যুগের রক্ষণশীল মানুষ, আর তোমরা হচ্ছ বিশ শতাব্দীর মানসপুত্র—অতীতের বিরুদ্ধে করো যুদ্ধঘোষণা। আমরা জড়িয়ে থাকতে চাই চিরপরিচিত অতীতকে, আর তোমরা চাও উল্কার মতন ছুটে যেতে অপরিচিত ভবিষ্যতের দিকে। আমরা চাই পিছোতে, তোমরা চাও এগুতে। কাজেই তোমাদের বুঝতে পারি না, ভয় পাই তোমাদের কথায়। এ কেবল বুদ্ধির দোষ নয়, আমাদের অভ্যাসের দোষ! কাঁচা চুলের সঙ্গে পাকা চুলের তফাত যে এইখানেই।'

মানিক সহানুভূতির সঙ্গে বললে, 'অন্যান্য পাকাচুলদের কথা ছেড়ে দিন সুন্দরবাবু, চোখ মুদে তারা খালি পিছোতেই জানে। কিন্তু আপনার বিশেষত্ব আছে। আপনি প্রথমে অভ্যাস-দোষে দু-পা পিছিয়ে যান বটে, কিন্তু তারপরেই আমাদের সঙ্গে ছুটে আসতে পারেন সামনের দিকে। তার মানে, আজও আপনি 'ফসিলে' পরিণত হননি।'

কুমার বললে, 'বিমল, রামহরি এক মাস ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, তাকে কি এবারে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে?'

বিমল বললে, 'না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তবেই সেরেছে! আপনাদের সঙ্গে বিদেশ যাত্রার সময়ে আমার সর্বপ্রধান আকর্ষণ হয় রামহরি।'

—'কেন?'

—'অমন খাসা রাঁধতে কেউ পারে না—আহা, রান্না তো নয়, অমৃত!'

বিমল বললে, 'মাভৈ! রামহরি থাকবে না বটে, কিন্তু রন্ধনে তার নিজের হাতে-গড়া শিষ্য বিমল আর কুমার থাকবে তো?'

মানিক বললে, 'বাঘাও তো আমাদের সঙ্গে যাবে না?'

বিমল বললে, 'বলেন কী, তাও কখনও হয়? বাঘার মতন বন্ধু আমাদের কে আছে? বাঘা- হীন জীবন আমরা কল্পনাও করতে পারি না!' বাঘা খানিক তফাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, কিন্তু তার নাম হচ্ছে শুনে তাড়াতাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বিমলের কাছে এসে দাঁড়াল—তার ভাবটা এই : আমি হাজির। এখন কী হুকুম?

পাঁচ

সুন্দরবাবু এরোপ্লেনে চড়বেন না

রেঙ্গুন—সিঙ্গাপুর—ব্রিটিশ বোর্নিয়ো! সেখান থেকে ফিলিপাইনের মিন্ডানাও দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে। আপাতত তাদের আকাশ-ভ্রমণ শেষ হল।

এই আধুনিক ভ্রমণে 'স্পিড' থাকতে পারে, কিন্তু বর্ণনা করবার কথা বিশেষ কিছুই থাকে না। ট্রেনে বা জাহাজে চড়ে পথে বেরুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেক কিছুই। ট্রেন নানা দেশ মাড়িয়ে মাড়িয়ে ছোটে—কত রকম দৃশ্য, কত রকম পাহাড়, নদী, মাঠ, বন, কতরকম জাতের লোকের কত ভাষার কথা—চোখের সুমুখ দিয়ে যেন সবাক সিনেমার ছবির পর ছবির শোভাযাত্রা! জাহাজও থামে দেশে

দেশে বন্দরে বন্দরে, সে-ও জোগায় নব নব বৈচিত্রের খোরাক, সেই মানুষের আঁখি-পাখিকে ছোটায় পৃথিবীর নানা সাজঘরের পর্দা তুলে দিকে দিকে।

উড়োজাহাজও যখন প্রথমে শূন্যে ওঠে চোখে তখন মন্দ লাগে না। বিপুলা ধরণী গা এলিয়ে শুয়ে থাকে অনেক—অনেক নীচে। তার গন্ধ বা ধ্বনির ছন্দ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু চোখে দেখা যায় তার রামধনু রঙের ঐশ্বর্য। সেখানেও ছবির পর ছবি—কিন্তু রিলিফ মানচিত্রের মতো। একসঙ্গেই অনেকটা দেখা হয়ে যায়, এক-একখানা করে বইয়ের পাতা উলটে নতুন নতুন ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মনে যেমন অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আনন্দ-ছন্দ জাগে, উড়োজাহাজের দর্শকরা তাথেকে হয় বঞ্চিত। পৃথিবীর বুকে বসে পৃথিবীকে দেখা আর পৃথিবী ছাড়িয়ে উপরে উঠে দূর থেকে পৃথিবীকে দেখা, এর মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। বিমানপোতের যাত্রীরা যেন অন্য গ্রহ থেকে দেখে নিজেদের পৃথিবীকে!

আরও একটু নূতনত্ব আছে। এক-একবার মাথার উপরে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখি নির্মল নীলিমাকে, আবার এক-একবার নীলচন্দ্রাতপের আওতায় গিয়ে পায়ের তলায় তাকিয়ে মেঘ-বাতায়ন দিয়ে নজর চালিয়ে দেখি রূপসী ধরণীর খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকে। কখনও তোমার উপরে মেঘছত্র, কখনও তোমার নীচে মেঘের আসন। পৃথিবীকে কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না।

অনেক উঁচু থেকে একবার নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করেই সুন্দরবাবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত রক্ত-ছোটাছুটির কোলাহল তিনি শুনতে পেলেন স্বকর্ণে! মনে হল খবরের কাগজে তো প্রায়ই পড়া যায়, ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ায় এরোপ্লেন 'পপাত ধরণীতলে' হয়ে যাত্রীসমেত একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এখনই তো সেইরকম একটা কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে? উঃ! সুন্দরবাবুর মাথার ভিতরটা ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ। সেই যে তিনি চোখ ফিরিয়েছিলেন, আর একবারও নীচের দিকে চাইতে সাহস করেননি। তাঁকে দেখাচ্ছিল জীবন্মৃতের মতো। মানিকের বাছা বাছা ধারালো টিটকারিও জাগ্রত করতে পারেনি তাঁর দ্বিতীয় রিপুকে।

যাত্রাশেষে পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'বাবা অনেক পুণ্য করেছিলেন, তারই মহিমায় এ-যাত্রা কোনওগতিকে বেঁচে গেলুম। তোমরা যতই ধিক্কার দাও আর যতই আবদার করো, ফেরবার পথে আমি আর কিছুতেই এরোপ্লেনে চড়ব না! না, না, না, কিছুতেই না—হুম!'

মানিক সকৌতুকে বললে, 'আপনি কি আর দেশে ফিরতে পারবেন?'

—'মানে?'

—'সারাঙ্গানি দ্বীপের কোনও কঙ্কালময়ী যক্ষিণী হয়তো আপনাকে বিয়ে করে আর ছাড়তে চাইবে না!'

—'যাও, যাও, বাজে বোকো না!'

—'দেখবেন!'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢের দেখছি—এবারেও দেখব!'

মানিক খিলখিল করে হাসতে লাগল এবং সুন্দরবাবু গজরাতে লাগলেন হুম হুম রবে।

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, আমরা ভারতের অতীত কীর্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়ার জন্যে বৃহত্তর ভারতে—অর্থাৎ ওদিকে কাম্বোডিয়ার আর এদিকে বোর্নিয়ো, সুমাত্রা আর জাভা প্রভৃতি দ্বীপে ভ্রমণ করেছি বটে, কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপে পদার্পণ করবার সুযোগ কখনও পাইনি। এই দ্বীপ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?'

বিমল বললে, 'আমি আর কুমার এ অঞ্চলে দু-বার এসেছি, আমরা এখানকার কথা কিছু কিছু জানি বটে! আচ্ছা, কুমার। তুমি জয়ন্তবাবুকে ফিলিপাইনের কাহিনি শোনাও, আমি ততক্ষণে একটু এদিকে-ওদিকে ঘুরে দেখে আসি, একখানা চিনে 'জাঙ্ক' ভাড়া পাওয়া যায় কি না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'চিনে 'জাঙ্ক' কী আবার?'

—'একরকম উঁচু পাল তোলা চিনে নৌকো, ছোট্ট জাহাজ বলাও চলে। সমুদ্রে ভাসতে পারে। তলদেশ সমতল। জাপানিরাও এইরকম পোত ব্যবহার করে।'

—'ও ভাড়া করে কী হবে?'

—'সুলু সমুদ্রে তরণী ভাসিয়ে ম্যাপের সেই দ্বীপে উঠতে হবে তো? আয়রে বাঘা, আমার সঙ্গে চল! দুই বন্ধুতে খানিক বেড়িয়ে আসি।'

জলপথ বা স্থলপথ বাঘাকে বিচলিত করতে পারে না। কিন্তু সুন্দরবাবুর মতো তারও শূন্যপথ ছিল না মোটেই পছন্দসই। শূন্যপথের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে—সে অভিজ্ঞতা আনন্দজনক নয় আদৌ।* কাজেই এরোপ্লেনে চড়ে এখনও পর্যন্ত তার মন খারাপ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হচ্ছিল, আবার বুঝি সেই অমঙ্গুলে মঙ্গলগ্রহের কিম্ভুতকিমাকার বাসিন্দাদের পাল্লায় গিয়ে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে হবে। এখন পায়ের তলায় ফের পৃথিবীর মাটি খুঁজে পেয়ে সে আশ্বস্ত হয়ে বোধকরি ভাবছিল, মানুষদের দেশ ছাড়া কুকুরদের আর কোনও দেশে যাওয়া উচিত নয়! এখন বিমলের আহ্বান শুনেই সে টক করে উঠে দাঁড়িয়ে কুমারের পানে তাকিয়ে বললে 'ঘেউ, ঘেউ' (অর্থ বোধহয়—'আসি কর্তা'), তারপর লাঙ্গুলকে জয়পতাকার মতন উর্দ্ধে তুলে তাড়াতাড়ি ছুটল বিমলের পিছনে পিছনে।

জয়ন্ত বললে, 'কুমারবাবু, এইবারে ফিলিপাইন সম্বন্ধে আমাকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করুন।'

কুমার যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই :

'ফিলিপাইন একটা দ্বীপ নয়—অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি। ফিলিপাইন বলতে বুঝায়, ছোটো-বড়ো সাত হাজারেরও বেশি দ্বীপ। তার কোনও কোনও দ্বীপ খুব বড়ো—যেমন উত্তরে 'লুজন' ও দক্ষিণে 'মিন্ডানাও' দ্বীপ। কোনও কোনও দ্বীপ মাঝারি—যেমন 'পালাওয়ান', 'নেগ্রোস', 'প্যানে', 'সমর', 'কেবু' ও 'মিন্ডোরো'। কোনও কোনও দ্বীপ ছোটো—তাদের নাম করবার দরকার নেই। আবার কোনও কোনও দ্বীপ এত খুদে যে, একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়। সারাঙ্গানি দ্বীপ খুব সম্ভব ওই-রকমই—বাজার চলতি বা ইস্কুলের ম্যাপে তার কোনওই ঠাঁই নেই। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী 'ম্যানিলা' নগর আছে উত্তরের 'লুজন' দ্বীপে। সমগ্র ফিলিপাইনের লোকসংখ্যা হচ্ছে এক কোটি তেইশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত (অবশ্য এক যুগেরও আগেকার আদমসুমারিতে—লোকসংখ্যা এখন নিশ্চয়ই বেড়েছে)।

ফিলিপাইনের বাসিন্দা ফিলিপিনোরা অসভ্য নয়—ইংরেজরা যখন ছিল প্রায় বর্বরের মতো, ফিলিপিনোরা ছিল তখন রীতিমতো সভ্য। ইংরেজরা যখন চামড়ার পোশাক ছাড়া অন্য কিছু পরতে জানত না, ফিলিপিনোরা তখনও রেশম ও কার্পাস প্রভৃতির পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে বিখ্যাত হয়েছিল। সোনা রুপা ও জড়োয়ার কাজের জন্যেও তারা কম বিখ্যাত ছিল না। এমনকি সেই প্রাচীন যুগেই তারা বারুদের ব্যবহার জানত এবং তাদের কামান-বন্দুক তৈরি করবার জন্যে কারখানাও ছিল। তবে ভারতবর্ষের মতো ফিলিপাইনের মধ্যেও এখানে ওখানে রীতিমতো অসভ্য অথবা আদিম জাতির

---

*লেখকের 'মেঘদূতের মর্তে আগমন' দ্রষ্টব্য।

অভাব নেই—যেমন 'নেগ্রিটো', 'মোরো', 'ইগোরোট', 'ইলনগট', 'গ্যাডডেন্স', 'কালিঙ্গা', 'মান্ডায়া', 'ইফুগায়ো', 'ইটাভি' প্রভৃতি। কোনও কোনও অসভ্য জাতি শ্বেতাঙ্গদের চেষ্টায় আজকাল 'সভ্য' হয়েছে বলে গর্ব করতে পারে অল্পবিস্তর পরিমাণে!

এখানে চিনেম্যানদের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। ফিলিপিনোরাও চিনেদের মতোই মঙ্গোলীয় জাতিরই অন্তর্গত। সাধারণ ফিলিপিনোরা তেমন পরিশ্রমী নয়—ব্যাবসা-বাণিজ্যেও তারা সহজে মাথা ঘামাতে চায় না। সুচতুর ও কর্মঠ চিনেম্যানরাই ওসব ক্ষেত্রে বাজার প্রায় দখল করে আছে—বাংলাদেশে মাড়োয়ারি ও অন্যান্য অবাঙালি জাতিদের মতো।

ফিলিপাইনকে কোনও কোনও গ্রন্থে 'অশান্তির দ্বীপ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অভিযোগ মিথ্যা নয়। হতভাগ্য ফিলিপিনোরা স্বাধীনতা ভালোবাসে, অথচ নানা কারণে তাদের মালয়বাসীগণের, চিনেদের, স্পানিয়ার্ডদের ও আমেরিকানদের প্রভুত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তারা হয়েছিল ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জাপানিদের করতলগত। অবশ্য তারপর এখন তারা হয়েছে স্বাধীন—যদিও এখনও পর্যন্ত তাদের উপরে আমেরিকার প্রভাবই আছে কম-বেশি মাত্রায়।

ষোলো শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জে অমানুষিক অত্যাচার করে এখানে এসে হাজির হয় স্পেনীয় জলদস্যুরা। ফিলিপিনোরা কাপুরুষ ছিল না, তাদের সঙ্গে ওই নিষ্ঠুর জলদস্যুদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে বহু বৎসর ধরে। খুব সম্ভব বোম্বেটে সারাঙ্গানি ছিল ওই জলদস্যুদেরই একজন।

প্রাচীন ফিলিপিনোদের নিজেদের সাহিত্য এবং ললিতকলা ছিল, কিন্তু তথাকথিত সভ্যতাগর্বিত স্পানিয়ার্ডরা সেসব প্রায় নিঃশেষে ধ্বংস করেছে। ভগবানের অভিশাপে এই স্পানিয়ার্ডরা পৃথিবীতে আজ কোণঠাসা হয়ে আছে এবং শ্বেত বা অশ্বেত কোনও জাতিই তাদের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করে না। যখন তাদের ছিল পাশবিক ক্ষমতা, তখন তারা দক্ষিণ আমেরিকা এবং অন্যান্য বহু স্থানে অগ্নি, তরবারি ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল প্রাণপণ চেষ্টায়! কিন্তু আপাতত যাকগে সেসব কথা।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ভিতরে প্রকৃতি খুলে দিয়েছে তার বিচিত্র সাজঘর। কোথাও আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের পর পাহাড়, এবং তাদের মাঝে মাঝে তরুশ্যামল ও নির্ঝরসরস উপত্যকা; কোথাও নৃত্যশীলা গীতিময়ী তটিনী এবং এখানে-ওখানে রূপসুন্দর নীল সরোবর; কোথাও উর্বর সমতল শস্যক্ষেত্র আর ঘাসের গালিচা পাতা তেপান্তরের মাঠ এবং আশেপাশে বিপুল অরণ্যের সবুজ সমারোহ!

বড়ো বড়ো বনের মধ্যে অসংখ্য মূল্যবান বৃক্ষ আছে, তারা সেগুন, আবলুস ও চন্দন প্রভৃতি কাঠ সরবরাহ করে। এখানে নারিকেল, আনারস, তেঁতুল, চা, কফি, কোকো, নীল, ইক্ষু, ধান, কার্পাস, গাঁজা, তামাক ও কদলী প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সোনা, তামা ও কয়লার খনিরও অভাব নেই।

কোনও কোনও মাসে অতিরিক্ত গরম পড়ে বটে, কিন্তু সাধারণত এখানকার আবহাওয়া বেশ প্রীতিকর। বেশি গরমের সময়ে যারা বাইরে কাজ করে, তারা দুপুরের পর কাজ থামিয়ে করে দিবানিদ্রার আনন্দ উপভোগ।

প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলে জাপানের মতো ফিলিপাইনেও বেশির ভাগ বাড়ি ইট-পাথর দিয়ে তৈরি করা হয় না। অধিকাংশই কাঠের বাড়ি। এখানে সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলিতে 'টাইফুন' নামক ভয়াবহ ঝড়েরও প্রভাব অত্যন্ত বেশি। যেসব দ্বীপের জঙ্গলে থাকে অসভ্য জাতিরা, সেখানকার ঘরবাড়ি নির্মাণের প্রথা আলাদা। এক অসভ্য জাতি অন্য অসভ্য জাতিকে পছন্দ করে না, পরস্পরের মধ্যে

যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, খুনোখুনি লেগেই আছে। তাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হবার জন্যে তারা দুরারোহ পাহাড়ের উপত্যকা বা মস্ত মস্ত গাছের উঁচু ডালের উপরে তৈরি করে বাস করবার ঘর।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এসে আধুনিক ফিলিপিনোদের অধিকাংশই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। বেশির ভাগ লোকই ইউরোপীয় পোশাক পরে—যদিও তারা নিজেদের জাতীয়তার বিশিষ্টতা হারায়নি। এখানকার শহরগুলিতেও আধুনিকতার কোনও উপকরণেরই অভাব নেই—বিজলি বাতি ও পাখা, বৈদ্যুতিক ট্রাম, মোটরগাড়ি, রেডিয়ো, প্রশস্ত বাঁধানো রাজপথ, বড়ো বড়ো লোহার সাঁকো, ইস্কুল, কলেজ, বাজার, সুগঠিত গির্জা, প্রাসাদ, অট্টালিকা।

এইবার কোনও কোনও অসভ্য জাতির কথা বলি।

উত্তরের লুজন দ্বীপের ইগোরোটরা হচ্ছে একটি প্রধান অসভ্য জাতি। তাদের গায়ের রং ঘোর তামাটে। থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, দুই গালের হাড় উঁচু। তাদের চওড়া বুক ও পেশিবদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেয় বিপুল শক্তির পরিচয়। তারা মোটেই পছন্দ করে না আধুনিক সভ্যতা।

ওই দ্বীপেই বাস করে গ্যাডডেন্স নামে আর-এক অসভ্য জাতি, তারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়। লুজন-এ আর দুটি অসভ্য জাতি আছে—ইটাভি ও ইফুগায়ো। শেষোক্ত জাতের লোকদের ধর্ম ছিল নরমুণ্ড শিকার করা।

ফিলিপাইনে আরও অনেক অসভ্য জাতি আছে, সকলকার কথা বলবার দরকার নেই।

আমরা যে মিন্ডানাও দ্বীপে এসে উঠেছি, এটি আকারে ৩৬,৯০৬ বর্গ মাইল। এর লোক সংখ্যা ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার।

এখানকার প্রধান অসভ্য জাতিকে মোরো বলে ডাকা হয়। ধর্মে এরা মুসলমান। মোরোরা মিন্ডানাও দ্বীপে এবং নিকটস্থ সুলু দ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। স্পানিয়ার্ড ও আমেরিকানদের সঙ্গে তারা বরাবরই যুদ্ধ করে এসেছে। মালয়বাসীদের সঙ্গে তাদের একটা জাতিগত সম্পর্ক আছে।

মাঝে মাঝে তারা সুলু সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়ে ছোটো ছোটো দ্বীপের উপরে গিয়ে হানা দেয়। এইজন্যে এইসব ছোটো দ্বীপের বাসিন্দারা তাদের যমের মতো ভয় করে।

তাদের স্বাস্থ্যসুন্দর দেহ মাঝারি আকারের, মাথার চুল ও গায়ের রং কালো এবং দৃষ্টি খুব ধারালো। সাধারণত ফিলিপাইনের অন্যান্য অসভ্য জাতিদের তুলনায় তারা অনেকটা অগ্রসর। বেশ সহজেই গ্রহণ করতে পারে পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার। তাদের সাজপোশাকেও অপেক্ষাকৃত উন্নত রুচির প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল সভ্যতার সম্পর্কে এসে অধিকাংশ মোরোই হয়েছে শান্ত ও সংযত। মোরো নারীরাও রংচঙে পোশাক পরতে ভারী ভালোবাসে।

এখানে মান্ডায়া নামে আর-এক অসভ্য জাত আছে। তাদের সর্দারদের ডাকা হয় 'বাগানী' নামে। বহু নরহত্যা করতে না পারলে কেউ 'বাগানী' উপাধি লাভ করতে পারে না। মান্ডার নারীদের গায়ের রং ফরসা।

মহিষ হচ্ছে ফিলিপাইনের একটি অত্যন্ত কাজের জীব। মহিষকে এখানে ডাকা হয় 'কারাবাও' বলে। পুরুষ-মহিষরা গাড়ি টানে, শষ্য-খেতে কাজ করে। স্ত্রী-মহিষরা দুধ দেয় এবং তাথেকে তৈরি হয় ঘি। ফিলিপিনোদের মহিষের মাংস খেতেও আপত্তি নেই।

ম্যাপের দিকে চেয়ে দেখুন। মিন্ডানাও দ্বীপের একটি বাহু পশ্চিম দিকে এগিয়ে সুলু সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। তারপর বাহুটা আবার দক্ষিণ দিকে নিম্নমুখী হয়ে নেমে গিয়েছে সুলু দ্বীপের দিকে। এই নিম্নমুখী বাহুর সর্বশেষ প্রান্তে আছি আমরা।

এখান থেকে যদি খুব ভালো দূরবিনের ভিতর দিয়ে সুলু সমুদ্রের উপরে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে দেখবেন, নীলসাগরের দিকে দিকে জেগে আছে ছোটো ছোটো দ্বীপ। কোনও কোনও দ্বীপে আছে হয়তো মাত্র কয়েক বিঘা জমি। কোনও কোনও পুঁচকে প্রবাল দ্বীপে গাছপালার কোনও চিহ্নই নেই। আবার কোনও কোনও সবুজে ছাওয়া দ্বীপ যেন রূপকথার স্বপ্ননীড়ের মতো।

জানি না আমরা যে সারাঙ্গানি দ্বীপ খুঁজতে এসেছি, তার সত্যিকার রূপটি কী রকম। 'স্টেটসম্যানে' প্রকাশিত বর্ণনা পড়লে তো মনে কোনওই আশার সঞ্চার হয় না। আর সেইটেই তো স্বাভাবিক। বাঘের ভালো লাগে রক্ত, যমদূতের ভালো লাগে নরক। সারাঙ্গানির মতন নরপিশাচের ভালো লেগেছে যে দ্বীপ, দেখতে তাকে নিশ্চয়ই সুন্দর নয়।'

শেষ হল কুমারের কাহিনি।

ছয়

সুন্দরবাবুর নতুন বিপদ

এখানে ম্যানোবো নামে এক অসভ্য জাত আছে, আগে তারা ছিল পৌত্তলিক এবং দাস-ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। এখন তাদের অধিকাংশই হয়ে গিয়েছে ক্রিশ্চান, পোশাকও পরে ইউরোপীয়দের মতো।

এদেরই পল্লিতে বিমল প্রভৃতি যে বাসা পেয়েছিল তার মধ্যে নূতনত্ব আছে যথেষ্ট।

নীচে মাটির উপরে চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া। মাঝখানে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে খুব উঁচু ও খুব মোটা দুটো মস্তবড়ো গাছ—গাছের গুঁড়ি বলাই উচিত—দাঁড়িয়ে আছে, তার উপর দিকের সমস্ত ডালপালা কেটে ফেলা হয়েছে এবং সেইখানে নির্মাণ করা হয়েছে একখানা একতলা কাঠের বাড়ি। তিনখানা ঘর ঘিরে চারিধারে বারান্দা। মাটি থেকে একখানা তিনতলা সমান উঁচু কাঠের মই বেয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠতে হয়।

বাসা দেখে পর্যন্ত সুন্দরবাবুর দুই চক্ষু হয়ে আছে বিস্ফারিত।

মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে তিনি কেবলই সন্দিগ্ধ ভাবে মস্তক আন্দোলন করেন এবং মাঝে মাঝে চোখ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, 'এই দেহ নিয়ে ওই মই বেয়ে কোনও অভদ্রলোকই কি উপরের ঘরে উঠতে পারে?' তারপর নিজের জিজ্ঞাসার জবাব দেন নিজেই। আবার ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলেন, 'উঁহু, পারে না—মোটেই পারে না! গাছের উপরে বাসা! মানুষ কি বানর, হনুমান, শিম্পাঞ্জি? মানুষ কি পক্ষী? হুম!'

কুমারের কাহিনি সমাপ্ত হবার খানিকক্ষণ পরে বাঘাকে নিয়ে ফিরে এল বিমল। তার মুখ গম্ভীর।

কুমার শুধোলে, 'কী হে ভায়া, মুখমণ্ডল নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন কেন? 'জাঙ্ক' ভাড়া হয়েছে?'

—'হয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে।'

—'কষ্টে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন?'

—'ও-দ্বীপের কথা এখানকার সবাই জানে।'

—'তারপর?'

—'দ্বীপের গুপ্তধনের কথাও কারুর অজানা নয়।'

—'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোনও জাঙ্কওয়ালাই ওখানে যেতে রাজি নয়।'

—'কারণটা কী বলে?'

—'বলে, ও ভূতুড়ে দ্বীপ।'

—'আর কী বলে?'

—'বলে, মাঝে মাঝে কোনও কোনও লোভী লোক দ্বীপে গিয়ে নামে। কিন্তু তারা আর ফিরে আসে না।'

—'কেন ফিরে আসে না?'

—'কারণ কেউ জানে না। বলে, ওটা প্রেত-দ্বীপ। ওর বাসিন্দা প্রেতাত্মারা। গভীর রাত্রে কোনও কোনও জাঙ্কের নাবিকরা দূর থেকে দেখেছে, দ্বীপের ভিতরে অনেকগুলো আলো জ্বলছে! দূর থেকে এও শুনেছে, দ্বীপের ভিতর থেকে ভেসে আসছে নারী-কণ্ঠে হাসি আর গানের ধ্বনি! বলে, দিনের বেলায় ও-দ্বীপ থাকে নির্জন আর নিস্তব্ধ। কিন্তু রাত্রিবেলায় হয়ে ওঠে শব্দে, সংগীতে আর আলোকে জীবন্ত! এই ধরনের আরও নানা কথাই তারা বললে।'

—'তুমি কি এসব বিশ্বাস করো?'

—'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দাও। আমি যা শুনেছি তাই বললুম।'

—'ওদের কথার উত্তরে তুমি কী বললে?'

—'সে অনেক কথা। বলার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত চারগুণ বেশি ভাড়ার লোভে একজন জাঙ্কওয়ালা আমাদের দ্বীপে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে।'

—'জয় হিন্দ! ব্যাস, আমরা আর কিছু জানতে চাই না! আগে দ্বীপে গিয়ে তো নামি, তারপর আসুক ভূত, আসুক যক্ষিণী, আসুক অন্য যে-কোনও আপদ! আমরা তো জানি, বিপদ চিরদিনই আমাদেরই বিপজ্জনক মনে করে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে!'

সুন্দরবাবু মুষড়ে পড়ে বললেন, 'হুম! দ্বীপে যে যায়, আর ফেরে না। রাত্রে দ্বীপ জ্যান্ত হয়। আলো জ্বলে, মেয়ে-গলায় হাসি-গান শোনা যায়। এসব কী ব্যাপার বিমলবাবু?'

—'জানি না।'

—'না-জেনেই পতঙ্গের মতন ছুটেছেন আগুনের পানে?'

—'ঠিক তাই। আমরা না-জেনেই সুমুখের দিকে ছুটি অজানাকে পাবার আনন্দে। জানা ব্যাপারে কোনও আনন্দ পাই না। আমরা পতঙ্গও নই। আমরা মানুষ। আগুনের দিকে ছুটলেও পুড়ে মরব না। মানুষ আগুন নেবাতেও জানে।'

'শিশুরাও মানুষ। তারা কিন্তু আগুনে হাত পুড়িয়ে কাঁদে।'

'আমরা শিশু নই। আগুন নেবাবার শক্তি আমাদের আছে।'

—'তাহলে আমি নাচার! আমার কপালে যা আছে তাই হবে। আমি আর পরামর্শ দেব না। আমি আর মুখ খুলব না। হুম!'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'তাহলে কবে আমরা যাত্রা করছি?'

—'কাল সকালেই। খুব ভোরে। সূর্যোদয়ের আগেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু এইবারে আবার মুখ খুলতে হল। দ্বীপে যেতে হবে অত সকালে! তাহলে কাল উপবাসই ব্যবস্থা নাকি?'

—'পাগল! উপবাস করবার অভ্যাস আমার নেই।'

—'খাব কোথায় শুনি?'

—'জাঙ্কে।'

—'জাঙ্ক কি খাবার প্রসব করবে?'

—'মোটেই নয়। রন্ধনের ভারগ্রহণ করব আমি স্বয়ং আর কুমার। খেয়ে বলবেন, আমরা রামহরির উপযুক্ত শিষ্য কি না। এখন গাত্র উত্থাপন করতে আজ্ঞা হয়।'

—'হুম। গাত্রোত্থান করে যাব কোথায়?'

—'ওই গাছের বাসায়।'

—'ওই মই দিয়ে? মাফ করতে হল! আমি এই বয়সে আত্মহত্যা করতে অসম্মত।'

জয়ন্ত একবার সেই সংকীর্ণ মইয়ের দিকে এবং আর-একবার সুন্দরবাবুর বিস্তীর্ণ বপুর দিকে করলে দৃষ্টিপাত। তারপর কেবল চিন্তিত ভাবে বললে, 'তাই তো?'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবুর একটু মুশকিল আছে। ওঁর দেহের আধখানাই হচ্ছে ভুঁড়ি। সেইজন্যেই উনি চিন্তিত হচ্ছেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার কোনওই কারণ নেই। আমাদের কেউ উপর থেকে ওঁকে টানবে, আর কেউ নীচে থেকে ওঁকে ঠেলে ঊর্ধ্বদেশে প্রেরণ করবে। তাহলেই হয়ে যাবে সব সমস্যার সমাধান!'

সুন্দরবাবু সুন্দিগ্ধ ভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'মানিকের ব্যবস্থাটা আমার কাছে মোটেই সন্তোষজনক বলে মনে হচ্ছে না।'

মানিক বললে, 'সন্তোষজনক না-হলেও এই ব্যবস্থাই মানতে হবে আপনাকে। রাত্রে থাকবেন কোথায়? এই নীচে? আপনি কি বুঝতে পারছেন না, যে মুল্লুকে মানুষ মাটি ছেড়ে বাসা বাঁধে গাছের টঙে, সেখানে মাটির উপরটা কতদূর বিপজ্জনক? হয়তো আসবে দুর্দান্ত বন্য জন্তু, হয়তো আসবে রক্তপিপাসী দস্যু বা হত্যাকারী, তখন আপনি কী করবেন? তখন—'

ভুঁড়ি দুলিয়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আর কিছু বলতে হবে না মানিক! আমি সব সত্যই হৃদয়ঙ্গম করেছি! এখানে মাটির উপরে আমি আর কিছুতেই থাকব না—লক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেও নয়! অতএব আমার এই বিপুল বপুর ভার মরিয়া হয়ে তোমাদের হাতেই অর্পণ করলুম—একে নিয়ে তোমরা যা-খুশি তাই করতে পারো। হুম, হুম, হুম, হুম!'

যাক। নিরাপদে সুন্দরবাবুকে সকলে মিলে প্রায় বহন করে কষ্টেসৃষ্টে ঊর্ধ্বদেশে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করলে যথাস্থানে।

সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বাপ রে বাপ! ভূত-পেতনির কথা শিশুবয়স থেকে শুনে আসছি, তাদের সঙ্গে যেন কতকটা চেনাশোনাও হয়ে গেছে! তাই ওই ভূতুড়ে-দ্বীপেও যেতে নারাজ হইনি। কিন্তু আগে যদি জানতুম, আমাকে মানুষ হয়েও বানর বা পাখির মতো বাঁধতে হবে আকাশ-ছোঁয়া গাছের উপরে বাসা—তাহলে হুম, মা-কালীর দিব্যি গেলে বলছি, কিছুতেই আমি তোমাদের সঙ্গে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আসতে রাজি হতুম না। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি!'

বিমল বললে, 'আপাতত সুন্দরবাবুর একটা ব্যবস্থা হল বটে, কিন্তু এখনও আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন বলুন দেখি?'

—'জাঙ্কের নাবিকদের কাছ থেকে আর একটা সন্দেহজনক খবর শুনে এলুম।'

—'সন্দেহজনক খবর?'

—'হ্যাঁ। শুনলুম আজ সকালেই আর-একদল লোকও নাকি একখানা মোটরবোটে চড়ে সারাঙ্গানি দ্বীপের দিকে যাত্রা করেছে।'

—'কারা তারা?'

—'তারা সবাই ফিলিপিনো। তাদের আর-কোনও পরিচয় জানতে পারিনি।'

—'ভাববার কথা বটে।'

—'ভেবে আর কী হবে বলুন? কার্যক্ষেত্রে যখন অবতীর্ণ হয়েছি, শেষ পর্যন্ত না-দেখে ছাড়ব না। তবে, আমাদের রীতিমতো সাবধান হয়ে থাকতে হবে আর কী!'

সাত

নীল আলো, লাল আলো

যাত্রা শুরু হয়েছে।

উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ, নীচে পরিষ্কার নীল সাগর। পাল তুলে দিয়ে জাঙ্ক চলেছে জলের দোলায় দুলতে দুলতে। তরণীর তলায় শোনা যাচ্ছে পুলকোচ্ছল তরঙ্গদের করতালি। শূন্য-পথে উড়ে যাচ্ছে সাগরকপোতের দল। দৃষ্টিসীমা ভরে ঝরছে সূর্যালোকের সোনালি আশীর্বাদ। চারিদিকে শান্তির ইঙ্গিত, আনন্দের ছবি, সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য।

নিজেদের খাবারের জন্যে বিমল ও কুমার রন্ধনের আয়োজনে নিযুক্ত হয়েছে। সুন্দরবাবু সানন্দে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করছেন। তাঁর মুখের পানে মানিক তাকিয়ে আছে সকৌতুকে। জয়ন্ত গম্ভীর ভাবে বসে আছে, তার দৃষ্টি কামরার জানলা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে বাইরের সমুদ্রের দিকে।

দুটো বড়ো ইকমিক কুকারে রান্না চড়িয়ে দেওয়া হল। একটাতে হবে ফাউলের রোস্ট, এবং ডিম, কপি, কলাইশুঁটি, আলু, বিট, শালগ্রাম, গাজর ও টোম্যাটো প্রভৃতি সিদ্ধ। আর-একটা কুকারে হবে পোলাও এবং ভাজা মাছ।

বিমল বললে, 'ব্যাস, আমাদের আয়োজন পর্ব সমাপ্ত। দু-ঘণ্টা পরেই ডান হাতের কাজ শুরু হবে। কী বলেন সুন্দরবাবু, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে আপনার বিশেষ কষ্ট হবে না তো?'

সুন্দরবাবুর রসনা সরস হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। সহাস্যে তিনি বললেন, 'তার আগে কি দু-এক পেয়ালা চা পাওয়া যায় না?'

—'বিলক্ষণ! তা আবার পাওয়া যাবে না? কুমার, 'স্টোভে' একটু গরম জল চড়িয়ে দাও তো!'

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'ওর নাম কী, একটু আগে মনে হল যেন দেখলুম, আপনারা আর-একটা কী জিনিস বানাচ্ছেন!'

—'হ্যাঁ। শশার 'স্যান্ডউইচ'। চায়ের সঙ্গে তাও দু-একখানা দেব নাকি?'

—'হুম। আপত্তি নেই।'

* * *

রাত্রি।

পরিপূর্ণ চন্দ্রালোক, ঘুমন্ত দ্বীপ, স্তব্ধতার তন্দ্রা ছুটে গিয়েছে সাগরতরঙ্গের কোলাহলে।

প্রধান মাঝি বললে, 'এই সারাঙ্গানি দ্বীপ।' তার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠার আভাস।

সবাই আগ্রহে দ্বীপের দিকে তাকালে।

সন্ধ্যার আগেই দূর থেকে তারা দেখেছিল, দ্বীপটি বড়ো নয়—লম্বায় হয়তো ছয় মাইলের বেশি হবে না। গাছপালার মাঝখানে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একটি ছোটো পাহাড়ও।

মাঝি শুধোলে 'এইখানেই নোঙর করব নাকি?'

—'না, দ্বীপের খুব কাছ দিয়ে জাঙ্ক চালিয়ে যাও। দ্বীপটাকে আগে ভালো করে দেখি।'

মাঝি মুখ টিপে একটুখানি হাসলে। বললে, 'দ্বীপে নামতে ভয় হচ্ছে বুঝি?'

—'ভয় পেয়েছি বললে যদি খুশি হও, তাহলে তোমার খুশিতে বাধা দেব না।'

জাঙ্ক চলতে লাগল।

* * *

দ্বীপের উপরে সমুদ্রের বালুকাতটের পরেই আরম্ভ হয়েছে বেশ ঘন জঙ্গল। বড়ো বড়ো গাছও আছে। সেগুলো কী গাছ, চাঁদের আলোয় ভালো করে বোঝবার জো নেই। চেনা গেল খালি বাঁশঝাড় আর নারিকেলগাছগুলোকে। এ অঞ্চলে এত নারিকেলগাছও আছে!

দ্বীপটাকে সম্পূর্ণ নির্জন বলেই মনে হয়। ভিতর থেকে গাছপালার মর্মর ছাড়া আর কোনও শব্দই ভেসে আসছে না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কই হে, যক্ষিণীর গান শুনছি না তো?'

মানিক বললে, 'যক্ষিণীরা ঘুমোচ্ছে।'

—'একটা বন্দুক ছুড়ে বেটিদের ঘুম ভাঙিয়ে দেব নাকি?'

—'পাগল!'

একদিকে চাঁদের আলো, আর-একদিকে কালো ছায়া মেখে দাঁড়িয়ে আছে দ্বীপের ছোটো পাহাড়টা।

জয়ন্ত পাহাড়ের উপর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে অন্ধকার। সেদিকে এক-জায়গায় জ্বলছে একটা আলো। নীল আলো।

সকলের দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত।

কুমার বললে, 'মানুষ না-থাকলে আলো জ্বলে না।'

বিমল বললে, 'আলোটার রং নীল কেন?'

হঠাৎ নীল আলোটা নিবে গেল। জ্বলে উঠল লাল আলো।

জয়ন্ত বললে, 'বোঝা যাচ্ছে এ হচ্ছে সাংকেতিক আলো।'

বিমল বললে, 'লাল আলো হচ্ছে বিপদের নিশানা। কেউ যেন দূরের কারুকে জানিয়ে দিচ্ছে—বিপদ উপস্থিত। হুঁশিয়ার!'

কুমার ঈষৎ হেসে বললে, 'বিপদ বলতে বোঝাচ্ছে বোধহয় আমাদেরই?'

বিমল সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ জয়ন্তের কাঁধে হাত দিয়ে বললে, 'দেখুন, দেখুন!'

প্রায় তীরের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে একখানা মোটরবোট!

খুব বড়ো ও বিশেষ শক্তিপূর্ণ একটা 'টর্চে'র তীব্র শিখা বোটের ইতস্তত নিক্ষেপ করে জয়ন্ত বললে, 'ভিতরে কোনও লোক নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

—'নিশ্চয়ই বোটের লোকেরা দ্বীপে গিয়ে নেমেছে।'

মাঝি বললে, 'বোধহয় ওই বোটখানাই আজ সকালে দ্বীপের দিকে এসেছিল।'

বিমল বললে, 'আমরা এইখানেই তীরে গিয়ে নামব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কাল সকালে তো?'

—'না, এখনই।'

—'সে কী, এই রাত্রে?'

—'হ্যাঁ। চাঁদের আলো থাকলেও দ্বীপে বনের ভিতরে অন্ধকার। সহজেই আত্মগোপন করতে পারব। দিনের আলোর স্পষ্টতা হবে আমাদের শত্রু। কী বলেন জয়ন্তবাবু?'

—'আমারও ওই মত।'

আট

আকাশ ফাটানো কান্না

মোটমাট নিয়ে সকলে দ্বীপে গিয়ে নামল।

মাঝি বললে, 'দ্বীপের এত কাছে থাকতে আমাদের সাহস হচ্ছে না। আমরা খানিক দূরে গিয়ে নোঙর ফেলব। কাল পর্যন্ত আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি না ফিরে আসেন তাহলে বুঝব, আপনারা আর-কোনও দিন ফিরে আসবেন না।'

বিমল হেসে বললে, 'তোমার কথাগুলি বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট, মানে বুঝতে কষ্ট হয় না।'

জয়ন্ত তখন 'টর্চ' জেলে সমুদ্রতীরের বালি হেঁট হয়ে লক্ষ করছিল।

বিমল বললে, 'কী ব্যাপার? কিছু হারাল নাকি?'

—'উঁহু। বালির উপরে পায়ের দাগ।'

—'দেখুন। পদচিহ্ন পড়ে আপনাদের বিভাগেই আপনারা হচ্ছেন পদচিহ্ন বিশারদ।'

—'এখানে আটজন লোকের পায়ের দাগ আছে। তারাই বোট থেকে নেমেছে। আসুন আমার সঙ্গে। লোকগুলো এইদিকে গিয়েছে।'

জয়ন্ত পায়ের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হল। অন্যান্য সকলে চলতে লাগল তার পিছনে পিছনে।

পদচিহ্নগুলো বালুকাতট ছেড়ে ঘাসজমি ও জঙ্গলের কাছে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'আর পদচিহ্ন দেখবার উপায় নেই। কেবল এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, লোকগুলো এইখান থেকেই বনের ভিতরে ঢুকেছে।'

বিমল বললে, 'কুছ পরোয়া নেহি! লোকগুলো কোথা দিয়ে কোন দিকে গেছে তাই জানা দরকার তো?'

—'তা ছাড়া আর কী?'

—'কুমার, বাঘাকে ছেড়ে দাও।'

শিকলিতে বেঁধে বাঘাকে নিয়ে আসছিল কুমার। সে খুলে দিলে বাঘাকে।

জয়ন্ত বললে, 'বাঘা কী করবে?'

—'মানুষ-গোয়েন্দাকে হারিয়ে দেবে।'

—'কেমন করে?'

—'কুকুরের ঘ্রাণশক্তি আশ্চর্য। পদচিহ্নের অধিকারীরা যখন জমির উপরে পা ফেলে গিয়েছে, তখন তাদের গন্তব্যস্থান বাঘা নিশ্চয়ই আবিষ্কার করে ফেলবে।'

—'কোনও কোনও জাতের বিলাতি কুকুরের এই শক্তি আছে বটে। কিন্তু বাঘা হচ্ছে দেশি কুকুর।'

সুন্দরবাবু ঘৃণায় নাক তুলে বললেন, 'আরে যাকে বলে নেড়ি কুত্তা! ছোঃ, ও-কুকুর আবার পোযে!'

বিমল বললে, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। দেশি কুকুরদের তুচ্ছ ভাবা হয়, অবহেলা করে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় না। কুকুর তো জানোয়ার, শিক্ষা না পেলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের শিশুও নিকৃষ্ট পশুর সামিল হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বাঘার শিশুবয়স থেকেই অনেক যত্ন নিয়েছি, তার পিছনে অনেক খেটেছি, তাকে কতরকম শিক্ষা দিয়েছি। তার ফল স্বচক্ষে দেখুন। আয় তো রে বাঘা!'

বাঘা বিমলের কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

বিমল বালুকাতটের পদচিহ্নগুলোর দিকে বাঘার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। তাকে আর কিছু বলতে হল না। সে মাটির উপরে মুখ নামিয়ে বারকয়েক শ্বাসগ্রহণ করলে। একবার মুখ তুলে বললে, 'ঘেউ'! তারপর আবার মুখ নামিয়ে শুঁকতে শুঁকতে ঘাসজমির উপরে গিয়ে উঠল। তারপর সোজা প্রবেশ করল জঙ্গলের ভিতরে।

তার পিছনে যেতে যেতে বিমল বললে, 'আমাদের আর-কোনও ভাবনার নেই। বাঘাই আমাদের গন্তব্য পথ নির্দেশ করবে।'

জয়ন্তের চক্ষু হল চমৎকৃত। সুন্দরবাবু তখনও অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'বাঘা যে ভুল পথে যাচ্ছে না, তারই বা প্রমাণ কী?'

বিমল বললে, 'প্রমাণ পেতে বিলম্ব হবে না।'

—'হুম, দেখা যাক।'

জঙ্গল কোথাও পাতলা কোথাও ঘন। যেখানে গাছের ভিড় সেখানটা ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, যেখানে গাছ কম সেখানে দেখা যায় আলো-ছায়ার মিতালি। এখানে-ওখানে ছোটো-বড়ো ঝোপঝাপও যথেষ্ট।

কোথাও জীবনের এতটুকু চিহ্ন নেই। বাতাসে থর থর করে কাঁপছে বটে গাছের পাতারা, কিন্তু তারাও যেন ঘৃণাভরে হিংসা ভরে অভিশাপ দিয়ে বলছে, মর মর মর মর মর মর! মাঝে মাঝে নিশাচর পাখির বিশ্রী চিৎকার—তাও বুকের ভিতরে জাগিয়ে তোলে আকস্মিক অমঙ্গলের সম্ভাবনা! প্রত্যেক ঝোপ, প্রত্যেক ছায়া যেন অপার্থিব বিভীষিকার বাসা!

বিমল চুপি চুপি বললে, 'জয়ন্তবাবু, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কী সন্দেহ?'

—'কেউ যেন আড়ালে আড়ালে আমাদের অনুসরণ করছে।'

—'আমিও দূরে দূরে কোনও কোনও ঝোপকে অস্বাভাবিক ভাবে নড়তে দেখেছি।'

—'আমাদের ভুলও হতে পারে।'

—'অসম্ভব নয়।'

—'কিন্তু অস্ত্র তৈরি রাখুন।'

—'বলা বাহুল্য।'

হঠাৎ সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'বিমলবাবু, আর ওদিকে গিয়ে কাজ নেই।'

—'কেন?'

—'জঙ্গলটা ভালো বোধ হচ্ছে না।'

—'তাই নাকি?'

—'বুকটা কেমন ছাঁৎ ছাঁৎ করছে। এতক্ষণ তো করছিল না!'

—'বুককে ছাঁৎ ছাঁৎ করতে বারণ করুন।'

—'ঠাট্টা করছেন? কিন্তু আমি বলে রাখছি, এই জঙ্গলের বাইরে না-গেলে আমরা মারাত্মক বিপদে পড়ব। এখানে কেমন যেন অমানুষিক ভাব আছে। নইলে এমন পূর্ণিমার রাত্রেও চারিদিক খাপছাড়া বলে মনে হচ্ছে কেন?'

আচম্বিতে মাথার উপরে একটা বড়ো গাছের ডাল দুলে উঠল সশব্দে।

'ওই রে!' বলেই সুন্দরবাবু পিছন দিকে মারলেন মস্ত এক লাফ।

সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল—এমনকি বাঘা পর্যন্ত। গাছের ভিতরে তখনও শব্দ হচ্ছে। যেন কেউ ডাল বেয়ে চলে যাচ্ছে গাছের এদিক থেকে ওদিকে। কিন্তু তাকে দেখা গেল না।

আচমকা বুক কাঁপানো স্বরে কোথা থেকে চ্যাঁচাতে লাগল একপাল শেয়াল।

বাঘা তাদের বেসুরো, অসভ্য, বন্য চিৎকার সইতে পারলে না। ধমক দিয়ে বললে, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ!'

শেয়ালদের পালা সাঙ্গ। গাছটাও নিসাড়।

বিমল বললে, 'গাছের উপরে হয়তো কোনও বাঁদর কি বনবিড়াল কি অন্য কোনও জন্তু আছে। আমাদের অভাবিত আবির্ভাবে চমকে গিয়েছে।'

বাঘা আবার অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'একটা বাজে নেড়ে কুত্তার ল্যাজ ধরে আমরা এতগুলো মানুষ বোকার মতন কোথায় চলেছি?'

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, বাঘার নিন্দা আমরা ভালোবাসি না।' সে আর মানিক 'মেশিনগানে'র কাঠের কেসটা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তা-বলে একটা কুকুরের পিছু ধরে আমরা মানুষ হয়েও অপথে-বিপথে গিয়ে প্রাণ হারাব নাকি?'

কুমারের দুই চক্ষে ফুটল ক্রোধের চিহ্ন। কিন্তু মুখে সে আর কিছু বললে না।

মানিক ফিসফিস করে বললে, 'সুন্দরবাবুর কথায় কান দেবেন না কুমারবাবু। উনি লোক ভালো, কিন্তু ওঁর মুখ বড়ো আলগা।'

সকলে পথ চলতে লাগল নিঃশব্দে। খানিকক্ষণ পরে একটা উঁচু ও বড়ো ঝোপ পার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই জঙ্গল শেষ হয়ে গেল হঠাৎ।

একটা মাঠ—লম্বায়-চওড়ায় সিকি মাইলের কম নয়। তার বুকের উপরে মূর্ছিত হয়ে আছে চন্দ্রালোক। সেখানেও কেমন খাঁ খাঁ ভাব। মানুষের পৃথিবী, অথচ এখানে কোথাও দেখা নেই মানুষের। পৃথিবীর মধ্যে এ এক অপার্থিব দেশ।

বাঘা মাঠের উপর দিয়ে তখনও অগ্রসর হচ্ছিল, বিমল হঠাৎ বললে, 'বাঘা! দাঁড়া!'

সব পোষা কুকুরেরই মতো বাঘাও মানুষের অনেক ছোটো ছোটো কথাই বোঝে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

সামনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বিমল সানন্দে বলে উঠল, 'দেখুন জয়ন্তবাবু, দেখুন!'

মাঠের এক প্রান্তে দেখা যাচ্ছে বেশ বড়ো একটা বাঁশবন এবং পাশেই সারি সারি পাঁচটি নারিকেলগাছ!

জয়ন্ত সেই দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তা-হলে মনোহরবাবুর ম্যাপের প্রান্তে যে সাংকেতিক কথাগুলো আছে তা মিথ্যা নয়! বাঁশঝাড় আর পাঁচটি নারিকেলগাছ! বাঘা আমাদের আসল জায়গাতেই নিয়ে যাচ্ছে! সাধু বাঘা, সাধু!'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো কেবল বললেন, 'হুম!'

বিমল বললে, 'আর-একটা কথাও বোঝা যাচ্ছে। আজ সকালে এদিকে যে-লোকগুলো এসেছিল, তারাও গিয়েছে ওইদিকেই। চল বাঘা, চল!'

জ্যান্ত লাঠির মতো লাঙ্গুল ঊর্ধ্বে তুলে বাঘা আবার এগিয়ে চলল সেই বাঁশঝাড় আর নারিকেলগাছগুলোর দিকেই।

বিমল আনন্দিত-কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, বাঘা ঠিক পথই ধরেছে! লোকগুলো ওইদিকেই গেছে— ওইদিকেই গেছে! বাঘার কাছে কোথায় লাগে ডিটেকটিভ শার্লক হোমস! জয়ন্তবাবুও বাঘার উপরে টেক্কা মারতে পারবেন না!'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আমি মুক্তকণ্ঠে সেকথা স্বীকার করছি। বাঘা হচ্ছে অতুলনীয়!'

অল্পক্ষণ পরেই সকলে বাঁশঝাড়ের পাশে এসে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু সচমকে ও আড়ষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কী দেখা যাচ্ছে ওখানে? কী ওগুলো পড়ে আছে—কী ওগুলো?'

সকলেই হাতের 'টর্চ' জ্বাললে। নারিকেলগাছগুলোর তলদেশ দিয়ে বয়ে যেতে লাগল তীব্র আলোকের তরঙ্গের পর তরঙ্গ!

সকলে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, মাটির উপরে পাশাপাশি পড়ে রয়েছে কতকগুলো মানুষের মৃতদেহ! প্রত্যেক মৃতদেহের হাত-পা বাঁধা এবং প্রত্যেক মৃতদেহই মুণ্ডহীন!

জয়ন্ত মৃতদেহগুলোকে গুনে গুনে বললে, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট!'

খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বিমল ধীরে ধীরে বললে, 'এরাই বোধহয় আজ এসেছিল এই দ্বীপে। কিন্তু এরা কারা?'

কুমার ত্রস্ত স্বরে বললে, 'দ্যাখো বিমল, দ্যাখো! ওদিকে আবার কী কতকগুলো পড়ে রয়েছে দ্যাখো!'

বাঁশঝাড়ের পাশেই মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে কতকগুলো রক্তাক্ত নরমুণ্ড!

জয়ন্ত আবার গুনে গুনে বললে, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট!'

এমন বীভৎস দৃশ্য কল্পনারও অগোচর!

সুন্দরবাবু একটা মুণ্ডের উপরে 'টর্চে'র শিখা স্থির করে রেখে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এ মুণ্ডটা আমি চিনি এ হচ্ছে সেই পলাতক ফিলিপিনো আসামি পাবলোর ছিন্নমুণ্ড!'

বিমল খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থেকে বললে, 'সবই জলের মতন স্পষ্ট! পাবলোও কলকাতার পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে আমাদেরই মতো উড়োজাহাজে চড়ে আমাদেরও আগে এখানে ফিরে এসেছিল। খুব সম্ভব মনোহরবাবুর ম্যাপের যে-অংশ সে পেয়েছিল, তা থেকে আর একখানা ম্যাপ নকল করে নিজের কাছে রেখেছিল। সে ভেবেছিল, আমাদের আগেই দলবল নিয়ে এখানে এসে গুপ্তধন উদ্ধার

করবে! কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, অজ্ঞাত হত্যাকারীর হাতে তাকে আর তার দলের সবাইকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু অজ্ঞাত হত্যাকারী কারা? নিশ্চয়ই তারা দলে ভারী, কারণ সাত-আটজন লোককে এমন ভাবে হত্যা করা দু-চারজন লোকের কাজ নয়!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এসবই ভৌতিক ব্যাপার!'

বিমল বললে, 'ভূতেরা যে আগে মানুষের হাত-পা বেঁধে হত্যা করে, এ কথা জীবনে কোনওদিন শুনিনি!'

সুন্দরবাবু কী জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আচম্বিতে সবাইকে স্তম্ভিত করে নারীকণ্ঠে জাগ্রত হল এমন এক অস্বাভাবিক তীব্র ক্রন্দন, যা বিদীর্ণ করে দিলে যেন সমস্ত আকাশকে!

নয়

কান্না-হাসির পর

সে কান্না থামতে না থামতে আর-একদিক থেকে জেগে উঠল আর-এক নারীর তীব্র ও তীক্ষ্ণ ক্রন্দন! তারপর নানা দিক থেকে তেমনি চিৎকার করে কান্না ধরলে নানা নারী কণ্ঠ! ক্রন্দনের অদ্ভুত ঐকতান!

সুন্দরবাবু ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'যক্ষিণী! যক্ষিণী! যক্ষিণী!'

সর্বদাই কৌতুকপ্রিয় যে মানিক, সে-ও এখন সুন্দরবাবুকে ঠাট্টা করতে ভুলে গেল।

তারপর হঠাৎ থেমে গেল সব কান্নার উপদ্রব!

এবং আরম্ভ হল এবার খল খল অট্টহাসির পালা! নানা দিকে নানা স্বরে নানা নারী অট্টাহাসি হাসতে লাগল—হা হা হা হা, হি হি হি হি, হো হো হো হো!

এমন ভয়াবহ এবং বুকের রক্ত জল করা সেই অভাবিত অট্টহাসি যে, কবরের মড়াও যেন চিরনিদ্রা ভুলে কফিনের মধ্যে ছটফট ছটফট করে ওঠে!

দুই কানের উপরে প্রাণপণে হাত চেপে সুন্দরবাবু ধুপ করে বসে পড়লেন। তাঁর মুখ রক্তহীন।

—'বিমলবাবু?'

—'কী জয়ন্তবাবু?'

—'এসব কী?'

—'ভগবান জানেন।'

—'সত্যিই কি এটা ভূতুড়ে দ্বীপ?'

—'ভূত মানি না।'

—'তাহলে কারা কাঁদলে? কারা হাসছে?'

—'আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্নই করতে পারি।'

—'কিন্তু ও-প্রশ্নের উত্তর তো আমার কাছে নেই।'

—'ও হাসি-কান্নার অর্থ বুঝতে না-পারলেও একটা বিষয় বেশ বুঝতে পারছি।'

—'কী?'

—'যারা হাসছে তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই।'

—'ঠিক। এতক্ষণ এটা খেয়ালে আনিনি!'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পলায়নের চেষ্টা করলেন।

খপ করে তাঁর একখানা হাত ধরে ফেলে জয়ন্ত বললে, 'কোথা যান?'

—'যক্ষিণী! যক্ষিণী! আমি এখনই এই দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে যাব! ঝাঁপ খাব—আমি ঝুপ করে সমুদ্রে ঝাঁপ খাব!'

—'থামুন মশাই, পাগলামি করবেন না। এখান থেকে চলে গেলে মৃত্যু আপনার অনিবার্য।'

—'মৃত্যু যে অনিবার্য সেটা তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু আমি যক্ষিণীদের খপ্পরে পড়তে রাজি নই।'

বিমল বললে, 'যক্ষিণীর নিকুচি করেছে! জয়ন্তবাবু, চলুন, আমরা ওই ঝোপটার ভিতরে গিয়ে বসি। পিছনে থেকে আমাদের পৃষ্ঠরক্ষা করবে ওই বাঁশঝাড়। কুমার, 'কেস' থেকে বার করো 'মেশিনগান'টা। যথাসময়ে ওটাকে চালনা করবার ভার রইল তোমারই উপরে। বাঘা, তুই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কান খাড়া করে কী শুনছিস? তুইও কি সুন্দরবাবুর মতো ভয় পেয়েছিস? না, না, ভয় নয়—বোধ হয় তুই অবাক হয়ে গেছিস—না? হ্যাঁ, অবাক হবার কথাই তো! আয়, তুই আমার পাশে এসে বোস।'

হঠাৎ থেমে গেল খলখল খিলখিল অট্টহাসির কনসার্ট!

উত্তর দিকের জঙ্গল ভেদ করে মাঠের উপরে দেখা দিলে একদল লোক। খানিকটা এগিয়ে আসতেই ধবধবে পূর্ণিমায় বোঝা গেল, সংখ্যায় তারা পঁচিশজন। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে বন্দুক। দেখলেই আরও বোঝা যায়, তারা চিনেম্যান।

জয়ন্ত বললে, 'ওরা আমাদের দিকেই আসছে।'

বিমল তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'আসুক। হতভাগারা জানে না, আমরা কী অস্ত্র দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করব! ওদের আরও কাছে আসতে দিন। তারপর যেই মাঠের মাঝ-বরাবর আসবে, অমনি শুরু হবে আমাদের 'মেশিনগান' আর 'অটোমেটিক রাইফেলে'র অশ্রান্ত রুদ্র সংগীত! এক বেটাকেও পালাতে দেওয়া সম্ভব নয়!'

নিজের নিজের বন্দুক উঁচিয়ে লোকগুলো দ্রুতপদে এগিয়ে আসতে লাগল—তারা বুঝতে পেরেছিল, বিমলরা আশ্রয় নিয়েছে ঝোপের ভিতরে।

বিমল বললে, 'সবাই লক্ষ্য স্থির করো।'

আরও মিনিট দুয়েক কাটল।

বিমল বললে, 'চালাও গুলি!'

পর মুহূর্তে যে কাণ্ড শুরু হল, শত্রুরা তা একেবারেই আশা করতে পারেনি। কুমারের 'মেশিনগান' এবং অন্য সকলের 'অটোমেটিক রাইফেল' ধারাবাহিক তপ্ত বুলেট প্রেরণ করতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে! পঁচিশজন লোক আক্রান্ত হল যেন একশোজনের দ্বারা।

শত্রুরা উত্তরে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ করলে বটে, —কিন্তু সে ক্ষীণ চেষ্টা মাত্র! এদিক থেকে হচ্ছে যেন ঝড়ের সঙ্গে গুলির পর গুলিবৃষ্টি! তার সামনে দাঁড়াবার বা অগ্রসর হবার চেষ্টাও হচ্ছে পাগলামির সামিল! এমন অভাবিত এবং সাংঘাতিক আক্রমণের জন্যে শত্রুরা প্রস্তুত ছিল না। তারা বেগতিক দেখে মিনিটখানেকের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে করলে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্যের মতো পলায়নের চেষ্টা।

কিন্তু পলায়নও নিরাপদ নয়। খোলা মাঠ, গা ঢাকা দেওয়া যায় এমন কোনও গাছ বা ঝোপঝাপের

আড়াল নেই। পালাতে পালাতেও তাদের অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে এদিকে ওদিকে লুটিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত 'মেশিনগান'কে ফাঁকি দিতে পারলে মাত্র জন তিন-চার লোক।

যাকে দলের সর্দার বলে মনে হয়েছিল, বিমল প্রথমেই তাকে পেড়ে ফেলেছিল অব্যর্থ লক্ষ্যে।

সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলে, লোকটা তখনও মরেনি বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ আর বাঁচবেও না।

লোকটাকে বুড়ো বলা চলে, কিন্তু তার মাথার চুল পাকলেও, দেহ যুবকের মতন জোয়ান।

অতি কষ্টে কোনওরকমে দুই হাতে ভর দিয়ে বসে, অল্প একটু হেসে লোকটা ইংরেজিতে বললে, 'বাবু, তোমারই জিত!'

—'কে তুমি?

—'বলছি, বলছি। নাম আমার স্যামসন। মরবার সময় কিছু লুকোব না। কিন্তু আগে একটু জল দাও—একটু জল!'

জলপান করে লোকটা যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই :

'সে বংশানুক্রমে বোম্বেটে। তার পূর্বপুরুষরাও চিন সাগরে জলদস্যুতার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা বহুকাল থেকেই গোপনে সারাঙ্গানি দ্বীপে বাস করে আসছে। এই দ্বীপ সম্বন্ধে এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের কুসংস্কার আছে বলে এখানে কেউ ভরসা করে আসতে চাইত না। তারাও আত্মগোপন করবার এই সুযোগ ত্যাগ করেনি। বরং কুসংস্কার যাতে আরও বদ্ধমূল হয়ে ওঠে, তারা বরাবরই সেই চেষ্টা করেছে। তাদের দলভুক্ত জনকয় চিনা স্ত্রীলোক রাত্রে দ্বীপে বসে গান গাইত বা হাসত বা কাঁদত। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দুঃসাহসী লোকরা দ্বীপে এসে উঠেছে, কিন্তু কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যায়নি। লোকগুলো যে দ্বীপে আসে গুপ্তধনের লোভে, একথা তারাও জানে। কিন্তু এখানে গুপ্তধন আছে, এটা তারা বিশ্বাস করে না। কারণ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এখানে কোনও গুপ্তধনই পাওয়া যায়নি।'

খানিকক্ষণ পরেই স্যামসনের মৃত্যু হল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! তাহলে আমাদের পেটের পিলে চমকেছে নিতান্তই অকারণে? পেতনিদের হাসি-কান্না, যক্ষিণীদের গান, ভূতুড়ে দ্বীপ—সবই ধাপ্পাবাজি? আমার বিশ্বাস, সারাঙ্গানির গুপ্তধনও হচ্ছে ওইরকম আর-একটা বাজে রূপকথা!'

বিমল বললে, 'দেখা যাক আপনার বিশ্বাস অভ্রান্ত কি না!'

দশ

গুপ্তধনের গুপ্তকথা

উপরে মেঘময় অচঞ্চল নীলাম্বর, নীচে দ্বীপময় নৃত্যচপল নীল সাগর, এই নয়নমোহন অনন্ত নীলিমার স্থির ও অস্থির ছন্দের মধ্যে জেগে উঠেছে প্রথম প্রভাতের প্রদীপ্ত দৃষ্টি।

অন্ধ রাত্রিকে বিদায় করে আসছে দিবসদেবতা জ্যোতির্ময় সূর্য, প্রশস্তি-গীতি গেয়ে তাঁকে সানন্দে অভ্যর্থনা করলে তরুশ্যামল দ্বীপে দ্বীপে লক্ষ লক্ষ বিহঙ্গরা।

আলোর পরে কালো এবং কালোর পরে আলো, এদেরই বিচিত্র দোলায় রাত্রি আর দিবাকে দুলিয়ে সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে একই কর্তব্য পালন করে আসছে আমাদের এই বসুন্ধরা।

বিপৎসংকুল অরণ্যের অন্তঃপুরে যারা অসহায় ভাবে বসে থাকতে বাধ্য হয়, দীপ্তিময়ী রঙিন উষার সূচনা তাদের চোখকে যে কতখানি নন্দিত করে তোলে, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারবে না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী একখানা কেতাবে পড়েছিলুম, বনবাসী আদিম মানুষের সর্বপ্রথম দেবতা ছিলেন নাকি সূর্যদেব। আমারও আজ সূর্যকে দেবতা বলে মেনে উপাসনা করবার ইচ্ছা হচ্ছে। আজকের সূর্য অস্ত যাবার আগেই আমি এই দ্বীপ ত্যাগ করতে চাই।'

বিমল বললে, 'ওই সময়ের মধ্যে যদি গুপ্তধনের সন্ধান না মেলে?'

—'তাহলেও আমি পিঠটান দেব। আবার এখানে রাত্রিবাস? অসম্ভব!'

—'বেশ, তাহলে সময় থাকতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসুন।'

সকলে আবার সেই পঞ্চ-নারিকেলকুঞ্জ এবং বাঁশঝাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ছেঁড়া ম্যাপের প্রান্তে দৃষ্টিপাত করে বিমল বললে, 'পাবলো ম্যাপের গুপ্তকথা নিশ্চয়ই আবিষ্কার করে ফেলেছিল। আমার মতে, ম্যাপের এই এক এক সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এক এক গজ বা ফুট! আচ্ছা, আগে গজের হিসাবেই অগ্রসর হওয়া যাক। সফল না হলে পরে ফুটের হিসাব গ্রহণ করলেই চলবে। ... প্রথমে আছে,—উত্তরে ১ থেকে বিশ পর্যন্ত। কুমার, 'কম্পাস'টা আমাকে দাও। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ঠিক উত্তর দিক। এখন আমাদের বিশ গজ অগ্রসর হতে হবে।'

সকলে হিসাব করে মেপে পা ফেলে এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

বিমল বললে, 'এবারে পূর্ব দিকে ঠিক দুইশো গজ যাওয়া চাই। এই পূর্ব দিক। আসুন।'

চলতে চলতে কুমার বললে, 'কিন্তু আমাদের পথের ঠিক উপরেই যে গাছপালা আর ঝোপঝাপ রয়েছে!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার বিশ্বাস, ম্যাপে সংকেতগুলো লেখবার পরে ওই গাছ আর ঝোপগুলো জন্মেছে।'

বিমল বললে, 'ঠিক তাই। কিন্তু বাধাগুলো এড়িয়েও আমরা চুলচেরা হিসাব ঠিক রাখতে পারব।'

সকলে দুইশো গজ পার হল।

বিমল বললে, 'এইবারে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত পদচালনা করুন।'

পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত এগুবার পর সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে, সামনেই যে পাহাড়! এগুতে গেলেই মাথা যাবে ঠুকে! এইবার কী হবে? ম্যাপ কী বলে?'

বিমল বললে, 'ম্যাপ বলে, আটান্ন গজ পর্যন্ত উপর দিকে উঠতে হবে। এই তো সামনেই পাহাড়ে ওঠবার পথ। উঠুন।'

সকলে হিসাব করে পাহাড়ের উপরে উঠে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়াল।

বিমল বললে, 'হুঁ, পাহাড়ে-পথটা আরও উপরে উঠে গিয়েছে, কিন্তু ম্যাপ বলছে আমাদের নীচের দিকে পঁইত্রিশ গজ নেমে যেতে হবে। এই তো, একটু বাঁ পাশ দিয়েই একটা খুব সরু পথ নেমে গিয়েছে উপত্যকার দিকে। আমাদের হিসাব ভুল হয়নি—সব হুবহু মিলে যাচ্ছে!'

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'হুম হুম! জয় মা-কালী, শেষ পর্যন্ত মুখ রেখো মা!'

তেত্রিশ গজ পর্যন্ত নেমে পাওয়া গেল একটা কাঁটাঝোপ, তার ভিতরে ঢুকবার উপায় নেই।

বিমল বললে, 'এ ঝোপটাও নিশ্চয় প্রাচীন নয়। কুমার, নিয়ে এসো অস্ত্রশস্ত্র। সকলে মিলে ঝোপটাকে চটপট কেটে ফেলি এসো!'

ঝোপটাকে বিলুপ্ত করতে বেশিক্ষণ লাগল না। বাকি দুই গজ এগিয়ে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে বিমল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'এ কী হল? এখানে পাহাড়ের নিরেট পাথর ছাড়া তো আর কিছুই নেই!'

সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে বললেন, 'হায় মা-কালী? এ কী করলে মা? পাহাড়ের উপরে তুলে একেবারে পাতালে বসিয়ে দিলে?'

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, সব তো মিলল, কিন্তু শেষ হিসাব মিলছে না কেন?'

—'আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কুমার বললে, 'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কী?'

—'হিসাবে বোধ হয় ভুল হয়নি। কিন্তু মনে রেখো, স্পেনীয় জলদস্যুরা এ অঞ্চলে অত্যাচার করত তিন-চার শতাব্দী আগে। সে কত কালের কথা! কত যুগের কত ধুলো-মাটি-কাঁকর পুরু হয়ে জমে আছে এখানে, আমরা তা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি। শত শত বর্ষার জলে ভিজে তারপর তিন-চার শতাব্দীর রোদে পুড়ে সেই ধুলো-মাটি-কাঁকর আজ হয়ে উঠেছে পাথরের মতন কঠিন। তার তলায় এখানকার সব রহস্য হয়তো একেবারেই চাপা পড়ে গিয়েছে!'

বিমল একটু ভেবে বললে, 'কুমার, তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত বলেই বোধ হচ্ছে।... উত্তম! সবকিছুর জন্যেই আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছি। নিয়ে এসো 'ডিনামাইটের স্টিক'। জয়ন্তবাবু, আপনারা খানিক তফাতে নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে দাঁড়ান। আমরা এখনই আপনাদের সঙ্গে যোগদান করব।'

জয়ন্ত প্রভৃতি সরে গেল। কুমার ডিনামাইট এগিয়ে দিলে। যেখানে একটু আগে ঝোপটা ছিল সেইখানে ডিনামাইট রেখে বিমল তার পলিতায় করলে অগ্নিসংযোগ। তারপর তারাও দৌড়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু দুই চোখ বুজে মাকালীর উদ্দেশে জোড়হাতে প্রণাম করে বললেন, 'ও-মাকালী, আর ভোগা দিয়ো না মা, ভক্তদের চরণে ঠেলো না!'

ফাটল ডিনামাইট, ভীষণ শব্দের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠল পাহাড়টা। যেন আকাশ উঠল শিউরে, বাতাস হয়ে গেল স্তম্ভিত!

আশা-নিরাশার স্বপ্ন দেখতে দেখতে সকলে আবার ছুটে গেল সেইখানে।

সর্বাগ্রে বিমল। বিপুল আনন্দে চিৎকার করে বললে, 'কুমার হে! ফুলচন্দন পড়ুক তোমার মুখে! একেই বলে ক্ষুরধার বুদ্ধি। বোড়ের চালে কিস্তিমাত! ধন্য!'

ডিনামাইটের প্রতাপে যেখানে ঝোপ ছিল সেখানে পাহাড়ের খানিকটা অংশ ভেঙে উড়ে গিয়েছে এবং বেরিয়ে পড়েছে একটা অন্ধকার গুহার মুখ!

নিজের মস্ত মোটা দেহকে যথাসম্ভব লীলায়িত করে, দুই বাহু কোমরে রেখে সুন্দরবাবু অদ্ভুত এক 'ওরিয়েন্টাল ডান্স' নাচতে নাচতে বার বার বলতে লাগলেন, 'হুম, হুম, হুম, হুম।'

গুহার মুখ থেকে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে সংকীর্ণ একসার সিঁড়ি।

বিমল বললে, 'গুহার ভিতরে নিশ্চয়ই বাস করছে অন্তত তিন শতাব্দীর পুরাতন নিবিড় অন্ধকার। আমাদের এখন গোটা-দুই পেট্রলের লণ্ঠন জ্বালতে হবে।'

সুন্দরবাবু হঠাৎ কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে গিয়ে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, মনে আছে, পদ্মরাগ বুদ্ধের খোঁজে এমনি এক গুহায় ঢুকে আমরা কী ভয়ানক বিপদে পড়েছিলুম?'

—'মনে আছে বই কী!'

—'এখানেও যদি সেইরকম কোনও বিপদ-আপদ থাকে?'

—'আশা করি এখানে সেরকম কিছুই নেই।'

—'হুম! নেই বললেই সাপের বিষ থাকে না নাকি?'

—'তাহলে আপনি এইখানে বসেই বায়ুসেবন করুন, আমরা গুহার ভিতরে নেমে যাই।'

—'দ্যুৎ, তা কি বলছি? আমিও গুহার ভেতরে যাব, তবে তোমাদের আগে আগে নয়, সকলকার পিছনে।'

—'অর্থাৎ বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সর্বাগ্রে দৌড় মারতে পারবেন আপনি?'

—'ঠিক তাই হে, ঠিক তাই! সত্যি কথা স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জা নেই—হলুমই বা পুলিশের লোক। জানোই তো প্রবাদ বিধান দিয়েছে, 'চাচা আপনা বাঁচা'!'

বিমল ও কুমার পেট্রলের সমুজ্জ্বল লণ্ঠন নিয়ে গুহার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচের দিকে। তাদের আগে আগে, বাঘা এবং তাদের পরে যথাক্রমে জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু।

সিঁড়ি শেষ হল। সামনেই আসল গুহা। আকার তার মাঝারি। কয় শতাব্দী পরে হঠাৎ বিদ্যুতের মতন তীব্র আলোকের আঘাতে অতীতের নীরন্ধ্র অন্ধকার যেন আহত হয়ে মৌন আর্তনাদ করে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায় কে জানে!

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এক ধারণাতীত বীভৎস দৃশ্য।

নরকঙ্কাল, নরকঙ্কাল, নরকঙ্কাল! গুহার চারিদিকেই নরকঙ্কাল! শুভ্রতা সুন্দর। কিন্তু কঙ্কালের শুভ্রতা যে এত বীভৎস হতে পারে সেটা তারা আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

গুহার পাথুরে মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে রাশিকৃত কঙ্কাল। কেউ চিত হয়ে, কেউ উপুড় হয়ে, কেউ পাশ ফিরে, কেউ বা গুটিসুটি মেরে জড়সড় হয়ে। এবং কোথাও-বা একটা কঙ্কালের উপরে লম্বমান হয়ে আছে আর-একটা কঙ্কাল। কোনও কোনও কঙ্কাল পা ছড়িয়ে বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, তাদের মুণ্ডগুলো খসে পড়ে আছে গুহাতলে।

মানিক অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, এই সেই যক্ষিণীরা। আহা, অভাগীর দল! সারাঙ্গানি এদের এখানে ফেলে রেখে গুহামুখ বন্ধ করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। আর এরা এই অন্ধকারে অনাহারে অসহায় ভাবে কাঁদতে কাঁদতে তিলে তিলে ছটফট করতে করতে আত্মসমর্পণ করেছিল দারুণ যন্ত্রণাময় মৃত্যুর কবলে। এতদিন বন্ধ গুহা থেকে বেরুতে না পেরে তাদের অন্তিম নিশ্বাস এখনও হয়তো বন্দি হয়ে আছে এইখানে। আজ জীবন্ত আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলন হল তাদের অন্তিম নিশ্বাসের! ওঃ, কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!'

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে যাতনাভরা কণ্ঠে বললেন, 'মানিক, আর বোলো না—আর বোলো না—আমি আর সহ্য করতে পারব না—উঃ!'

গুহার ভিতরে একধারে ছিল দশটা বড়ো বড়ো সেকেলে সিন্দুক।

বিমল একে একে গোটা-চারেক সিন্দুকের ডালা খুলে ফেললে।

প্রত্যেকটাই পরিপূর্ণ। কোনওটায় রয়েছে নানাদেশি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, কোনওটায় রয়েছে রকম-রকম মূল্যবান রত্ন, কোনওটায় রয়েছে খাঁটি সোনার বাসন-কোশন এবং কোনওটাতে বা রৌপ্যনির্মিত অনেক রকম জিনিস!

বিমল প্রায়-বন্ধ-স্বরে বললে, 'কুমার, আর কোনও সিন্দুক খোলবার শক্তি আমার নেই! যা দেখছি, এত ঐশ্বর্য একসঙ্গে দেখবার কল্পনাও কোনওদিন করিনি!'

জয়ন্ত বেদনাবিদীর্ণ কণ্ঠে বললে, 'এখানকার সব ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাখানো রয়েছে অসংখ্য হতভাগ্যের অশ্রুধারা! এ ঐশ্বর্য বিষাক্ত! আর-কিছু দেখবার ইচ্ছা আমার নেই।'

সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'হুম! মনে হচ্ছে আমি এখনই পাগল হয়ে যাব—একেবারেই পাগল হয়ে যাব! ওঃ!'

মানিক শিউরোতে শিউরোতে বললে, 'গুপ্তধন এমন ভয়ঙ্কর? চলুন, আমরা বাইরে পালিয়ে যাই!'

দুই চক্ষু মুদে কুমার বললে, 'ঠিক! বাইরে আছে অম্লান সূর্যালোক—পবিত্র, স্বাস্থ্যকর! শীঘ্র চলুন, এই ঐশ্বর্যময় নরকের মধ্যে বন্ধ হয়ে আসছে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস!'

নিতান্ত হালকা মামলা

ফুরিয়ে গিয়েছে প্রাতরাশের পালা। সাঙ্গ হয়েছে সংবাদপত্র পাঠ। জয়ন্তের ইচ্ছা বাঁশি সাধে। মানিকের সাধ দুই-এক চাল দাবা খেলে। এমন সময়ে কালীবাবুর প্রবেশ। দু-জনেরই সাধে পড়ল বাদ।

বাবু কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরি। দক্ষিণবঙ্গের একজন বড়ো জমিদার। কিন্তু একরকম স্থায়ীভাবেই শিকড় গেড়েছেন কলকাতায়। জয়ন্তদের পাড়ার লোক এবং প্রায় বন্ধুও বটে। বয়স ষাটের কম হবে না। মাথার চুল কার্পাস তুলোর মতো ধবধবে। কিন্তু গায়ের টকটকে রঙের জেল্লা এখনও ময়লা হয়নি এবং লম্বা-চওড়া দেহখানিও বেশ শক্তসামর্থ। একাধিক জ্যোতিষী রজত মুদ্রার বিনিময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অন্তত পঁচাশি বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি যে-কোনও যমদূতকে কদলী প্রদর্শন করতে পারবেন এবং সেইজন্যে বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়পক্ষের পক্ষপাতী হয়েও কালীবাবু দিব্য সপ্রতিভ মুখে নিষ্করুণ পৃথিবীর বক্রদৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন।

পরমায়ুর বাকি এখনও সিকি শতাব্দী—সে তো বহুকালের ব্যাপার। বয়সে বিয়ে করেছি তো হয়েছে কী? দীর্ঘজীবীকে আবার বুড়ো বলে খোঁটা দেওয়া কেন বাপু? কালীবাবুর মনের ভাবখানা হচ্ছে এইরকম। জ্যোতিষীদের কথায় তাঁর অটল নির্ভরতা।

মানিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, 'আরে কালীবাবু যে! ভোরবেলা তো আপনার কাছে অবেলা! এমন অসময়ে বউদির রঙিন আঁচল ছেড়ে আমাদের মতো চিরকুমারদের খাস্তা আস্তানায় কেন?'

কিন্তু জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন অসুস্থ।'

কালীবাবুর প্রফুল্ল মুখে অসুস্থতার ছাপ কেউ দেখে না। জয়ন্তের বিস্ময়ের কারণ আছে।

কালীবাবু অবসাদগ্রস্তের মতো একখানা চেয়ারের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, আমি অসুস্থ। কিন্তু দেহের নয় মনের অসুখ।'

সরকার সব জমিদারি হস্তগত করবেন বলে আজকাল কোনও জমিদারেরই মন সুস্থ নয়। কালীবাবু কি তাই—

জয়ন্তের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে কালীবাবু হঠাৎ বললেন, 'জয়ন্তবাবু, শুনেছি আপনারা শখের গোয়েন্দাগিরি করতে ভালোবাসেন। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন!'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আপনাকে আমরা কোন দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারি? আপনার কি কিছু চুরি গিয়েছে?'

কালীবাবু বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'চুরি? না, আমার কিছুই চুরি যায়নি। চুরি গেলে আমি এতটা চিন্তিত হতুম না, আর সরকারি পুলিশ থাকতে আপনাদের বিরক্ত করতেও আসতুম না।'

—'তবে?'

—'এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন। এখানা কাল বৈকালে পেয়েছি।' কালীবাবু নিজের পকেট থেকে একখানা খাম বার করে জয়ন্তের দিকে এগিয়ে দিলেন।

কালীবাবুর ডান হাতের দিকে চেয়ে জয়ন্ত বললে, 'আপনার বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর উপরে পট্টি বাঁধা কেন?'

—'একটা ঘরের দুই দরজার মাঝখানে পড়ে কাল বড়োই চোট লেগেছে। ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আজ আর আঙুল দুটো নাড়তে পারছি না। কিন্তু ওকথা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। চিঠিখানা আগে পড়ে দেখুন।'

খামের দিকে তাকিয়েই জয়ন্তের চোখ একটু চমকে উঠল। তার উপরে হাতের লেখা নেই, ছাপা বই থেকে কতকগুলো অক্ষর কেটে নিয়ে পরে পরে বসিয়ে কালীবাবুর নাম ও ঠিকানা লেখা হয়েছে। সাধারণ সরকারি খাম, আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ছাপ মারা।

খামের ভিতরের কাগজও চিঠির কাগজ নয়, সাধারণ ফুলস্ক্যাপ কাগজের আধখানা কেটে নিয়ে মাঝখানে ভাঁজ করে ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠির কথাগুলোও মুদ্রিত পুস্তকের অক্ষর কেটে নিয়ে বসানো।

কথাগুলো এই :

২০।৮।৫৪

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরি
সমীপেষু

মহাশয়,

আমার স্ত্রী মাধবী বিধবা নয়। আমিই তার বৈধ স্বামী এবং বলা বাহুল্য আজও বহাল তবিয়তে সশরীরে বিদ্যমান। স্বামী বর্তমান থাকতে হিন্দু স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ হতে পারে না, অথচ শুনছি আমার স্ত্রীকে আপনি আবার 'বিবাহ' করেছেন। এটা যে গুরুতর অপরাধ আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন।

এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আমি শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করব। ইতি—

নিবেদক
শ্রীমহীতোষ সেন।

পত্রখানা পাঠ করে জয়ন্ত নীরবে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

কালীবাবু বললেন, 'আমার বিবাহের ব্যাপার নিশ্চয় আপনার অজানা নেই?'

না, জয়ন্তের তা অজানা নেই! ব্যাপারটা হচ্ছে এই :

নিঃসন্তান অবস্থায় কালীবাবুর প্রথম সহধর্মিণী পরলোকে গমন করেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। বিপুল বিত্তের মালিক হয়েও সন্তানের অভাবে কালীবাবুর দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁর তারাপ্রসন্ন নামে এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে বটে, কিন্তু তার নাম তিনি মুখেও আনেন না। সে হচ্ছে মদ্যপ, জুয়াড়ি ও অকর্মণ্য; নিজের সমস্ত সম্পত্তি অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছে খোলামকুচির মতো এবং কালীবাবুও তাকে আর নিজের বাড়িতে ঠাঁই পর্যন্ত দিতে রাজি নন। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল অশান্তিময়। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে ও বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিধবা মাধবী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তখন মাধবীর বয়স কুড়ি বৎসর এবং কালীবাবু পঞ্চাশের কোঠা পার হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং বর-কন্যার এই মিলন যে রাজযোটক বলে গণ্য হয়নি, সে কথা বলা বাহুল্য। ভার্যার সার্থকতা পুত্রের জন্যেই, অনেকের কাছে শাস্ত্রবাক্য আউড়ে কালীবাবু তা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু শুধু শাস্ত্রের নির্দেশ পালনের জন্যেই যে তিনি পুনর্বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, এটা একেবারে পূর্ণ সত্য না হতেও পারে। কেবল যুবতী নয়, মাধবী ছিল পরমা সুন্দরী।

এই অসম মিলন মাধবী কীভাবে গ্রহণ করেছিল, বাইরে তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু সে বুদ্ধিমতীরই মতো মুখে কোনও প্রতিবাদ করেনি, কারণ প্রতিবাদ করবার যোগ্যতা তার ছিল না। শৈশব থেকেই সে বাপ-মা হারা, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘরে অনাদরে মানুষ; তার উপরে প্রথম যৌবনেই স্বামী

হারিয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল অনাথ আশ্রমে; অতএব এখানে তার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠতেই পারে না, বরং বলা যায় যে, এই দ্বিতীয় বিবাহটা তার পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাপে বরের মতো, কারণ কালীবাবু যুবক না হলেও ধনকুবের।

তার বৈধব্যের পিছনেও আছে একটুখানি ইতিহাস। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মহীতোষ সেনের সঙ্গে যখন তার বিবাহ হয়, তখনও সে হয়নি উদ্ভিন্নযৌবনা। বিবাহের অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফৌজে চাকরি নিয়ে মহীতোষ মিশরে চলে যায়। তারপর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মিশর থেকে সরকারি খবর আসে যে, কোনও একটা যুদ্ধের পর থেকে মহীতোষ সেন 'মিসিং', অর্থাৎ নিখোঁজ। তারপর একে একে কয়েক বৎসর কেটে যায়, কিন্তু তার আর কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সকলে ধরে নেয় যে, মহীতোষ আর ইহলোকে বর্তমান নেই। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় যে মৃত্যু, এইটেই দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

কিন্তু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিখোঁজ মহীতোষের আত্মা যে এখন প্রেতলোকে বাস করছে না, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে লিখিত তার পত্রে সেই সত্যটাই প্রমাণিত হচ্ছে। বিস্ময়ের কথা, কিন্তু অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশে অগুন্তিবার দেখা গিয়েছে এমন ব্যাপার।

দুই

জয়ন্ত মনে মনে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা রীতিমতো নাটকীয় হয়ে উঠেছে। বাঙালি জীবনে এমন ঘটনা সহসা ঘটে না।

কালীবাবু বললেন, 'এখন আমি কী করব?'

মানিক বললে, 'কী করা উচিত, তার কিছুই কি আপনি স্থির করতে পারেননি?'

কালীবাবু বললেন, 'আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি আর সেইজন্যেই তো আপনাদের সাহায্য চাই।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'কিন্তু কীরকম সাহায্য?'

—'এই পত্রখানা দেখে আপনার কী মনে হয়?'

—'আর পাঁচজনের যা মনে হতে পারে তাই। অর্থাৎ বিশেষ কিছুই নয়। প্রথমত, পত্রলেখক নিজের হস্তাক্ষর গোপন করতে চায়। দ্বিতীয়ত, লেফাফা সরকারি, কাগজেও কোনও বিশিষ্টতা নেই; এর 'ওয়াটার মার্কে' পাওয়া যায় বটে Howard Smith, Bellfast Bond, Made in Canada. কিন্তু এও হচ্ছে খুব সাধারণ—'

কালীবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও ওই মার্কা মারা ফুলস্ক্যাপ কাগজ ব্যবহার করি।'

জয়ন্ত ভ্রূ সঙ্কুচিত করে বললে, 'তাই নাকি? আপনিও ওই একই কাগজ ব্যবহার করেন?' তারপর অল্পক্ষণ স্তব্ধ থেকে সে বললে, 'তাহলেই বুঝুন, এরকম কাগজ আপনি ব্যবহার করেন, আমি ব্যবহার করতে পারি, আবার আরও অনেকেও ব্যবহার করতে পারেন। তাই বলছিলুম, কাগজেও কোনও বিশিষ্টতা নেই।'

মানিক বললে, 'কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আন্দাজ করা যেতে পারে। পত্রলেখক নিজের ঠিকানা দেয়নি। সে নিজের হাতের লেখাও কারুকে দেখাতে চায় না। এ লুকোচুরির কারণ কী?'

কালীবাবু বললেন, 'অথচ সে নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায় না, কারণ, সে নাকি শীঘ্রই আমার সঙ্গে দেখা করবে! সুতরাং কোনও রকম লুকোচুরিই এখানে যুক্তিহীন বলে মনে হয় নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমিও মনে মনে মাথা ঘামাচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছে নিশ্চয়ই কোনও মতলববাজ লোক। আমার সন্দেহ হয়, লোকটার মনে বিশেষ কোনও মন্দ অভিসন্ধি আছে, কিন্তু সেটা যে কী, তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

মানিক বললে, 'চিঠিখানার ধরন-ধারণ অনেকটা উড়োচিঠির মতো। উড়োচিঠি প্রায়ই ভিত্তিহীন হয়।'

কালীবাবু বললেন, 'কিংবা কেউ হয়তো আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার ফিকিরে আছে।'

জয়ন্ত বললে, 'তাও অসম্ভব নয়।'

—'কিন্তু এ সবই তো আন্দাজি কথা। আমি আপনাদের কাছে এসেছি একটা নিশ্চিত নির্দেশ পাবার আশায়।'

—'কালীবাবু, এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না। আমাকে একটু ভাববার সময় দিন। মনে হচ্ছে, একটা পথও যেন খুঁজে পেয়েছি। আমরা কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব। সেই সময়ে হয়তো কোনও কোনও কথা বলতে পারব।'

তিন

পরদিন প্রভাতে যথাসময়ে কালীবাবুর বাড়ির দিকে পদচালনা করলে জয়ন্ত ও মানিক!

মানিক শুধোলে, 'কাল দুপুরে তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে? আমি এসে ফিরে গিয়েছি।'

—'গিয়েছিলুম সৌরীনের কাছে, কলেজের সৌরীন মিত্রের কথা তোমার মনে আছে?'

—'সৌরীন মিত্র? এক সৌরীন মিত্র তো আমাদের সঙ্গে 'ফোর্থ ইয়ার' পর্যন্ত পড়েছিল। তুমি কি তার কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ, সেই-ই। আমি জানতুম, সৌরীনের এক ভাই বারীন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পল্টনে যোগ দিয়ে উত্তর আফ্রিকায় গিয়েছিল। তার সঙ্গেই ছিল আমার দরকার।'

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে, 'তার সঙ্গে তোমার কী দরকার থাকতে পারে?'

—'বিশেষ কিছুই নয়। আমি খালি জানতে গিয়েছিলুম, ফৌজে মহীতোষ সেন নামধারী কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল কি না?'

মানিক বলে উঠল, 'ওহো, বুঝেছি।......তারপর কী জানতে পারলে?'

—'জানলুম, মহীতোষ সেন নিখোঁজ হলেও যুদ্ধে মারা পড়েনি।'

—'তারপর?'

—'ব্যাপারটা আর একটু ফলাও করে বলছি শোনো। মহীতোষের কথা তুলতেই বারীন উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—ব্ল্যাকগার্ড। সে ভারতের বাইরে বাঙালির নাম ডোবাতে চেয়েছিল। আমি বললুম—কেন? বারীন বললে—লড়াই শুরু হতেই সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে এটা জানা যায়নি, তাই তার নাম বেরিয়েছিল নিখোঁজদের তালিকায়। তারপর সব কথা প্রকাশ পায়, তাকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি চলে, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া যায় না। ধরা পড়লে 'ডিজার্টার' বলে সামরিক আদালতে নিশ্চয়ই তার কঠিন শাস্তি হত। বুঝেছ মানিক! এতদিন পরে সেই বীরপুরুষই দুষ্টগ্রহের মতো আবির্ভূত হয়েছেন বেচারা কালীবাবুর ভাগ্যগগনে!'

—'হুঁ। ব্যাপারটা দেখছি বড়োই ঘোরালো হয়ে উঠল।'

—'সৈনিকবেশে বারীন আর অন্য দুই বন্ধুর সঙ্গে তোলা মহীতোষের একখানা ফটোও আমি সংগ্রহ করেছি। ভবিষ্যতে সেখানা কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

—'বিশেষ কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। ভারত আজ স্বাধীন, আর মহীতোষ ছিল ইংরেজ আমলের সেপাই। 'ডিজার্টার' বলে এখন কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে চাইবে কি?'

—'বোধহয়, না। আর সেইজন্যেই তো এতদিন পরে এই কাপুরুষ আত্মপ্রকাশ করতে সাহসী হয়েছে।'

—'কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়েও সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা লুকোতে চায় কেন?'

—'ঠিক বলেছ। এর মধ্যে যেন কোনও শয়তানির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখন একথা চাপা দাও, এই আমরা কালীবাবুর বাড়ির কাছে এসে পড়েছি।'

চার

জয়ন্ত ও মানিক সচমকে দেখলে, কালীবাবুর দরজার সামনে ছোটো এক জনতা। তার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় একাধিক লাল-পাগড়িকেও।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'এখানে আবার পুলিশ হাঙ্গামা কেন?'

ঠিক সেই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ইনস্পেকটার ভূপেন চক্রবর্তী। মেদদোষাক্রান্ত, কিন্তু দশাসই চেহারা। ভারিক্কে চালচলন, উপরিতন কর্মচারী ছাড়া দুনিয়ার আর সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কৃপালু নেত্রে। জয়ন্ত ও মানিক তাঁকে চিনত, কারণ কোনও কোনও মামলায় তাদের পুরাতন বন্ধু ও পরামর্শপ্রার্থী ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর সঙ্গে ভূপেনবাবুর দেখা পাওয়া গিয়েছে কয়েকবার।

তাদের দেখেই ভূপেনবাবু বলে উঠলেন, 'আরে, আরে, এ কী ব্যাপার? মড়া পড়তে না পড়তেই শকুনির টনক নড়ে?'

জয়ন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, মশায়ের উপমাটার অর্থ বুঝলুম না।'

—'অর্থটা কি এতই দুর্বোধ্য? হা হা হা হা! কিন্তু গোড়াতেই জেনে রাখুন মশাই, সুন্দরবাবুর মতো আমিও আপনার সাহায্যপ্রার্থী নই—নিজের মামলার ভার আমি নিজেই বহন করতে পারি। আর তা ছাড়া এটা একটা মামলার মতো মামলাই নয়, এ হচ্ছে নিতান্ত হালকা মামলা, যে কোনও শিশুও এর তদ্বির করতে পারে।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি কীসব বাজে বকছেন? আমরা কোনও মামলার ভার নেবার জন্যে এখানে আসিনি। কালীবাবু ডেকেছেন তাই আমরা এসেছি। আমরা তাঁর বন্ধু।'

—'কালীবাবু আপনাদের ডেকেছেন? কিন্তু তিনি এখন কোথায়?'

—'কেন, তিনি কি বাড়িতে নেই?'

—'বাড়িতেও নেই, পৃথিবীতেও নেই।'

—'মানে?'

—'কাল রাত্রে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে জয়ন্ত ও মানিক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের মন একথা বিশ্বাস করতে চাইলে না এবং তাদের মুখের উপরেও ফুটে উঠল সেই মনের কথা।

ভূপেনের শিক্ষিত দৃষ্টি সে কথাটা বুঝতে ভুল করলে না। ওষ্ঠাধর টিপে মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'যা ভাবছেন, তা নয়। কালীবাবু যে আত্মহত্যা করেছেন তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই।'

ততক্ষণে জয়ন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছে। কালীবাবুর অভাবনীয় অপঘাতের সংবাদ পেয়ে সাধারণ লোকের মতো তারও মন প্রথমটা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরই জাগ্রত হয়ে উঠল তার তীক্ষ্ণধার নিশ্চিত গোয়েন্দা-বুদ্ধি—যে কোনও পরিস্থিতির মধ্যে যা থাকে সর্বদাই অবিচল ও অবিভ্রান্ত। সে বেশ সহজভাবেই বললে, 'মৃতদেহ কি এর মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে?'

—'না, উপরওয়ালাদের আদেশের অপেক্ষা করছি।'

—'বলেছি, কালীবাবু ছিলেন আমাদের বন্ধু। শেষবারের জন্যে একবার তাঁকে দেখতে পাব কি?'

আবার ঠোঁট টিপে একটু হেসে ভূপেনবাবু বললেন, 'এসব জায়গায় বাইরের বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ। তবে আপনি পরিচিত ব্যক্তি, অতএব আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখানেও যেন শখের গোয়েন্দাগিরি করে আপনি আমার উপরে টেক্কা মারবার চেষ্টা না করেন, কারণ আমি সুন্দরবাবু নই। আমি বলছি এটা আত্মহত্যার মামলা, সব দেখে-শুনে আপনাকেও আমার কথা মানতে হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন, তাই সই।'

ভূপেনের পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও মানিক ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল।

সেটা হচ্ছে কালীবাবুর একাধারে বসবার ও পড়বার ঘর। আকারে বড়োই বলতে হবে। তিনদিকের দেওয়াল আড়াল করে সারি সারি বইভরা আলমারি। যেদিকে দেওয়াল-ঢাকা আলমারি নেই সেইদিকে তিনটি জানলা ও ঘরে ঢোকবার জন্যে একটি মাত্র দরজা। ঘরের মাঝখানে একটা বড়ো টেবিল ও তার তিনদিকে চারখানা ও একদিকে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে লেখবার 'প্যাড' দোয়াতদান, কলমদান, কাগজ-চাপা, খানকয় বই ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস।

ঘরের এক কোণে একটা টাইপরাইটারের ছোটো টেবিলের উপরে টাইপ করার যন্ত্র। জয়ন্ত জানত, সেটা হচ্ছে কালীবাবুর বাংলা টাইপরাইটার, তিনি নিজে ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন।

বড়ো টেবিলের একপাশে কিছু তফাতে একখানা ইজিচেয়ার এবং তারই উপরে দেখা যাচ্ছে অর্ধশয়ান অবস্থায় হতভাগ্য কালীবাবুর মৃতদেহ। তাঁর মাথাটি বাঁ কাঁধের উপরে লুটিয়ে পড়েছে এবং ডান রগের একটা গভীর, ভীতিকর ও রক্তাক্ত ক্ষত। মুখ ও বুকের কতক অংশের উপরেও চেয়ারের একদিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে এবং মেঝের উপরেও রয়েছে চাপ চাপ রক্ত। ইজিচেয়ারের চ্যাটালো হাতলের উপরে পড়ে আছে তাঁর ডান বাহুখানা এবং সেই হাতের মুষ্টির মধ্যে রয়েছে একটা রিভলভার—ট্রিগারের উপরে তখনও সংযুক্ত রয়েছে মৃতের তর্জনীটি।

কালীবাবুর চোখ দুটি খোলা এবং তাদের মধ্যে তখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে বিস্ময়ের মতো একটা ভাব—জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ করবার জন্যে যুক্তিহীন মৃত যে এমন আকস্মিকভাবে তাঁকে আক্রমণ করবে যেন তিনি তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। জয়ন্তের মনে হল এ চোখ যেন আত্মঘাতীর চোখ নয়।

কিন্তু ভূপেনের তা মনে হয়নি। তিনি অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন, 'দেখছেন ক্ষতের চারিদিকে পোড়া দাগ? তার মানে কালীবাবু, রিভলভারের নলচেটা একেবারে নিজের রগের উপরে রেখে টিপকল টিপে দিয়েছিলেন।'

মুখে খালি 'হুঁ' বলে জয়ন্ত হেঁট হয়ে পড়ে খরচোখে কালীবাবুর হাতটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করলে। তারপর বললে, 'পরশু দিন কালীবাবুর অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর উপরে বিষম চোট লেগেছিল, এখনও তার চিহ্ন জাজ্বল্যমান। কাল দেখেছিলুম আঙুল দুটোর উপরে পটি বাঁধা রয়েছে—'

ঘরের দরজার কাছ থেকে নতুন গলার আওয়াজ এল—'রিভলভারের ঘোড়া টেপবার আগে কালীবাবু নিশ্চয়ই সেটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ওই দেখুন, ঘরের কোণে ব্যান্ডেজটা এখনও পড়ে রয়েছে।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মূর্তি। বয়স হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রং উজ্জ্বল শ্যাম। মুখশ্রী বিশেষত্ববর্জিত হলেও দেখতে মন্দ লাগে না। মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো লম্বা চুল, জোড়া ভুরু, ওষ্ঠের উপরে চার্লি চ্যাপলিন-গোঁফ। ডান গালে একটা বড়ো আঁচিল সহজেই চোখে পড়ে। জামাকাপড় বাবুয়ানার পরিচয় দেয়। দেহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসু চোখে ভূপেনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

ভূপেন বললেন, 'ইনি হচ্ছেন মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি, বাসা এই বাড়িতেই। কাল রাত এগারোটার সময়ে রিভলভারের শব্দ শুনে ছুটে এসে উনিই প্রথমে জানতে পারেন, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন।'

মতিলালের মুখের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভূপেনের জবানীতে জয়ন্ত তার পরিচয় শ্রবণ করলে। তারপর তার নমস্কারের উত্তরে প্রতি নমস্কার করে সে ঘরের কোণে এগিয়ে গিয়ে মেঝের উপর থেকে তুলে নিলে পরিত্যক্ত ব্যান্ডেজটা।

ব্যান্ডেজের খানিকটা অংশ রক্তের ছোপে আরক্ত।

জয়ন্তের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ফিরে মানিকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'ভূপেনবাবু, আত্মহত্যার কোনও কারণ আপনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন?'

যেন কেল্লা ফতে করেছেন এমনই ভাব দেখিয়ে ভূপেন বললেন, 'পেরেছি বই কি। এই চিঠিখানা দেখুন, একখানা ছিল বড়ো টেবিলটার উপরে। এই একখানা চিঠিই আত্মহত্যার পক্ষে যথেষ্ট।'

সেই চিঠি—ছাপার অক্ষর কেটে নিয়ে যা লেখা হয়েছে।

জয়ন্ত চিঠিখানা যেন দেখেও দেখলে না। বললে, 'আর কোনও সূত্র পেয়েছেন?'

—'পেয়েছি বই কি, সবচেয়ে বড়ো সূত্র। এদিকে আসুন।' ভূপেনের মুখে মহা গাম্ভীর্যের ভাব।

পাঁচ

ভূপেন কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বাংলা টাইপরাইটারে টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখুন।'

তখনও টাইপরাইটারের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে একখানা 'টাইপ' করা কাগজ। জয়ন্ত মুখ নামিয়ে পাঠ করলে :

'সধবাকে আমি বিধবা ভেবে বিবাহ করেছি—মাধবীর শাস্ত্রসম্মত স্বামী আবার ফিরে আসছে। এরপর সমাজে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। এই লজ্জা ও অপমানের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্য আজ আমি এই পত্র লিখেই আত্মহত্যা করব এবং এর জন্যে আর কেহ দায়ী হবে না। ইতি—

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরি'

জয়ন্ত টাইপরাইটার যন্ত্রটা ধরে নাড়াচাড়া করে মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবতে লাগল। তারপর পকেট থেকে রুপোর শামুকের মতো দেখতে নস্যদানটা বার করে একটিপ নস্য গ্রহণ করলে।

গোড়া থেকেই মানিক এই অভাবিত আত্মহত্যার ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারেনি। উড়োচিঠির সত্যতা সম্বন্ধে কালীবাবুর নিজেরই সন্দেহ ছিল এবং সেইজন্যেই তিনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সন্দেহ নিরসন না করেই তিনি যে আত্মহত্যা করবেন, তাঁর প্রকৃতি এতটা দুর্বল ছিল না। বিশেষ কালীবাবু ছিলেন যেন জীবনজোয়ারের মূর্তিমান উচ্ছ্বাস; নিখিল বিশ্বের পরিপূর্ণ আনন্দ আশ মিটিয়ে উপভোগ করবার জন্য তাঁর চিত্তে ছিল একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা; এত সহজে দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে আত্মহত্যা করবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তার বিশ্বাস, জয়ন্তও এই কথা জানে এবং মানে।

জয়ন্ত হঠাৎ এখন নস্য নিলে কেন? বহু মামলায় মানিক বারংবার লক্ষ করেছে, সপক্ষে কোনও মূল্যবান সূত্র পেলেই জয়ন্ত খুশি হয়ে নস্য না নিয়ে পারে না। ওই টাইপরাইটারটা নেড়েচেড়ে সে এমন কী আনন্দজনক সূত্র আবিষ্কার করলে? কিন্তু জয়ন্তের মুখ দেখে এ প্রশ্নের কোনও উত্তরই পাওয়া যায় না। তার মুখ একেবারেই কালীঘাটের পটে আঁকা মূর্তির মতো ভাবহীন।

মুরুব্বির মতো মস্তক সঞ্চালন করতে করতে ভূপেন বললেন, 'কী জয়ন্তবাবু, এখন কী ভাবছেন? যা বললুম, তাই তো? কালীবাবু নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছেন—এটা হচ্ছে নিতান্ত হালকা মামলা।'

রুপোর নস্যদানটা পকেটস্থ করে জয়ন্ত বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক। এটা নিতান্ত হালকা মামলা।'

ভূপেন বললেন, 'তাহলে এই রক্তাক্ত দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা খামোকা আর মেজাজ খারাপ করি কেন? বাইরে চলুন।'

—'তাই চলুন। বাইরে গিয়ে মতিবাবুর কাছ থেকে আমি দু-একটা কথা জানবার চেষ্টা করব। আশা করি ওর আপত্তি হবে না?'

মতিলাল দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললে, 'বিলক্ষণ! আপত্তি আবার কীসের? তবে আমাকে বেশিক্ষণ ধরে না রাখলেই বাধিত হব, কারণ এই দুর্ঘটনার পরে আমার ঘাড়ে পড়েছে অনেক অপ্রীতিকর কাজের ভার।'

ছয়

—'মতিবাবু, আপনি কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছেন কতদিন?'

—'তিন বৎসর।'

—'কালীবাবু নিজের সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার উপরে ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস। কেবল সাংসারিক নয়, সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার নিয়েই আমার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন।'

—'কালীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র তারাপ্রসন্নবাবুকে আপনি চেনেন কি?'

—'নিশ্চয়ই চিনি! এই কালকেই তো তিনি এখানে এসে বিষম হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছিলেন।'

—'সে আবার কী?'

—'কালীবাবুর সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া হয়েছিল। আমি সেখানে হাজির না থাকলে খুড়োকে তিনি নিশ্চয় মেরেই বসতেন।'

—'কেন?'

—'কালীবাবুর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি পাবার কথা তারাপ্রসন্নবাবুরই। কিন্তু কালীবাবু সম্প্রতি উইল করে সমস্ত সম্পত্তি দিয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী মাধবীদেবীকে।'

—'সমস্ত সম্পত্তি?'

—'এক রকম তাই বটে। তারাপ্রসন্নবাবু পাবেন কিছু কিছু মাসোহারা মাত্র। অবশ্য মাধবীদেবী ভোগ করবেন কেবল জীবনস্বত্ব—তাঁর অবর্তমানে তারাপ্রসন্নবাবুরই বংশধররা সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন। কিন্তু উইলের এই শর্ত তারাপ্রসন্নবাবুর মনঃপূত হয়নি, আর তাই নিয়েই ঝগড়া।'

—'উইল কবে হয়েছিল?'

—'গেল হপ্তায়, অর্থাৎ আজ থেকে ছয় দিন আগে।'

এই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে একজন দাসী মতিলালের সামনে এসে বললে, 'মা-ঠাকরুন আপনাকে ডাকছেন।'

মতিলাল বললে, 'শুনলেন তো, আমার তলব পড়েছে? কর্তা-গিন্নি দু-জনেরই আমাকে না হলে চলে না। বেশি বিশ্বস্ত হওয়ার মানেই হচ্ছে, বেশি খাটুনি খেটে মরা।'

—'মা-ঠাকরুন কে?'

—'মাধবীদেবী।'

—'বেশ, আপনি আসুন, আমার আর কিছু জানবার নেই।—না, না, আমার আর একটি মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে। কালীবাবুর বাড়িতে বাংলা টাইপরাইটার আছে কয়টি?'

—'একটা।'

—'ব্যাস, আমার কথা ফুরল।'

মতিলালের হন্তদন্তের মতো প্রস্থান।

ভূপেন বললেন, 'জয়ন্তবাবু, বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মিছে আর ফ্যাঁকড়া বাড়াচ্ছেন কেন? নিজের হাতে যে মরে, তাকে আর কোনও সাহায্যই করা যায় না।'

জয়ন্ত রসহীন কণ্ঠে হাস্য করে বললে, 'আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। এটা নিতান্তই একটা হালকা মামলা। তবে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন?'

—'বলুন।'

—'আত্মহত্যার আগে কালীবাবু যে কথাগুলি 'টাইপ' করে গিয়েছিলেন, ওই টাইপরাইটারেই সে কথাগুলি আর একখানা কাগজে 'টাইপ' করিয়ে আমাকে একবার দেখাতে পারেন?'

—'এ আবার আপনার কী খেয়াল?'

—'যথাসময়েই সব কথা বলব। বৈকালে আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।'

সাত

বৈকাল। জয়ন্ত ও মানিক থানার ভিতরে প্রবেশ করল।

তাদের দেখেই ভূপেন টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, 'আরে জয়ন্তবাবু আপনি এ আবার কী গোল বাধালেন?'

মুখ টিপে হেসে জয়ন্ত বললে, 'ব্যাপার কী'?

—'বড়োই রহস্যময়। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'কী বুঝতে পারছেন না?'

—'যে টাইপরাইটারের সঙ্গে কালীবাবুর অন্তিম স্বীকার-উক্তি সংলগ্ন ছিল, তার মধ্যে 'রিবন' বা কালির ফিতে নেই।'

—'আমি তা জানি।'

—'কেবল তাই নয়। তারপর নতুন রিবন আনিয়ে কালীবাবুর সেই স্বীকার-উক্তির 'কপি' করে দেখা গেল, সেটা 'টাইপ' করা হয়েছে অন্য কোনও 'মেশিনে', কারণ আসল আর নকলের 'টাইপে'র ছাঁদ একরকম নয়।'

—'ব্যাপারটা যে এই রকম দাঁড়াবে, আমি আগেই সেটা অনুমান করতে পেরেছিলুম। এটা নিতান্ত হালকা মামলা।'

ভূপেন প্রায় গর্জন করে বলে উঠলেন, 'কে বলে মামলাটা হালকা? মামলাটা এর মধ্যেই দস্তুরমতো ভারী হয়ে উঠেছে!'

জয়ন্ত বেশ সহজভাবেই বললে, 'হালকা কি ভারী জানি না মশাই, তবে এটা যে খুনের মামলা, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই।'

ভূপেন উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আপনি যে আরও বেশি ভারী—অর্থাৎ গুরুতর কথা বলছেন! আত্মহত্যাকেও আপনি খুন বলে চালাতে চান নাকি?'

—'ভূপেনবাবু, আমার মতো আপনিও তো স্বকর্ণে শুনেছেন কালীবাবুর একটার বেশি টাইপরাইটার ছিল না? আর স্বচক্ষেই তো দেখেছেন, তাইতেই আটকানো ছিল তাঁর স্বীকার-উক্তি? অথচ সেই টাইপরাইটারে কালির ফিতে ছিল না! আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে, আত্মহত্যার পূর্ব-মুহূর্তে নিজস্ব টাইপরাইটার থাকতেও কালীবাবু বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও ছুটে গিয়ে অন্য যন্ত্রে তাঁর স্বীকার উক্তি 'টাইপ' করে এনেছিলেন? এটা একেবারেই অসম্ভব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ব্যক্তির হাত আছে।'

'দ্বিতীয় ব্যক্তি?'

—'হ্যাঁ, হত্যাকারী।'

ভূপেনের লম্ফত্যাগ ও আসনত্যাগ। সে চমকিত কণ্ঠে বললে, 'কী বলছেন আপনি!'

জয়ন্ত নিজের মনেই বললে, 'ঘরের মেঝে থেকে কালীবাবুর আঙুলের ব্যান্ডেজ তুলে নিয়ে প্রথমেই আমার চোখ খুলে যায়। কালীবাবুর ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী ছিল ওই ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা। সে অবস্থায় কেউ রিভলভারের ঘোড়া টিপতে পারে না। অবশ্য কালীবাবু নিজেই পট্টি খুলে ঘোড়া টিপতে পারতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পট্টির উপরে এক ফোঁটা রক্তের দাগও লাগত না এবং তিনি তা করেনওনি। তিনি যখন গুলিবিদ্ধ হন, তাঁর আঙুলের উপরে তখন পট্টি বাঁধা ছিল আর সেই জন্যেই পট্টির উপরে ছিল রক্তের ছোপ। সুতরাং হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে হত্যাকারীই যে পট্টিটা সরিয়ে ফেলেছিল, এতে আর কোনওই সন্দেহ নেই।'

নির্বাক ভূপেন মুখব্যাদান করে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন পরম বিস্ময়ে।

জয়ন্ত বললে, 'এই মামলায় দুটো সবচেয়ে প্রমাণ হচ্ছে রক্তাক্ত পট্টি আর 'রিবন'-হীন টাইপরাইটার। এই দুটো প্রমাণেই জানা যায়, ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হয়েছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাড়াতাড়িতে সে লক্ষ করতে পারেনি যে, পট্টির উপরে রক্তের ছোপ আছে। অন্য কোনও টাইপরাইটারে আগে থাকতেই সে স্বীকার-উক্তি 'টাইপ' করে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, কালীবাবুর মেশিনে সেখানা আটকাবার সময়ে কল্পনাও করতে পারেনি যে, তার মধ্যে নেই কালির ফিতে।'

ভূপেন চমৎকৃত, তখনও তার মুখে নেই রা।

জয়ন্ত বললে, 'এখন প্রশ্ন ওঠে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হতে পারে? ভূপেনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করে দেখেছেন, যে পত্রখানা কালীবাবুর তথাকথিত আত্মহত্যার হেতু, তার 'ট্রেডমার্ক'? খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, কালীবাবু নিজেও ওই একই 'ট্রেডমার্ক' মারা কাগজ ব্যবহার করেন। এই দেখে সন্দেহ হয়, পত্রপ্রেরক তাঁর বাড়িতে আনাগোনা করবার সুযোগ পায়। কিন্তু এ সন্দেহের বিশেষ মূল্য নেই, কারণ এরকম কাগজ বাজারে সুলভ, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে অপরিচিত যে-কোনও ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারে। অতএব অন্য উপায়ে আমাদের হত্যাকারীর সন্ধান করতে হবে। ভূপেনবাবু, আপনি আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন কি?'

ভূপেন ক্ষীণস্বরে শুধোলেন, 'কী?'

'ইজিচেয়ার আর তার উপরকার মৃতদেহের অবস্থান?'

—'হ্যাঁ। চেয়ার আর দেহ দুই-ই ছিল ঘরে ঢোকবার দরজার মুখোমুখি।'

—'ঘরে দরজা ছিল একটিমাত্র। তাহলে?'

—'কেউ যদি ঘরে ঢুকে থাকে, তবে তাকে কালীবাবুর সুমুখ দিয়েই ঢুকতে হয়েছিল।'

—'কেউ যদি কেন ভূপেনবাবু, কেউ নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকেছিল।'

—'আপনি কি বলতে চান, খুনি যখন ঘরে ঢোকে, কালীবাবু তাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

—'তাই তো বলতে চাই।'

—'অথচ কালীবাবু তাকে বাধা দেননি?'

—'না, কারণ সে ছিল তার পরিচিত। হ্যাঁ, অতি পরিচিত তাই সন্দেহের অতীত। কারণ খুনি যে ঘরে ঢুকেই সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলি ছোড়েনি, সে প্রমাণও আছে। কালীবাবুর ডান রগের উপরে রিভলভারের নলচে লাগিয়ে গুলি ছোড়া হয়েছিল, আমরা সকলেই তা জানি। সুতরাং বুঝতে হবে যে, খুনি যখন ঘরে ঢুকে কালীবাবুর খুব কাছে ডান পাশে এসে দাঁড়ায়, তখনও তিনি তাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারেননি, কেন না সে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এখন আন্দাজ করতে পারেন, কে এই ব্যক্তি?'

ভূপেন কতকটা তাড়ীভূতের মতো হয়ে পড়েছিলেন, এতক্ষণ পরে তাঁর দেহে মুখে ও চোখে জাগ্রত হল জীবনচাঞ্চল্য। উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, আলবাৎ আন্দাজ করতে পারি, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারি!'

—'কে সে?'

—'কালীবাবুর ভাইপো তারাপ্রসন্ন। আমি এখনই তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।'

জয়ন্ত স্মিতমুখে বললে, 'হ্যাঁ, সম্পত্তি থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়ে কালীবাবুর উপরে সে বিষম খাপ্পা হয়ে আছে বটে। এমন অবস্থায় অনেক খুনখারাপি হতে দেখা গিয়েছে। আপনার অনুমান অসঙ্গত নয়।'

—'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আমি আর সময় নষ্ট করি কেন? বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা।'

—'তিষ্ঠ ক্ষণকাল। আর একটু সবুর করলে ক্ষতি হবে না। আমার হাতে আরও কিছু কিছু প্রমাণ আছে।'

আট

ভূপেন বললে, 'যা বলবার বলে ফেলুন মশাই, আমার আর তর সইছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, তারাপ্রসন্নের উপরে সন্দেহ হবারই কথা। ওবাড়িতে তার আনাগোনা ছিল।

সে জুয়াড়ি, মদ্যপ, লম্পট, বেকার—তার মতো লোক সম্পত্তি হারিয়ে যে চণ্ডালে রাগের বশবর্তী হয়ে নরহত্যা করবে, এটা কিছুই অসম্ভব নয়।'

ভূপেন বললে, 'হায় হায়, গোড়া থেকেই তার উপরে আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, তাহলে এতক্ষণ তার হাতে আমি লোহার বালা পরিয়ে দিতে পারতুম!'

—'এইবারে আর একটা কথা ভেবে দেখুন ভূপেনবাবু। ঘটনার রাত্রের কথা স্মরণ করুন। ঘড়িতে এগারোটা বেজেছে। দরজার দিকে মুখ করে কালীবাবু ইজিচেয়ারের উপরে বসে আছেন। এমন সময়ে যে তারাপ্রসন্ন খানিক আগে মারমুখো হয়ে তাঁর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করে গেছে সে হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। আপনি যদি কালীবাবু হতেন, এ অবস্থায় পড়লে কী করতেন?'

—'উঠে তারাপ্রসন্নকে তেড়ে মারতে যেতুম, নয়তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতুম, নয়তো—'

—'থাক, ওতেই চলবে। কিন্তু কালীবাবু ওসব কিছুই করেননি। তিনি নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারের উপরেই বসে রইলেন, আর তারাপ্রসন্ন নির্বিবাদে সুমুখ দিয়ে সোজা তাঁর ডান পাশে এসে তাঁকে গুলি করে সরে পড়ল! এটা কি সম্ভবপর?'

—'উঁহু!'

—'তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে তারাপ্রসন্ন হত্যাকারী নয়।'

ভূপেন দস্তুরমতো মুষড়ে পড়ে বললেন, 'আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! এই টেনে তোলেন আকাশে, এই ঠেলে ফেলেন পাতালে!'

জয়ন্ত অবিচলিত ভাবে বললে, 'আপনি মহীতোষ সেনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

—'ভুলিনি, কারুকেই ভুলিনি। কিন্তু তার সঙ্গে এই খুনের কী সম্পর্ক?'

—'চিঠিতে সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা গোপন করেছে। কালীবাবু তাকে নিশ্চয়ই চিনতেন।'

—'ওরকম গোপনতার মানে হয় না। কালীবাবু বেঁচে থাকলে সে যে নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, এটাও ভুলবেন না যেন।'

—'হ্যাঁ, পরে সত্যই দেখা করতে সে এসেছিল হত্যার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু সে চিঠিখানা লিখেছিল অন্য উদ্দেশ্যে।'

—'কী উদ্দেশ্য?'

—'ওই চিঠির সঙ্গে কালীবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হবে, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন। দৈবগতিকে তদন্তে কেউ আসল ব্যাপার সন্দেহ করলেও, সে থাকবে নিরাপদে। কারণ, পত্রে তার হাতের লেখা বা ঠিকানা নেই।'

ভূপেন হতাশভাবে বললে, 'এ যে বিশ বাঁও জলের নীচে পড়লুম রে বাবা! যাকে জানি না, চিনি না, তাকে ধরব কেমন করে?'

ভূপেনের হাতে একখানা ফটো গুঁজে দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'বন্ধুদের সঙ্গে সদলবলে এই দেখুন মহীতোষকে। ডান দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তিই হচ্ছে আপনার আসামি। চিনতে পারেন?'

ছবির উপরে চোখ বুলিয়ে ভূপেন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'মোটেই না।'

জয়ন্ত আর একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, 'এর মধ্যে মহীতোষের মূর্তি 'এনলার্জ' করে দেখানো হয়েছে। ছোটো ছবিতে ওর মুখের খুঁটিনাটি ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। মহীতোষের দাড়িগোঁফ কামানো ছিল, কেবল আমি শখ করে তার নাকের তলায় ছোট্ট একজোড়া গোঁফ এঁকে দিয়েছি। এখন

বলুন তো মশায়, ওই গোঁফ, ওই জোড়া ভুরু, আর ডান গালের ওই আঁচিল আপনি এর আগে আর কোনও মুখে দেখেছেন কি না?'

ভূপেন দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে তুলে বললে, 'আরে এ যে মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি!'

—'তাহলে এবারে চিনতে পেরেছেন? উত্তম! হ্যাঁ, মতিলালই হচ্ছে খুনি এবং মহীতোষ সেন। নাম ভাঁড়িয়ে সে কালীবাবুর কাছে চাকরি নিয়েছিল। কালীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে তার যোগসাজস থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। তবে মাধবীদেবী যে তাঁর পূর্ব স্বামীকে চিনতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কালীবাবুকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হত অনেকদিন পূর্বেই, কিন্তু ছয় দিন আগে উইলে মাধবীকে জীবনস্বত্ব দিয়ে তিনি নিজের মৃত্যুকে ঘনিয়ে এনেছিলেন নিজেই। এখন আপনার কর্তব্য আপনি করুন ভূপেনবাবু, আপাতত বিদায়মাগে শখের গোয়েন্দারা।'

জয়ন্তর দুই হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভূপেন বললেন, 'স্বীকার করি, আপনি হচ্ছেন অতুলনীয়।'

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, 'কিছু না, কিছু না। সত্যই এটা নিতান্ত হালকা মামলা, নইলে এত সহজে কিনারা হত না। তবে ব্যান্ডেজ আর টাইপরাইটার নিয়ে ভ্রম না করলে মতিলালকে মহীতোষ বলে চিনতে পারলেও কেউ তার কিছুই করতে পারত না। সে ধরা পড়ল খালি সামান্য অসাবধানতার জন্যেই। চলে এসো মানিক, এখন ভূপেনবাবু যাবেন মহীতোষের খোঁজে।'

ভূত আর অদ্ভুত

বন্দি আত্মার কাহিনি

এক

বিখ্যাত 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' অনন্তবাবুর বাড়িতে বসে এক সন্ধ্যায় আলাপ করছিলুম।

কথা হচ্ছিল প্রেততত্ত্ব নিয়ে! আমি ডাক্তার। কিঞ্চিৎ পসারও যে আছে, নিজের মুখে একথা বললে গর্ব করা হবে না।

আত্মা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব আছে, আজ পর্যন্ত হাতে-নাতে এমন প্রমাণ পাইনি। জন্ম, মৃত্যু ও দেহগত সমস্ত রহস্য আমার নখদর্পণে, এমন অভিমান আমার আছে।

কিন্তু অনন্তবাবু আমার সেই অভিমানে আঘাত দিতে চান। তিনি বলেন, জন্ম ও মৃত্যু কথার কথা মাত্র, দেহটা সাময়িক খোলস ছাড়া আর কিছু না, জন্মের আগেও এবং মৃত্যুর পরেও আত্মা বেঁচে থাকে, ইত্যাদি।

খুব জোরে তর্ক চালিয়েছি। আমিও বুঝব না, অনন্তবাবুও না বুঝিয়ে ছাড়বেন না। তর্কটা যখন রীতিমতো জমে উঠেছে, হঠাৎ রাস্তায় উঠল বিষম গোলমাল। সচমকে মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি, পথের ওপাশের 'ফুটপাথে'র উপরে সুরেনবাবুর বাড়ির সামনে মস্ত ভিড়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম।

'ফুটপাথে'র উপরে হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন সুরেনবাবু নিজেই। তিনি কেবল আমাদের প্রতিবেশী নন, আমাদের দু-জনেরই বিশেষ বন্ধু।

ভিড়ের একজন লোক জিজ্ঞাসার উত্তরে বললে, 'উনি বারান্দার উপর থেকে পড়ে গিয়েছেন।'

আমরা ধরাধরি করে সুরেনবাবুকে নিয়ে তাঁর বাড়ির ভিতরে ঢুকলুম। তারপর বৈঠকখানায় তক্তাপোষের উপরে শুইয়ে রেখে তাঁকে পরীক্ষা করতে লাগলুম।

পরীক্ষার পর বুঝলুম গতিক সুবিধার নয়। সুরেনবাবুর দেহের উপরটায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু তাঁর দেহের ভিতরের অবস্থা যে ভয়াবহ, এটা অনুমান করতে পারলুম।

অনন্তবাবুকে বললুম 'এঁর মৃত্যুর আর দেরি নেই।'

অনন্তবাবু বললেন, 'কী সর্বনাশ, তাহলে উপায়? সুরেনের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাই যে হরিদ্বারে তীর্থ করতে গিয়েছে! বাড়িতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। এখন আমরা কী করব?'

বললুম, 'আমার পরীক্ষা ভুল হতে পারে। দাঁড়ান, ডাক্তার পি ঘোষকে ডাকি।'

ডাক্তার পি ঘোষ হচ্ছেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের অন্যতম। 'ফোনে' খবর পেয়েই এসে হাজির হলেন। সুরেনবাবুকে পরীক্ষা করে বললেন, 'কোনও আশা নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ইনি মারা পড়বেন।'

আমি বললুম, 'অনন্তবাবু, যদি আপনার ঠিকানা জানা থাকে, তবে সুরেনবাবুর স্ত্রীকে এখনই তারে খবর দিন।'

—ঠিকানাও জানি, তারও যেন করে দিচ্ছি। কিন্তু আপনারা বলছেন সুরেন এখনই মারা পড়বেন। হরিদ্বার এখান থেকে এক দিনের পথ নয়, সুরেনের আর-কোনও আত্মীয়ও নেই। সমস্ত ঝুঁকি আমাদেরই সামলাতে হবে তো? মৃতদেহ নিয়ে আমরা কী করব? মিঃ ঘোষ, দেখুন—আপনাদের চিকিৎসাবিজ্ঞান যদি এঁকে কোনওরকমে আর দিন-তিনেক বাঁচিয়ে রাখতে পারে।'

ডাক্তার ঘোষ মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এতক্ষণে মৃত্যু ওঁর দেহের ভিতরে প্রবেশ করেছে। উনি মারা পড়লেন বলে।'

অনন্তবাবু অত্যন্ত উত্তেজিতের মতো একবার ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে এলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'মৃত্যুর পরেও কি দেহের ভিতরে আত্মার সাড়া পাওয়া একেবারেই অসম্ভব?'

ডাক্তার ঘোষ সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি কী বলছেন!'

আমিও হতভম্বের মতন অনন্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা হিপনটিজ্‌ম-এর কথা জানেন তো? বাংলায় যাকে বলে সম্মোহন-বিদ্যা বা যোগনিদ্রা?'

আমি বললুম, 'জানি। আর এও জানি যে, 'হিপনটিজ্‌ম'-এ আপনার দেশজোড়া খ্যাতি আছে। কিন্তু তার কথা এখন কেন?'

—'আমি এখনই সুরেনকে সম্মোহন বিদ্যায় অভিভূত করতে চাই।'

—'তাতে ফল কী হবে? সুরেনবাবু কি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবেন?'

—'মৃত্যুর কবল থেকে কোনও মানুষই কোনও মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। তবে যোগনিদ্রার একটা আশ্চর্য মহিমা আছে। তার দ্বারা নিশ্চয়ই একটা কিছু ফল পাওয়া যাবে। সেটা যে কী, তা আমি বলতে পারছি না, তবে—না, থাক! আর কথার সময় নেই। সুরেনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ওঁর শেষ-মুহূর্ত উপস্থিত!'

দুই

সুরেনবাবুর মুখ তখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভীষণ হয়ে উঠেছে, তাঁর দুই বিস্ফারিত চোখের তারা চারিদিকে ঘুরছিল। অনন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সুরেনবাবুর দেহের উপরে বিশেষ কৌশলে হস্তচালনা করতে লাগলেন। ডাঃ ঘোষ গম্ভীর ভাবে বসে রইলেন। তাঁর মুখেচোখে দারুণ অবিশ্বাসের ভাব।

আমি অবাক হয়ে অনন্তবাবুর কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলুম।

কয়েক মুহূর্ত পরে তেমনি হস্তচালনা করতে-করতেই অনন্তবাবু দৃঢ়স্বরে বারংবার ডাকতে লাগলেন, 'সুরেন! সুরেন! সুরেন!'

প্রথমটা সুরেনবাবুর কোনওরকম ভাবান্তরই হল না। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর চোখের তারা স্থির ও স্বাভাবিক হয়ে এল।

অনন্তবাবু বললেন, 'সুরেন, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো!'

সুরেনবাবুর চোখ অনন্তবাবুর চোখের দিকে ফিরল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা দেহ একবার শিউরে উঠল।

—'সুরেন!'

স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব হল, 'কী?'

—'তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?'

—'না।'

—'তবে?'

জবাব নেই। আবার তিন-চারবার ডাকাডাকির পর সুরেনবাবু চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁঃ?'

—'তুমি কি ঘুমুচ্ছ?'

—'হ্যাঁ। আর আমায় ডেকো না, আমাকে ঘুমুতে ঘুমুতে মরতে দাও।'

—'তবে তুমি ঘুমোও। কাল সকালে আবার আমি তোমাকে ডাকব। তোমাকে সাড়া দিতেই হবে।'

—'সাড়া দেব। এখন আমি মরছি। আমাকে ঘুমুতে দাও।' সুরেনবাবুর দুই চোখ মুদে গেল।

* * *

অনন্তবাবু আমাদের কাছে এসে বললেন, 'আপনাদের মত কী?

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'আপনি কি ভাবছেন, কাল সকালে ওঁর সাড়া পাওয়া যাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'অসম্ভব! তাহলে আমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

—'বেশ, কাল সকালে এসে দেখবেন।'

—'আসব। যদিও জানি অসম্ভব সম্ভব হবে না, তবু আপনি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন। কাল সকালে আমি আসছি।'

তিন

পরদিনের সকাল। বহুকাল ধরে প্রেততত্ত্ব নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে করে গোঁড়ামির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অনন্তবাবু বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন,—এই কথা বলাবলি করতে করতে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে আমি সুরেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম! দেখলুম বৈঠকখানার সমস্ত জানলা বন্ধ করে আধা-অন্ধকার ঘরে সুরেনবাবুর দেহের পাশে অনন্তবাবু চুপ করে বসে আছেন।

ডাক্তার ঘোষ সুরেনবাবুর দেহ পরীক্ষা করে বললেন, 'দেহ শীতল আর আড়ষ্ট। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। কাল রাত্রেই এঁর মৃত্যু হয়েছে। অনন্তবাবু, এখনও কি আপনার সন্দেহ দূর হয়নি?'

অনন্তবাবু উত্তর দিলেন না।

সুরেনবাবুর গায়ের রং রীতিমতো হলদেটে হয়ে গেছে। তাঁর দুই চোখ মোদা। মুখ হাঁ করা।

আমি বললুম, 'আর কেন অনন্তবাবু, এইবারে এঁর সৎকারের ব্যবস্থা করুন।'

—'হরিদ্বারে তার করে দিয়েছি! আগে সুরেনের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা আসুক।'

—'সে কী! ততক্ষণে দেহের কী অবস্থা হবে, বুঝতে পারছেন?'

—'দেহের কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছি না। তবে সুরেনকে আর-একবার ডেকে দেখা দরকার।'

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আর কাকে ডাকবেন?'

—'সুরেনকে। ......সুরেন, সুরেন!'

কোনও সাড়া নেই।

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'কী আশ্চর্য! মড়া কখনও কথা কয়?

—'সুরেন, সুরেন! আমি ডাকছি। সুরেন, সাড়া দাও!'

স্তম্ভিতনেত্রে দেখলুম, সুরেনবাবুর ফাঁক-করা ওষ্ঠাধরের ওপাশে জিভখানা করছে যেন ছটফট, ছটফট!

—'সুরেন, সুরেন!'

সুরেনবাবুর চোয়াল ও ওষ্ঠাধর একটুও নড়ল না, কিন্তু তাঁর হাঁ করা মুখবিবর থেকে অদ্ভুত বিকৃত স্বরে এই কথাগুলো বেরুল—'আঃ! আবার কেন? আমার মৃত্যু হয়েছে! আমি এখন ঘুমুচ্ছি!'

সে কী স্বর! মনে হল সুরেনবাবুর মুখ যেন কথা কইছে না, সে স্বর আসছে যেন বহুদূর থেকে—যেন গভীর কোনও গিরিগুহার অতলতার ভিতর থেকে!

একটা অজানা ভয়ে আমার গা কাঁপতে লাগল। ডাক্তার ঘোষ যেন ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালেন—তাঁর মুখ-চোখ উদ্ভ্রান্তের মতো!

—'সুরেন, তুমি কি এখনও ঘুমিয়ে আছ?'

—'না, না, আমি ঘুমোচ্ছিলুম বটে! কিন্তু এখন আমার মৃত্যু হয়েছে।'

—'সুরেন, আবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। ......ডাক্তার ঘোষ, এখন আপনার কোনও বক্তব্য আছে?'

ডাক্তার ঘোষ ক্ষীণস্বরে বললেন, 'না।'

—'সুরেনবাবুর কণ্ঠস্বর কীরকম মনে হল?'

—'ভয়ানক! মানুষের গলার ভিতর থেকে যে ওরকম বীভৎস আওয়াজ বেরুতে পারে, এটা ধারণারও অতীত। ও তো মানুষের কণ্ঠস্বর নয়—যেন একটা অমানুষিক ধ্বনি মাত্র!'

—'কিন্তু ও ধ্বনি আসছে সুরেনেরই গলার ভিতর থেকে। সুরেনকে আর ব্যস্ত করব না, ও এখন ঘুমিয়েই থাক। বোধ হয় পরশুদিনই সুরেনের স্ত্রী এসে পড়বেন, তখন আর-একবার আপনাকে ডাকব, আসবেন তো?'

—'নিশ্চয়ই আসব! এ যে এক অজানা নতুন বিজ্ঞানের রহস্য! না এসে থাকতে পারব না।'

চার

আজ অনন্তবাবুর আহ্বানে আবার সুরেনবাবুর বাড়িতে চলেছি আমরা দু-জনে। সন্তানদের নিয়ে সুরেনবাবুর স্ত্রী কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর নাম হৈমবতী।

ক্রন্দনধ্বনি শুনতে শুনতে সুরেনবাবুর বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। সুরেনবাবুর আড়ষ্ট দেহ ঘিরে বসে আছেন হৈমবতী। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। সকলেরই চক্ষে অশ্রু, কণ্ঠে আর্তনাদ।

অনন্তবাবু বসে আছেন মৃতদেহের ডান পাশে। মুদিত চোখে তিনি মূর্তির মতন স্থির—যেন ধ্যানমগ্ন।

সুরেনবাবুর দেহ যেমন ভাবে দেখে গিয়েছিলাম তেমনি ভাবেই আছে। হৈমবতী গতকল্য এসেছেন। হিসাব করে দেখলাম, সুরেনবাবুর মৃত্যুর পর পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে। একে গ্রীষ্মকাল, তায় এ বছর পড়েছে আবার অতিরিক্ত গরম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সুরেনবাবুর পায়ের রং হলদে এবং দেহ মৃত্যুশীতল ও কাঠ-আড়ষ্ট হয়ে গেলেও তা একটু পচেনি বা ফুলে ওঠেনি।

অনন্তবাবু চোখ খুলে বললে, 'এই যে, আপনারা এসেছেন! হৈম বড়োই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাহলে সুরেনকে আর-একবার জাগাবার চেষ্টা করি?'

আমরা নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। যদিও আমার বুকের ভিতরে জাগল কাঁপন।

মৃতদেহের উপরে খানিকক্ষণ হস্তচালনা করে অনন্তবাবু ডাকলেন, 'সুরেন! সুরেন! সুরেন!'

প্রায় দশ-বারো বার নাম ধরে ডাকার পর মৃতদেহের আড়ষ্ট, হাঁ করা মুখের ভিতরে জিভখানা হয়ে উঠল আবার সেইরকম ভয়াবহ রূপে চঞ্চল!

হৈমবতী স্বামীর বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রন্দনস্বরে বলে উঠলেন, 'ওগো, তাহলে তুমি সত্যিই বেঁচে আছ?'

ছেলেমেয়েরাও 'বাবা, বাবা' বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

অনন্তবাবু বললেন, 'কথা কও সুরেন, কথা কও!'

আবার শোনা গেল সেই বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর—যা আসছে যেন বাড়ির বাহিরে পৃথিবীর অতল পাতালের ভিতর থেকে—

—'আঃ, আবার কেন ডাকাডাকি? বলেছি তো, আমি বেঁচে নেই!'

হৈমবতী বললেন, 'ওগো, এই তো তুমি বেঁচে আছ—এই তো তুমি কথা কইছ! একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দ্যাখো—আমরা সবাই এসেছি।'

অনন্তবাবু বললেন, 'হৈম, স্থির হও—শান্ত হও। সুরেন এখন আমি ছাড়া আর কারুর কথার জবাব দেবে না।......সুরেন, হৈম তোমাকে ডাকছে।'

মৃতদেহ বললে, 'ডেকে লাভ নেই। আমার মৃত্যু হয়েছে।'

—'তোমার যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে তুমি কথা কইছ কেমন করে?'

—'আমি এখন আমার মৃতদেহের ভিতরে বন্দি হয়ে আছি।'

—'বন্দি! কেন?'

—'তুমি যেতে দিচ্ছ না বলে।'

অনন্তবাবু এতক্ষণ সমানে হস্তচালনা করছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি যে তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল ভাবে নিযুক্ত করেছেন, সেটা বোঝা যায় তাঁর চেহারা দেখে। তাঁর কপালের উপরে শিরাগুলো এবং কণ্ঠের উপরে মাংসপেশিগুলো দ্বিগুণ ফুলে এবং মুখের রং টকটকে হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ তিনি হস্তচালনা বন্ধ করে খানিকক্ষণ নীরবে অত্যন্ত হাঁপাতে লাগলেন। তারপর ফিরে বললেন, 'হৈম, আর কেন? তোমার জন্যেই এই কদিন সুরেনকে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছি। এইবার ওর ঘুম ভাঙাই, ওর আত্মাকে মুক্তি দিই তোমরা মৃতদেহের সংকারের ব্যবস্থা করো।'

হৈমবতী এমন তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন যে, আমাদের কান যেন ফেটে গেল। তারপর তিনি মাটির উপরে আছড়ে পড়ে বললেন, 'অনন্তবাবু, অনন্তবাবু, আমাকে দয়া করুন! উনি এ অবস্থাতে থাকলেও আমার সুখ! মনে করব আমি বিধবা নই।'

অনন্তবাবুর মুখে ফুটে উঠল একসঙ্গে ব্যথা, দয়া ও মমতার ভাব। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'বেশ মা, তাই হোক। আরও কিছুদিন এইভাবে যাক। তুমি নিজের মনকে দৃঢ় করো, শান্ত হও—সংযত হও। তারপর আমার যা করবার করব। মনে রেখো মা, আমি হচ্ছি তুচ্ছ মানুষ। মৃত্যু হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা, তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আমারও সর্বনাশ হবে, আমিও বাঁচব না!'

অনন্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ আমরা ছিলুম দুঃস্বপ্নে অভিভূতের মতো। অনন্তবাবু উঠে দাঁড়াতেই সাড় হল আমাদের।

ডাক্তার ঘোষ বলিলেন, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না—আমার প্রাণ-মন হাঁপিয়ে উঠেছে।'

আমি বললুম, 'আমারও। এখন বাইরে বেরুতে পারলেই বাঁচি!'

অনন্তবাবুও হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমারও ওই ইচ্ছা। চলুন, আমরা বাড়ি যাই।'

পাঁচ

তারপর কেটে গেছে দুই মাস। সুরেনবাবুর দেহ এখনও পড়ে আছে বৈঠকখানার তক্তাপোষে। তাতে এখনও পচ ধরেনি।

ইতিমধ্যে এই অদ্ভুত খবর শুনে দলে দলে বাইরের লোক এবং খবরের কাগজের সংবাদদাতারা সুরেনবাবুর বাড়িতে আনাগোনা শুরু করে দিয়েছিল। অনন্তবাবু খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন, বাইরের লোকেরা আর ভিতরে ঢুকতে পায় না। কিন্তু খবরটা রটে গিয়েছিল দিকে দিকে। চারিদিকে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কেবল বাঙালি নয়, ইংরেজ এবং আরও নানাজাতীয় লোকও কৌতূহলী হয়ে আবেদন জানাচ্ছেন, সুরেনবাবুর দেহ পরিদর্শনের জন্যে। আবেদনকারীদের মধ্যে ছিল বহু বিখ্যাত নাম।

* * *

একদিন অনন্তবাবুর জরুরি আহ্বান এল। তাঁর বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনলুম সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ির ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ। অনন্তবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, একখানা চেয়ারের উপরে বসে আছেন ডাক্তার ঘোষ। অনন্তবাবু ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর ভাবভঙ্গি ক্রুদ্ধ, বিরক্ত।

আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'কান্না শুনছেন?'

—'হাঁ, ব্যাপার কী?'

—'আজ সুরেনের যোগনিদ্রা ভাঙব তাই ওই কান্না। হৈমবতীর ইচ্ছা, সুরেনের দেহ ওই ভাবেই থাকুক। কিন্তু তাও কি সম্ভব? আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার নিজের স্বাস্থ্য দিনে দিনে ভেঙে পড়ছে—এরকম অস্বাভাবিক উত্তেজনা আর কতদিন সহ্য হয়? প্রথম ইচ্ছাশক্তিরও সীমা আছে?'

—'এইজন্যেই আমাকে ডেকেছেন?'

—'আপনাকেও, ডাক্তার ঘোষকেও। তারপর আর-একটা কী কথা জানেন? নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।'

—'কেন?'

—'বোধহয় প্রকৃতির আইনভঙ্গ করছি। ভগবান সুরেনের আত্মাকে যে-অদৃশ্য পথে নিয়ে যেতে চান, আমি হয়েছি তার বাধার মতো। এ এক মস্ত অপরাধ, এজন্যে হয়তো আমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হবে। হয়তো একটা প্রাণহীন কুৎসিত দেহের কারাগারে বন্দি হয়ে সুরেনের আত্মাও অত্যন্ত কষ্টভোগ করছে। না, আর নয়। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছি, এ ব্যাপারের উপরে আজকেই যবনিকা ফেলে দেব—কারুর মিনতি, কারুর অশ্রু আর আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আসুন আপনারা। গোড়া থেকেই যখন সঙ্গে আছেন, তখন শেষ দৃশ্যটাও দেখুন।'

ছয়

শেষ পর্যন্ত হৈমবতীকেও সম্মতি দিতে হল।

অনন্তবাবু অনেক চেষ্টার পর তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই মৃতদেহের মধ্যে সুরেনবাবুর আত্মা বন্দি হয়ে আছে অভিশপ্তের মতো, দেহ থেকে বেরুতে না পারলে আত্মার গতি হবে না।

অনন্তবাবু দেহের পাশে বসে হস্তচালনা করতে করতে ডাকলেন, 'সুরেন, সুরেন, সুরেন!'

আমরা রোমাঞ্চিত দেহে বিস্ফারিত চক্ষে রুদ্ধ শ্বাসে দেহের দিকে তাকিয়ে রইলুম। সাত-আট

মিনিট কেটে গেল, দেহ নিসাড়—নিস্পন্দ। অনন্তবাবুর কপাল থেকে দর দর ধারে ঘাম ঝরতে লাগল।

—'সুরেন, সুরেন! জাগো, সাড়া দাও। আমি ডাকছি, সুরেন!'

আরও সাত-আট মিনিট কাটল।

অনন্তবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'তবে কি আমি ব্যর্থ হব? সুরেনের আত্মা কি এখানে নেই? না, না, তা তো হতে পারে না! যোগনিদ্রার প্রভাব না থাকলে দেহের অবস্থা হত যে অন্যরকম। ...সুরেন, সুরেন, জাগো—তোমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হোক!

এইবারে উন্মুক্ত দন্ত-কণ্ঠকিত মুখ-বিবরের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে ছটফট করতে লাগল জিহ্বাখানা!

—'সুরেন!'

উত্তরে শোনা গেল এক ভীষণ ও তীক্ষ্ণ আর্তধ্বনি। সে আর্তনাদ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, মানুষের কান কোনওদিন শোনেনি তেমন আর্তনাদ! ছেলে-মেয়েরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল, হৈমবতী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। আমাদেরও অবস্থা শোচনীয়!

—'সুরেন, শান্ত হও ভাই, শান্ত হও।'

—'শান্ত হব? তোমরা জানো না এই দেহের নরকে কী দুঃসহ যন্ত্রণা? নিশিদিন কাঁদছি আর ছটফট করছি—মৃত্যুর পরেও এ কী শাস্তি? আর কেন? আমাকে মুক্তি দাও—মুক্তি দাও!' আজকের স্বর আরও বিকট ও ভয়াল এবং আসছে যেন আরও—আরও—আরও বেশি দূর থেকে।

অনন্তবাবু বললেন, 'তোমাকে মুক্তি দিলুম। সুরেন, ভেঙে যাক তোমার যোগনিদ্রা।'

পরমুহূর্তে অদ্ভুত একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্নের মতো দেখলুম, তক্তাপোষের উপরে পড়ে রয়েছে সুরেনবাবুর দেহের বদলে একটা নরকঙ্কাল এবং তার চারিদিক দিয়ে গড়াচ্ছে বিগলিত মাংস মেদ মজ্জার তরল, বিবর্ণ ধারা। বিষম পূতিগন্ধে ঘরের বদ্ধ বাতাস বিষাক্ত।

......সভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে বাইরে পালিয়ে এলুম।

ছায়া, না কায়া?

বেশিদিনের কথা নয়। এই গেল শ্রাবণ মাসের এগারোই তারিখ।

পূর্ণিমার রাত। দশটার সময়ে শয্যা নিয়েছি, এখন বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু চোখে আর ঘুম আসে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। সামনেই গঙ্গা, চাঁদের আলো তাকে যেন রুপো দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। ভাবলুম, খানিকটা বেড়িয়ে এলে হয়তো অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তিলাভ করব।

বেরিয়ে পড়লুম। একদিকে চির-জাগন্ত গঙ্গা, আর এক দিকে ঘুমন্ত বাড়ির সারি, মাঝখানে পথিকহীন পথ। কোনও ঘাটে বিকটকণ্ঠ গায়করা পর্যন্ত পাড়া কাঁপানো চিৎকার করছে না। এই চমৎকার নির্জনতাটুকু উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চললুম।

কলকাতা শহরে গঙ্গার ধারে বেড়াবার আসল সময় হচ্ছে এই। এখন থেমেথুমে গেছে যত বাজে গোলমাল,—আকাশ আর বাতাস, কান আর প্রাণ ভরে জেগে আছে শুধু গঙ্গার জলতরঙ্গে হিমালয়ের গম্ভীর বাণী। কত কোটি কোটি যুগ আগে জন্ম হয়েছে এই পবিত্র বাণীর, কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না। একে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারেনি অনন্ত সমুদ্রও।

মস্তবড়ো একটা বটগাছ অনেকখানি জায়গা জুড়ে আবছা অন্ধকার সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই মধ্যে এখানে ওখানে দপদপ করছে চার-পাঁচটে জোনাকি, কে যেন আগুনের ফিনকি নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে!

জায়গাটি ভালো লাগল। বটের ছায়ার তলায় নিদ্রিত ঘাটের কোলে এসে ছলাৎ ছলাৎ করে বেজে উঠছে গঙ্গাজল,—ছোটো ছোটো ঢেউ-শিশুরা যেন কৌতুকহাস্যধ্বনি তুলে পাষাণের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে।

সেইখানেই বসে পড়লুম। গঙ্গা জুড়ে রুপোলি আলোর কারিকুরি দেখতে দেখতে নিজেরই অজান্তে কখন গুনগুন করে গান শুরু করে দিলুম।

হঠাৎ লজ্জিত হয়ে গান থামিয়ে ফেললুম। লজ্জার কারণ আছে। দৃঢ় পণ করে গঙ্গার ধারে যারা নিয়মিত ভাবে বেসুরো গান গেয়ে লোক জ্বালাতে আসে, আমি তাদের দু-চক্ষে দেখতে পারি না। অথচ আজ আমি নিজেই গঙ্গার ধারে বসে গান গাইবার চেষ্টা করছি।

গান থামিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে চাঁদের আলোয় ধোওয়া ওপারের অস্পষ্ট গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ওখানে একটা আগুন জ্বলছে, বোধ হয় চিতার আগুন। স্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে মেয়ে-গলার একটা কান্নার শব্দও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

এমন সুন্দর রাত্রে মৃত্যুর স্মৃতি ভালো লাগল না।

আচমকা আমাকে চমকে দিয়ে গাছের উপর থেকে ডেকে উঠল একটা বাচ্ছা প্যাঁচা। ঠিক যেন ভূতুড়ে শিশুর কান্না!

ভয়ের কারণ ছিল না, আমি ভিতু মানুষও নই। তবু কেন জানি না, বুকের কাছটা কেমন ছ্যাঁৎছ্যাঁৎ করতে লাগল।

অকারণেই মনে হল, প্যাঁচার বাচ্ছাটা অকারণে কাঁদছে না। সে নিশ্চয় ভয় পেয়েছে। কিন্তু কীসের ভয়?

তারপরেই অনুভব করলুম, এখানে আমি যেন আর একলা নই। যেন কার হিংসকুটে চোখের তীক্ষ্ণ, উত্তপ্ত দৃষ্টি আমার পিঠের উপরে এসে বিঁধছে বার বার।

নিজের অমূলক ভয়কে হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইলুম। কিন্তু ভয় গেল না।

হঠাৎ শুনলুম পিছনে কে বিড় বিড় করে কথা কইছে!

তাড়াতাড়ি ফিরে দেখি বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। যেন স্থির পাথরের মূর্তি।

মাথায় এলোমেলো ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল; চোখ দুটো বিস্ফারিত নিস্পলক; বিষম লম্বা নাকটা বড়শির মতন বাঁকানো; অস্থিচর্মসার দীর্ঘ দেহ; রং কুচকুচে কালো; আদুর গা, খালি পা, কাপড় হাঁটু পর্যন্ত। ভদ্রলোক নয়।

তখন খেয়ালে আনিনি, কিন্তু পরে ভেবে বুঝেছিলুম, লোকটা দাঁড়িয়েছিল ঝুপসি বটগাছের তলার প্রায়-অন্ধকারে, তবু বিশ-পঁচিশ হাত দূর থেকেও আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলুম তার চোখ নাক মুখ—এমনকি হাত পায়ের নখ পর্যন্ত!

চেঁচিয়ে বললুম 'কে হে তুমি?'

লোকটা জবাব দিল না, একটুও নড়ল না, আপন মনেই বিড় বিড় করে বকতে লাগল।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী হে, এত রাতে এখানে কী করছ?'

জবাব নেই। কিন্তু বিড় বিড় করে বকুনি থামল না।

নিশ্চয় পাগল, নইলে বিড় বিড় করে বকে কেন?

তাকে নিয়ে আর মাথা ঘামানো দরকার মনে করলুম না।

প্যাঁচার বাচ্ছাটা তখনও সমান চিৎকার করে মৌন রাত্রিকে বীভৎস করে তুলছিল। তার এ চ্যাঁচামেচির মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন ডালে তার বাসা? গাছের চারিদিকে চোখ বুলিয়েও আবিষ্কার করতে পারলুম না।

মনে এল বিরক্তি। নাঃ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কোথাও নেই। চাঁদের আলোয় গঙ্গার ধারে এলুম, নিরালায় বসে একটু রূপের স্বপন দেখব বলে। কিন্তু স্বপ্ন আমার ভেঙে দিলে ওপারের ওই জ্বলন্ত চিতা আর শোকার্ত নারীর আর্তনাদ এবং এপারের ওই প্যাঁচার কান্না—আর পাগলের বিড় বিড় বকুনি!

দরকার নেই আর কবিত্বে, আবার বাড়িতে ফিরে যাওয়া যাক।

উঠে দাঁড়ালুম। একবার গাছতলার দিকে তাকালুম। পাগলটা সেখানে নেই। কিন্তু তার বিড় বিড় বকুনি তখনও শোনা যাচ্ছে!

সে কথা কয় কোথা থেকে? এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল গাছের উপর দিকে।

একটা মোটা ডালের দুইদিকে দুই পা ঝুলিয়ে বসে পাগলটা নিজের গলায় পরেছে একটা দড়ির ফাঁস, বিড় বিড় করে বকতে বকতে!

কী সর্বনাশ! তবে কি ও পাগল নয়? ওকি এখানে এসেছে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে?

না, না, লোকটা পাগলই বটে। নইলে আমার সামনেই আত্মহত্যা করতে চায়? অন্তত উপস্থিত মুহূর্তে পাগলামির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ওর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে!

চিৎকার করে বললুম, ওহে, করো কী—করো কী! শিগগির গলার দড়ি খোলো, গাছ থেকে নেমে পড়ো!

লোকটা ফিরেও তাকালে না, কিন্তু হা হা হা করে হেসে উঠল!

কী ভয়ানক অট্টহাসি, প্যাঁচার বাচ্ছাটা পর্যন্ত ভয়ে চুপ মেরে গেল! কানের কাছেই শুনছি বটে, কিন্তু আমার মনে হল যেন, ও হাসি যে হাসছে সে আছে অনেক—অনেক—অনেক দূরে! ও যেন পৃথিবীর হাসি নয়!

পরমুহূর্তেই আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, লোকটা ঝুপ করে নীচে লাফিয়ে পড়ে দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে হাত-পা ছুড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে লক্ষ করলুম, তার দুটো পাকানো কপালে ওঠা চোখ জ্বলছে ফসফরাসের মতো!

দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলুম মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিস্পন্দ হয়ে। চোখের সামনে এমন আত্মহত্যার চেষ্টা দেখে কে না স্তম্ভিত হয়? তার জিভখানা মুখের বাইরে বেরিয়ে পড়ে লকলক করে ঝুলছে, আর তার পা দুটো ক্রমাগত করছে শূন্যকে পদাঘাত!

তারপরেই হুঁশ হল। তার দেহটা ঝুলছিল মাটি থেকে মাত্র তিন হাত উপরে। দ্রুতপদে দৌড়ে গিয়ে দুইহাত দিয়ে তার দেহটাকে উপর দিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করলুম—সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তার দু'খানা দীর্ঘ কঙ্কালসার পা দিয়ে আমার বুক-পিঠ জড়িয়ে ধরে শক্ত বাঁধনে বেঁধে ফেললে—

...এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার নাকে এল একটা অত্যন্ত পচা ও বসা মড়ার ভয়াবহ দুর্গন্ধ!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'ছাড়ো, ছাড়ো—আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই—এমন করে চেপে ধরলে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না!'

সে হি হি করে হাসতে ও হেঁচকি তুলতে লাগল! গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে কেউ কখনও হাসতে পারে? মনে হতেই আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিলে!

অনুভব করলুম, যে দেহের স্পর্শ আমি পাচ্ছি সেটা অস্বাভাবিক রকম ঠান্ডা! এ জ্যান্ত মানুষের দেহ নয়!

মনের ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের মতন খেলে গেল একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত!

এদিকে পায়ের বাঁধন ক্রমেই ভীষণ হয়ে উঠছে, আমার বুক-পিঠের হাড়গুলো এইবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে!

প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলুম, বাঁচাও! বাঁচাও! কে কোথায় আছ, বাঁচাও!

পায়ের চাপ আরও বাড়তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবন্ত মৃতদেহটা হাসতে ও হেঁচকি তুলতে লাগল ক্রমাগত!

আবার চ্যাঁচালুম, বাঁচাও! আমাকে মেরে ফেললে, বাঁচাও! দেখতে দেখতে পায়ের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে এল—দুই হাত দিয়ে টেনে সেই সাংঘাতিক পায়ের বাঁধন খোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা!......

অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনলুম—শব্দ কাছে এসে পড়ল।

কে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে, কী হয়েছে? অমন চিৎকার করছেন কেন?'

পা দুটো তখনও আমাকে ছাড়েনি। হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে বললুম, এই লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দেওয়াতে পা দিয়ে চেপে ধরে আমাকে মারবার চেষ্টা করছে।—আমাকে বাঁচাও!

বিস্মিত প্রশ্ন শুনলুম, কই, কে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে? কে আপনাকে মারবার চেষ্টা করছে? কেউ তো এখানে নেই!

দুই হাত দিয়ে সেই পচা মাংসের দুর্গন্ধ ভরা পা দু-খানা টানতে টানতে রুদ্ধশ্বাসে বললুম, দেখতে পাচ্ছ না? এই দ্যাখো—এই দ্যাখো—এই দ্যাখো!

হঠাৎ পা-দুটো আমাকে ছেড়ে দিলে—আমি এলিয়ে ধপাস করে মাটির উপরে পড়ে গেলুম।......

একটি লোক 'টর্চ' টিপে গাছের এদিকে-ওদিকে আলো ফেলে বললে, চেয়ে দেখুন, কেউ কোথাও নেই! মাসখানেক আগে একটা লোক এই গাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল বটে, কিন্তু আজ আবার কে এখানে মরতে আসবে? আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি? স্বপ্ন দেখছিলেন?

পাছে ওরা আমায় পাগল ভাবে সেই ভয়ে বললুম, তাই হবে!

জীবন্ত মৃত্যু

মাস-কয় আগে বাংলা দেশের সব সংবাদপত্রেই এই খবরটি বেরিয়েছিল :

কলিকাতার নিকটবর্তী কোনও গ্রামের শ্মশানপ্রান্ত দিয়ে যেতে যেতে পুলিশের এক কর্মচারী সবিস্ময়ে দেখলেন, শ্মশানের এক চিতার উপরে কয়েকজন শবদাহকারী দমাদম লাঠির আঘাত করছে।

কৌতূহলী পুলিশ কর্মচারী কাছে ছুটে গিয়ে শুনলেন, একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করবামাত্র সে জ্যান্ত হয়ে চিতার উপরে উঠে বসেছে এবং তাই মড়াকে দানোয় পেয়েছে বলে লাঠির বাড়ি মারা হচ্ছে।

পুলিশ ভূত মানে না, কারণ আইন ভূতকে অস্বীকার করে। পুলিশ কর্মচারী স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করে আহত অবস্থায় কলকাতার মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে সে কয়েকদিন বেঁচে ছিল। তারপর রোগ ও মৃত্যুকে একেবারে ফাঁকি দিয়ে, জ্বলন্ত চিতাকেও এড়িয়ে অভাগী শেষটা আবার মারা পড়ল নির্বোধ মানুষেরই লাঠির আঘাতে।

যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, এরকম ঘটনা অসাধারণ হলেও অনেকবার ঘটেছে। এদেশে মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরেই শব পুড়িয়ে ফেলা বা কবর দেওয়া হয় বলেই এরকম ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। কারণ শ্বাস রুদ্ধ হওয়াই সব সময়ে মৃত্যুর প্রধান লক্ষণ নয়, মানুষের শ্বাস অস্থায়ী ভাবেও রুদ্ধ হতে পারে। এর একাধিক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে পাশ্চাত্য দেশে—মৃত্যুর কয়েকদিন পরে যেখানে শবকে কবরে রাখা হয়। বিশ্ববিখ্যাত লেখক এডগার অ্যালেন পো এ সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন, আমরা এখানে তিনটি তুলে দিলুম।

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে এমন এক সত্য ঘটনা ঘটে, যা উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য।

ভিক্টোরাইন লাফোর্কেড কেবল সুন্দরী নয়, নামজাদা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তাকে বিবাহ করবার জন্যে সবাই লালায়িত।

জুলিয়েন হচ্ছে সাহিত্যিক। সে-ও সেই মেয়েটিকে বউ করতে চায় এবং লাফোর্কেডও তাকে পছন্দ করে। কিন্তু ধনী ও কুলিন নয় বলে শেষ পর্যন্ত জুলিয়নের সঙ্গে তার বিবাহ হল না।

রেনেল নামে এক ধনবান লোকের সঙ্গে সুন্দরী লাফোর্কেডের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ে সুখের হল না। রেনেল বউয়ের দিকে ফিরেও চাইত না এবং তাকে নানানরকম যন্ত্রণাও দিতে শুরু করলে।

চার বছর পরে লাফোর্কেডের অসুখ হল এবং সে মারা পড়ল। যে গ্রামে সে জন্মেছিল তার দেহ সেইখানে নিয়ে গিয়ে কবরস্থ করা হল।

জুলিয়েনও তার মৃত্যুর সংবাদ পেলে। সে তখনও মনে মনে লাফোর্কেডকে ভালোবাসত, কাজেই শোকে পাগলের মতো হয়ে উঠল। স্থির করলে, যেমন করে হোক লাফোর্কেডের একটা কোনও স্মৃতিচিহ্ন সে সংগ্রহ করবেই! অন্তত তার মাথা থেকে কেটে নেওয়া একগুছি চুল।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে এক রাত্রে সে লুকিয়ে গোরস্থানের ভিতর গিয়ে ঢুকল এবং লাফোর্কেডের কবর খুঁড়ে কফিনের ডালা খুলে ফেললে!

নিঝুম রাত। অন্ধকারের বুক ছ্যাঁদা করে জুলিয়েনের লণ্ঠনের আলো শবদেহের মুখের উপরে গিয়ে পড়বামাত্র মড়া ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালে!

এতদিন পরেও নিশ্চয় করে বলা যায় যে, সেই দৃশ্য দেখে জুলিয়েনের সর্বাঙ্গ দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল! কেবল লাফোর্কেডকে অত্যন্ত ভালোবাসত বলেই সে পালিয়ে যেতে পারলে না!

আসল কথা একটু পরেই বোঝা গেল। লাফোর্কেড মরেনি। তার নিশ্বাস পড়ছে না দেখেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

জুলিয়েন তখন লাফোর্কেডের প্রায় অচেতন দেহ কফিন থেকে তুলে নিয়ে গেল। তারপর গোপনে চিকিৎসা ও সেবা করে তাকে আবার সুস্থ সবল করে তুললে। তারপর দু-জনে পালিয়ে গেল আমেরিকায়।

সেইখানেই দীর্ঘ বিশ বছর কেটে গেল।

জুলিয়েন ও লাফোর্কেডের চেহারা গেছে বদলে। দু-জনেই আন্দাজ করলে, এতদিন পরে দেশে ফিরে গেলে আর কেউ তাদের চিনতে পারবে না!

তারা ফ্রান্সে ফিরে এল এবং দৈবগতিকে রেনেলের সঙ্গে লাফোর্কেডের একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। রেনেল তখনই তাকে চিনতে পারলে! সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল বটে, কিন্তু লাফোর্কেডকে নিজের বউ বলে দাবি করতে ছাড়লে না।

কিন্তু লাফোর্কেড আর সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারী স্বামীর কাছে ফিরে যেতে রাজি হল না।

রেনেল করলে নালিশ। আদালতেই এই অদ্ভুত ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে।

বিচারক রায় দিলেন, আইন যাকে মৃত বলে মেনে নিয়েছে, এতদিন পরে তার উপরে স্বামী বলে রেনেলের কোনও দাবিদাওয়া থাকতে পারে না।

আইনে মৃত কিন্তু দুনিয়ার জীবন্ত লাফোর্কেড তখন আবার রেনেলের হাত ছাড়িয়ে জুলিয়েনের সঙ্গে চলে গেল।

তারপর দ্বিতীয় ঘটনা।

লিপজিকের এক পুরাতন সাময়িক পত্রে প্রকাশ : পল্টনের এক বিপুলবপু সেনানী, দুরন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। যদিও তিনি অসাধারণ বলবান ছিলেন, তবু তাঁর মাথার খুলি গেল ফেটে। ডাক্তারদের অনেক চেষ্টাতেও তাঁর জ্ঞান হল না। কয়েকদিন পরে তাঁর নিশ্বাস-বায়ুও বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তাররা পরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে স্থির করলেন। এক বৃহস্পতিবারে সেনানীকে কবর দেওয়া হল।

দু-দিন পরে, অর্থাৎ রবিবারে জনৈক শ্রমিক গোরস্থানে বসেছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেলে, মাটির তলায় একটা কবরের ভিতর থেকে বিষম হুটোপুটির শব্দ হচ্ছে!

শ্রমিক ভয়ে আঁতকে উঠে সেখান থেকে লম্বা দৌড় মারলে এবং লোকজন ডেকে এই অসম্ভব খবর দিলে।

প্রথমে কেহই তার কথায় বিশ্বাস করতে রাজি হয় না। তারপর শ্রমিকের জেদ দেখে সবাই শাবল কোদাল নিয়ে যথাস্থানে—অর্থাৎ সেই সেনানীর কবরের কাছে গিয়ে হাজির হল।

কবর খুঁড়ে দেখা গেল, সেনানীর মৃতবৎ দেহ উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছে এবং কফিনের ডালা ভাঙা! দেখলেই বোঝা যায়, মড়া জ্যান্ত হয়ে ধাক্কা মেরে ডালা ভেঙে উঠে বসে বাতাসের অভাবে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

সকলের চেষ্টায় সেনানীর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি তখন নিজের মুখেই তাঁর যোঝাযুঝি ও যন্ত্রণার কথা খুলে বললেন এবং একথাও জানালেন যে, মাথার উপর দিয়ে লোকজনের আনাগোনার শব্দ শুনে তিনি তাদের কাছে নিজের অস্তিত্ব জানাবারও চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সেনানীর নবজীবন ব্যর্থ হল। কারণ প্রবন্ধের প্রথমেই উক্ত বাঙালি মেয়েটির মতন তিনিও দ্বিতীয় বার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানেই।

তৃতীয় ঘটনা ঘটে লন্ডনে, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। এই ঘটনাটি নিয়ে বিলাতে তখন বিষম উত্তেজনার সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

এডওয়ার্ড স্টেপলটন ছিলেন একজন অ্যাটর্নি। তাঁর টাইফাস জ্বর হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁর দেহের কতকগুলো অজানা লক্ষণ ডাক্তারদের মনে কৌতূহল জাগ্রত করেছিল।

স্টেপলটন মারা পড়লেন। ডাক্তাররা নিজেদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে শব ব্যবচ্ছেদ করতে চাইলেন, কিন্তু আত্মীয় বন্ধুরা অনুমতি দিলেন না। মৃতদেহ সমাধিস্থ হল।

সে সময়ে বিলাতে লাশ-চোরদের ভারী উপদ্রব ছিল। এখনকার মতন তখনকার ডাক্তাররা ও চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্যবচ্ছেদ করবার জন্যে সাধু উপায়ে শব সংগ্রহ করতে পারতেন না। কাজেই তাঁদের অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে হত। তাঁরা শব পেলে মূল্য দিতেন এবং লাশ-চোররা অর্থলোভে গোপনে শব এনে তাঁদের কাছে বিক্রি করত। তারা কবর খুঁড়ে মড়া চুরি করে আনত এবং সেসুযোগ না পেলে জ্যান্ত মানুষ খুন করে তারও মৃতদেহ নিয়ে আসত! শেষটা এই উদ্দেশ্যে এত নরহত্যা হতে থাকে যে, ডাক্তারদের বৈধ উপায়েই শব সংগ্রহ করবার অনুমতি দেওয়া হয়।

বর্তমান ক্ষেত্রেও ডাক্তাররা লাশ-চোরদের আশ্রয় নিলেন। সমাধিস্থ হবার পর তৃতীয় রাত্রে তারা স্টেপলটনের মৃতদেহ গোর খুঁড়ে চুরি করে আনলে।

ডাক্তাররা শব নিয়ে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। মৃতদেহে তখনও পচ ধরেনি দেখে একজন পরামর্শ দিলেন বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র বা 'গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি' ব্যবহার করতে।

তাই করা হল। প্রথমটা বিশেষ কোনও ফল ফলল না। রাত শেষ হয়ে আসছে দেখে শব ব্যবচ্ছেদ করবার প্রস্তাব হল। চোরাই মড়া, সকালের আগেই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে।

ইতিমধ্যে একজন ছাত্র নিজের এক অনুমান সত্য কি না পরখ করবার জন্যে মৃতদেহের বুকের মাংসপেশিতে ছ্যাঁদা করে ব্যাটারি চালিয়ে দিলে।

পরমুহূর্তেই ভয়ানক ব্যাপার! মৃতদেহ শোয়ানো ছিল শব ব্যাবচ্ছেদের টেবিলের উপরে। আচম্বিতে সেই কয় দিনের বাসি মড়া ধড়মড় করে টেবিলের উপরে উঠে বসল, তাড়াতাড়ি মেঝেয় নেমে পড়ল, চারিদিকে অস্বস্তি ভরা চোখে তাকিয়ে দেখল এবং তারপরে—কথা কইলে! জড়িয়ে জড়িয়ে কী যে বললে বোঝা গেল না। কথা কয়েই সে আবার মেঝের উপরে দড়াম করে পড়ে গেল!

থমথমে নিশুত রাতে, শব ব্যবচ্ছেদাগারে, তিন দিন কবরবাসী একটা মড়া যদি উঠে দাঁড়িয়ে কথা কয়, তাহলে দর্শকদের মনের অবস্থা কীরকম হয় সেটা সকলে একবার ভেবে দেখুন।

ডাক্তাররা ভয়ে আড়ষ্ট! সকলেই একেবারে বোবা! তাঁরা ডাক্তার, মড়া ঘাঁটতে অভ্যস্ত ও দলে ভারী, তাই হয়তো আর্তনাদ করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন না এবং তাড়াতাড়ি নিজেদের সামলে নিয়ে বুঝতে পারলেন যে, স্টেপলটন কবরে গিয়েও মারা পড়েননি।

তখনই 'ইথারে'র সাহায্যে স্টেপলটনের মূর্ছা ভাঙানো হল। তারপর কিছুদিন ধরে গোপনে তাঁর

চিকিৎসা করে যখন বোঝা গেল যে, স্টেপলটনের আর কোনও অমঙ্গলের ভয় নেই, তখন তাঁকে আবার বাড়িতে ফিরে যেতে দেওয়া হল। যমালয়ের মানুষকে সশরীরে লোকালয়ে ফিরে আসতে দেখে স্টেপলটনের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মুখচোখ কেমনধারা হয়েছিল, এতদিন পরে সেটা বলবার উপায় নেই।

এর চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে স্টেপলটনের নিজের কথা।

তিনি বলেন, 'বাইরে আমাকে অজ্ঞানের মতো দেখালেও আমি একবারও জ্ঞান হারাইনি। সমস্ত গোলমেলে বলে বোধ হলেও, নিজের অবস্থা আমি আন্দাজ করতে পারছিলুম। যখন থেকে ডাক্তার আমাকে মৃত বলে সাব্যস্ত করে গেলেন এবং আমাকে গোর দেওয়া হল, তখন থেকে শব ব্যবচ্ছেদাগারে আমার দাঁড়িয়ে উঠে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই আমি সচেতন অবস্থাতেই বুঝতে পেরেছি। ডাক্তাররা আমার কথা বুঝতে পারেননি, কিন্তু সে কথাগুলি হচ্ছে—'ডাক্তার, আমি বেঁচে আছি'! আমার দারুণ আতঙ্ক হয়েছিল, ডাক্তাররা যদি জীবিত অবস্থাতেই আমাকে কাটতে শুরু করে দেন!'

কয়েক দিন পরে সমাধিস্থ মৃত দেহেও যদি আবার জীবন সঞ্চার হয়, তাহলে ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই যে সংখ্যাতীত শব দাহ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কত হতভাগ্য জীবন্তে পুড়ে মরেছে সে হিসাব কে করতে পারে? একথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে!

নবাব কুঠির নর্তকী

এক

—'হ্যাঁ, এই হচ্ছে সেই নবাব কুঠি! সেকালে এক বিলাসী নবাব এখানে বাস করতেন। রোজ নাচ গান আর আনন্দ কলরবে নিশীথ রাতের নীরবতা এখানে মুখরিত হয়ে উঠত। শোনা যায়—নবাবের এক নর্তকী ছিল, তার নাচের খ্যাতি ফিরত লোকের মুখে মুখে। তারপর হঠাৎ একদিন কী কারণে জানি না, নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে নর্তকীকে নিজের হাতে কেটে কুচি কুচি করে ফেলেন। আর সেই দিন রাত্রেই নাকি নবাবও গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। তারপর থেকে এখানে আর কেউ বাস করে না। নবাবের বংশধররা আজও আছেন, কিন্তু তাঁরা এই প্রাসাদকে অভিশপ্ত বলে মনে করেন। তাই এই প্রাসাদের উপরে আজ পাহারা দেয় কেবল নিবিড় অরণ্য, এর ছাদে বসে করুণস্বরে কাঁদে ঘুঘুর দল, এর ঘরে এসে বাসা বাঁধে বাদুড় আর প্যাঁচারা,—এমনকি খুঁজে দেখলে এখানে দু-চারটে শেয়াল বা নেকড়ে বাঘের সন্ধানও মিলতে পারে।'

আমি আর বসন্ত পুজোর ছুটিতে নলিনদের দেশে বেড়াতে এসেছি। তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়েছি পাখি শিকার করতে। তারপর গভীর জঙ্গলে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলি। সন্ধ্যার আবছায়ায় হঠাৎ যখন এই পরিত্যক্ত, স্তব্ধ প্রাসাদের সামনে এসে পড়লুম, নলিন তখন পথ চিনতে পারলে বটে, কিন্তু তখন আর গ্রামে ফেরবার উপায় নেই। কারণ এখনই অমাবস্যার আঁধার রাত এসে পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবে আর গ্রামও নাকি এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে! কাজেই স্থির করা গেল, আজকের রাতটা এই নবাব কুঠির মধ্যে বসেই কাটিয়ে দেব!

নলিনের মুখে নবাব কুঠির ছোট্ট ইতিহাস শুনে বসন্ত বললে, 'এই ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবী থেকে 'রোমান্সে'র গন্ধটুকু পর্যন্ত উপে গিয়েছে! যাক, তবু যে একখানা 'রোমান্টিক' বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল, এইটুকুই সৌভাগ্য!'

নলিন বললে, 'সৌভাগ্যের ঠেলা একটু পরেই বুঝতে পারবে!

—'কেন?'

—'রাতে খাবে কী? বাদুড়? চামচিকে? না কালো অন্ধকার?'

আমি বললুম, 'নির্ভয় হও! দৈব দুর্ঘটনার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। আমার ব্যাগের জঠরে আছে এক ডজন মর্তমান কলা, আধ ডজন ডিম আর দু-খানা বড়ো পাউরুটি।'

বসন্ত বললে, 'আর আমার 'ফ্লাস্কে' আছে গরম চা! ব্যাস, আজ আর কিছু না থাকলেও চলবে! কর্মভোগের পর রাজভোগ! মন্দ কী!'

নলিন তবু খুঁত খুঁত করতে করতে বললে, 'কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারে—'

আমি বললুম, 'আমার কাছে একটা 'টর্চ' আর দুটো মোমবাতি আছে, সুতরাং—'

বসন্ত বললে, 'সুতরাং দুর্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে এই কোণটা পরিষ্কার করে ফেলা যাক। এখানে যে ধুলো জমে আছে তার বয়স অন্তত একশো বছর!'

দুই

তখনও ভালো করে সন্ধ্যার আসর বসেনি। পশ্চিম দিকের বড়ো বড়ো জানলাগুলো দিয়ে যেটুকু ম্লান আলো আসছিল, তাইতেই ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছিল আবছা আবছা।

এ হচ্ছে একটা মস্তবড়ো হলঘর—এর মধ্যে অনায়াসে একশোজন লোকের জায়গা হতে পারে। কেবল মেঝের সমস্তটাই নয়—চারদিকের দেওয়ালও শ্বেতপাথরে বাঁধানো। অযত্নে ও কালের প্রভাবে মার্বেলের শুভ্রতা মলিন হয়ে গেছে বটে, তবু তার ভিতর থেকেই নবাবি ঐশ্বর্যের যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল তা মুগ্ধ করে দিলে আমাদের নয়ন মনকে। মাঝে মাঝে রঙিন পাথরের লতা পাতা ফুল বসিয়ে দেওয়ালকে অলঙ্কৃত করা হয়েছে, সে কারুকার্যও অনুপম।

আমি বললুম, 'বোধ হয় এইটেই ছিল নবাববাহাদুরের নাচঘর?'

বসন্ত কবিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করে বললে, 'হায় কী দুর্ভাগ্য! আজ নবাবি নাচঘর স্তব্ধ,—নর্তকীর নূপুরে বাজবে না আর কবিতার ছন্দ—ঘরের হাওয়ায় দুলবে না আর ফুলের মালার গন্ধ! সব 'রোমান্স' মাটি!'

হঠাৎ ওধারের একটা দরজা খুলে গেল সশব্দে।

নলিন চমকে উঠল।

আমি হেসে বললুম, 'ব্যাপার কী নলিন? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন ভয় পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছ।'

নলিনও হেসে বললে, 'একে বাড়িটার নামডাক ভালো নয়, তার উপরে আচমকা দরজাটা খুলে গেল কিনা!'

বসন্ত বললে, 'দমকা হাওয়ায় দরজা খুলে গেল, তাতে হয়েছে কী? তুমি কি ভাবছ দরজা খুলে কোনও বাইজি আমাদের নাচ দেখাতে আসছে? আহা, তা যদি আসত! আমি প্যালা দিতে রাজি!'

নলিন বললে, 'এখানে ওসব কথা আমার ভালো লাগছে না। বসন্ত আলো জ্বালো—খাবার বার করো!'

আমি বাতি জ্বাললুম।

তিন

বাতির আলোতে ঘরের একটা কোণ কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বটে, কিন্তু হাতকয়েক এগিয়েই পরিপূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল সেই ক্ষীণ আলোর ধারা।

পরিত্যক্ত প্রাসাদ, বিজন বন, অন্ধ রাত্রি! কিন্তু এরা কেউ স্তব্ধ নয়। রাত্রির কালো আঁচলের ভিতর থেকে কতরকম চিৎকার করছে কত জাতের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছের ডালে পাতায় বাতাসের হুড়োহুড়ি, বাড়ির ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে যেন সমস্ত দরজা-জানলা!

একখানা এনামেলের ডিশের উপরে ডিমগুলো রেখে আমি পাঁউরুটি কাটতে লাগলুম। নলিন কলার খোসা ছাড়াতে বসল। বসন্ত 'ফ্লাস্ক' থেকে চা ঢালতে উদ্যত হল। আমি বললুম, 'চা পরে ঢেলো, আগে ডিমগুলোর খোলা ছাড়িয়ে নাও।'

বসন্ত কাছে এসে বললে, 'কোথায় ডিম?'

—'ওই ডিশে।'

—'ডিশে ঘোড়ার ডিম আছে।' বলেই সে খালি ডিশখানা আমার দিকে ঠেলে দিলে।

আমি বললুম, 'চালাকি হচ্ছে? আমি এইমাত্র ছটা ডিম ডিশে নিজের হাত রেখেছি!'

—'তোমার দিব্যি সুরেন, ডিশে আমি একটাও ডিম দেখিনি।'

ডিমগুলো কি আমি ভুলে মাটিতে রেখেছি, আর সেগুলো গড়িয়ে দূরে চলে গেছে? দুটো বাতিই জ্বেলে এবং 'টর্চে'র আলো নিয়ে তিনজনে মিলে ঘরের চারিদিক খুঁজতে লাগলুম, কিন্তু একটাও ডিম আবিষ্কার করতে পারলুম না।

চার

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, 'তবে কি কোনও জন্তু-টন্তু আমাদের অজান্তে এসে ডিমগুলো নিয়ে পালিয়ে গেছে?

বসন্ত বললে, অসম্ভব!'

—'তবে?'

—'সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন! এ বাড়িতে আমরা ছাড়া নিশ্চয় আরও কোনও মানুষ আছে! হতভাগা চোরকে এখুনি আমি খুঁজে বার করব!'

আচম্বিতে আমিও অনুভব করলুম, ঘরের ভিতরে আমরা ছাড়া যেন বাহিরের কোনও লোক এসে হাজির হয়েছে। কোনওখানে পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে সে যেন অদৃশ্য চক্ষের ছুরির মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে আমাদের প্রত্যেক ভাবভঙ্গি লক্ষ করছে!

মনে মনে শিউরে বলে উঠলুম, 'বসন্ত, বসন্ত এ বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে! এখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি চলো।'

বসন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'না, না,—কীসের ভয়ে পালিয়ে যাব? আগে আমি চোরটাকে ধরে শিক্ষা দিতে চাই!' সে হেঁট হয়ে বন্দুকটা তুলে নিলে।

নলিন সচকিত স্বরে বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো! ওই কোণে সাদা মতন কী রয়েছে দ্যাখো!'

ঘরের দক্ষিণ কোণে মেঝের উপরে সত্যই শ্বেতবর্ণ কী যেন অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে! টর্চের আলো তার উপরে পড়তেই দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে গেল!

একজোড়া পা! রক্তমাংসের পা নয়—একেবারে অস্থিসার কঙ্কালের পা! তার চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে, দুই কঙ্কাল পদের উপরে বাঁধা রয়েছে একজোড়া নূপুর!

বসন্ত বললে, 'ও হাড় দু-খানা নিশ্চয়ই ওখানে ছিল, এতক্ষণ আমরা দেখতে পাইনি!'

নলিন কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'না, না! এতক্ষণ ওখানে কিছুই ছিল না!'

আমি বললুম 'নলিন, সেকালের সেই নবাব নাকি তাঁর নর্তকীর দেহকে কেটে কুচি কুচি করে ফেলেছিলেন?'

নলিন আমার কথার জবাব না দিয়ে, আর একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রীতিমতো কান্নার স্বরে বললে, 'ও আবার কী বসন্ত, ও আবার কী?'

চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলুম আর এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য!

এতক্ষণ আমরা ঘরের যেখানে বসেছিলুম ঠিক সেইখানেই পাথরের দেওয়ালের উপর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে দুটো আশ্চর্য চক্ষু! চোখ দুটো গড়া যেন লাল টকটকে পদ্মরাগ মণি দিয়ে এবং তাদের ভিতর থেকে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে যেন মৃত্যুভীষণ দুর্দান্ত ক্ষুধা!

বিনাবাক্যব্যয়ে বসন্ত বন্দুক তুলে চোখ দুটোকে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপে দিলে—বন্দুকের বিষম গর্জনে ঘর যেন ফেটে গেল—কিন্তু সেই বীভৎস রক্তাক্ত চোখ দুটো জ্বলতে লাগল ঠিক তেমনি জ্বলজ্বল করেই।

ওদিকে বন্দুকের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ভালো করে মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘরের মধ্যে আর একটা অদ্ভুত শব্দ জেগে উঠে আমাদের সর্বশরীর আচ্ছন্ন করে দিলে!

ঠক-ঠক ঠকা-ঠক-ঠক—ঝুনুঝুনু ঝুম-ঝুম-ঝুম! টক-ঠক ঠকা-ঠক-ঠক—ঝুনু-ঝুনু ঝুম-ঝুম-ঝুম!

ঠিক যেন দু-খানা নূপুর পরা হাড়ের পা মেতে উঠেছে নাচের আনন্দে!

পরমুহূর্তে বিকট এক আর্তনাদ করে নলিন ছুটল বাইরের দরজার দিকে!

ঠক-ঠক ঠকা-ঠক-ঠক—ঝুনু-ঝুনু ঝুম-ঝুম-ঝুম!—বেশ বুঝতে পারলুম, নূপুরপরা হাড়ের পা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই! পিছন ফিরে দেখতে ভরসা হল না—এতক্ষণে হয়তো সেখানে আবির্ভূত হয়েছে কোনও ভয়াবহ কঙ্কালমূর্তি!

বসন্ত চিৎকার করে বললে, 'কাপুরুষ! কীসের ভয়ে ও পালাল? এসব হচ্ছে 'হ্যালিউসিনেশন'! মিথ্যা মরীচিকা!

তার হাত ধরে প্রাণপণে টানতে টানতে বাইরের দিকে অগ্রসর হয়ে আমি বললুম, 'পাগলামি কোরো না বসন্ত,—শিগগির বেরিয়ে এসো, এ প্রাসাদ মানুষের পৃথিবীর বাইরে!'

কোর্তা

সরকারি কাজের জন্যে বিহারের একটি ছোটো শহরে কিছুদিন আমাকে থাকতে হয়েছিল। শহরের নাম না বললেও চলবে।

বৈকালে একদিন বেড়াতে বেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে পড়লুম। আমার এপাশে-ওপাশে সবুজ মাঠ আর শস্য খেত। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো পাহাড়। মাঝে মাঝে পড়ন্ত রোদে চকচক করছে নদীর জল। বেড়াতে ভালো লাগছিল।

ফেরবার মুখে আকাশে দেখা দিলে মস্ত একখানা কালো মেঘ। সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, কিন্তু আলো হয়ে এল নিবু নিবু। দেখতে দেখতে আকাশ ডুব দিলে অন্ধকারে—দূরে জেগে উঠল একটা অস্পষ্ট শব্দ। বুঝলুম ঝড় এসেছে।

এই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে ঝড়ের সঙ্গে আলাপ করা সুবিধাজনক হবে বলে মনে হল না। খানিক তফাতে পথের ধারের জঙ্গলের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছিল একখানা জীর্ণ সেকেলে বাড়ির খানিকটা। সেই দিকেই ছুটলুম।

মাঝারি আকারের দোতলা বাড়ি। তার গা থেকে মাঝে মাঝে চুন-বালির প্রলেপ খসে পড়েছে, এখানে ওখানে গজিয়ে উঠেছে অশথ-বটের দল, কোনও কোনও জানলার পাল্লা ভাঙা। দেখলেই বলা যায়, এ হচ্ছে পরিত্যক্ত বাড়ি।

হোক পরিত্যক্ত, আমার এখন চাই খালি মাথার উপরে একটা আচ্ছাদন। কারণ গাছে দোলা দিয়ে এবং চারিদিকে ধুলো-কাঁকর উড়িয়ে দুর্দান্ত ঝড় তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

বাড়ির সদর দরজার কাছে এসে দেখলুম, সদরের দু-খানা কবাটই ভেঙে পড়েছে। ভিতরে ঢুকেই বাঁ দিকে পেলুম একখানা ঘর। মেঝের উপরে পুরু ধুলো, কোথাও কোনও আসবাব নেই। তিনটে ভাঙা জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে হু হু করে ঢুকছে ঝড়ের সঙ্গে কাঁকর, ধুলো, বালি।

এ ঘরে মন আশ্রয় নিতে চাইলে না। পায়ে পায়ে বাড়ির ভিতর দিকে এগিয়ে পেলুম একটি উঠান। তারই এক কোণে সিঁড়ির সার। আমি উপরে উঠতে লাগলুম। যেখানে পা দি, সেখানেই পুরু ধুলোর উপরে ছড়ানো হরেক রকম নোংরা জিনিস।

সিঁড়ির পাশেই ছিল একটি ঘর, তারও দরজা খোলা। কিন্তু ঘরের ভিতরে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

আমি ভিতু লোক নই, কোনও রকম কুসংস্কারও আমার নেই। কিন্তু কেন জানি না, আমার পা দুটো যেন হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে আর আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে না। কে যেন নীরবে আমার কানে কানে বললে—ও ঘরে ঢুকো না, ও ঘর নিরাপদ নয়!

এরকম অহেতুকী ভয় আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আকাশে মেঘের সমারোহ দেখছি, চারিদিকে ঝড়ের গর্জনও শুনছি, কিন্তু এখনও দিনের আলো মরে যায়নি। একবার উঁকি মেরেও ঘরের ভিতরে কারুকে দেখতে পেলুম না। নিজের মনে-মনেই হেসে হাতের মোটা লাঠিগাছা ভালো করে চেপে ধরে আমি ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

শূন্য ঘর। কেবল মেঝের এক দিকে পড়ে আছে একখানা ধূলি-ধূসরিত ছেঁড়া মাদুর এবং দেওয়ালের একটা হুকে ঝুলছে লম্বা একটা কোর্তা।

কোর্তাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। পুরানো বেরঙা জামা, গায়ে দিলে তার তলদেশটা গিয়ে পড়বে

হাঁটুর নীচে। পুরু বনাতে তৈরি শীতবস্ত্র। কিন্তু এ জামাটকে কেউ এখানে নিশ্চয়ই বেশিদিন আগে ঝুলিয়ে রেখে যায়নি। কারণ জামাটার কোথাও এতটুকু ধুলোর চিহ্ন নেই—যেন এখনও তাকে নিয়মিতরূপে ব্যবহার করা হয়।

হঠাৎ নীচের দিকে চোখ পড়ল। কোর্তার ঠিক তলায় ধুলোর উপরে এবং ঘরের অন্যান্য দিকেও অদ্ভুত সব টানা হ্যাঁচড়ার দাগ! এসব দাগ কীসের? অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। মনে হল, কেউ যেন কোর্তাটাকে ধুলোর উপরে লুটিয়ে ঘরময় টানাটানি করে বেড়িয়েছে। হেঁট হয়ে দেখলুম, কোর্তার তলদেশে ধুলোর চিহ্ন রয়েছে বটে! এমন আশ্চর্য আচরণের অর্থ কী?

কোর্তাটার উপরে হাত রেখে ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে দেখলুম, তার বুকপকেটের উপরে রয়েছে একটা প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া ছ্যাঁদা! এ কীসের ছ্যাঁদা? আর এই ছ্যাঁদার চারিপাশে ওই শুকনো দাগটাই বা কীসের? ও কি রক্তের দাগ? কোর্তার উপরে কেউ কি ছোরার আঘাত করেছিল? তাহলে কি এই জামাটাকে কোনও মৃতদেহের গা থেকে খুলে নিয়ে এইখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে?

মনের ভিতরে জেগে উঠল কেমন একটা ঘৃণার শিহরণ! তারপরেই মনে হল, কোর্তার গা থেকে বেরুচ্ছে যেন পচা মাংসের দুর্গন্ধ! যদিও বুঝলুম, এ হচ্ছে আমার মিথ্যা সন্দেহ বা মনের ভ্রম, তবু কোর্তাটার কাছে আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হল না। তাড়াতাড়ি সরে এসে ঘরের একটা জানলা খুলে দিলুম।

ঝড়ের গোলমাল কমে এসেছে বটে, কিন্তু তখনও মেঘের ঘোর কাটেনি এবং বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে দেখা গেল প্রায় সিকি মাইল দূরে রয়েছে একখানি বৃষ্টিধৌত গ্রামের ছবি। মনে মনে বললুম, আগে জানা থাকলে এই ছমছমে ভাব ভরা পোড়ো বাড়িতে না এসে ওই গ্রামে গিয়েই আশ্রয় গ্রহণ করতুম! এ যেন অলক্ষুণে বাড়ি! ঘরের ভিতরটা ক্রমেই যেন কেমনতর হয়ে উঠছে। এখানে আমি যেন আর একলা নাই!

হঠাৎ বাইরের বারান্দায় ধপাস করে একটা শব্দ হল—কে যেন মাটির উপরে এক বস্তা কাপড় ফেলে দিলে!

দৌড়ে বাইরে গেলুম। বারান্দায় কোনও কাপড়ের বস্তা বা জনপ্রাণী নেই। এক মুহূর্ত আগে এখানে যে কেউ এসেছিল তারও প্রমাণ পেলুম না। যেই-ই আসুক, ধুলোর উপরে পদচিহ্ন থাকতই। ......কিন্তু তবু একটা শব্দ যে আমি শুনেছি সেবিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কে শব্দ করলে? আর কীসেরই বা শব্দ? এ বাড়িতে কি আমি ছাড়া আরও কেউ লুকিয়ে আছে? কে সে? চোর? ডাকাত? ফেরারি আসামি?

তারপরেই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিলে—কারণ স্পষ্ট শুনলুম, যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম তারই ভিতর থেকে যেন কে চাপা গলায় হেসে হেসে উঠছে!

আর ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখবার সাহস হল না! হতে পারে, যা শুনেছি সবই আমার কানের বা মনের ভুল, তবু এরকম সন্দেহজনক বাড়ির ভিতরে আর থাকা উচিত নয়। এরচেয়ে বৃষ্টিতে ভেজাও ভালো।

মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে সিঁড়ির দিকে এগুতে এগুতে ভয়ে ভয়ে আবার পিছন দিকে তাকালুম। ঘরের দরজার ওপাশ থেকে একটা চলন্ত ছায়া যেন বারান্দার উপরে এসে পড়ল এবং পরমুহূর্তে দেখলুম, দরজা জুড়ে বিরাজ করছে সেই সুদীর্ঘ কোর্তাটা!

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম পাথরের মূর্তির মতন—কতক্ষণ ধরে জানি না! কে যেন বিষম এক

সম্মোহন মন্ত্রে আমার নড়বার শক্তি একেবারে হরণ করে নিলে। আমার অসাড় হাত থেকে খসে লাঠিগাছা সশব্দে মেঝের উপরে পড়ে গেল।

কিন্তু আমি ভাববার শক্তি হারালুম না। বেশ বুঝলুম, আমি দাঁড়িয়ে আছি নরকের দূতের সামনে। ও যদি একবার আমাকে স্পর্শও করে তাহলে কেবল আমার দেহই ধ্বংস হবে না, আমার আত্মাও হবে নরকস্থ!

কোর্তা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার ভিতরে এসে আবির্ভূত হয়েছে যেন কোনও ভয়াবহ অদৃশ্য দেহ! জামার হাতার বাইরে হাত নেই, তলদেশে পায়ের চিহ্নও নেই, কিন্তু এইবার সেটা ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

তবু আমি নিশ্চল হয়ে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে আর তাকিয়েই রইলুম।

কোর্তা আসছে, আসছে, এগিয়ে আসছে। পদশব্দ নেই, সে এগিয়ে আসছে যেন শূন্যপথে। ......সে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনেই। তারপর হাতা দুটো বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। এইবারে সে আমাকে স্পর্শ করবে।

হঠাৎ প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলুম, 'ভগবান, ভগবান!'—সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরিয়ে পেলুম আমার সমস্ত শক্তি!

পাগলের মতন হেঁট হয়ে পড়ে মাটির উপর থেকে তুলে নিলুম আমার মোটা লাঠিগাছা এবং সজোরে আঘাত করলুম কোর্তার উপরে! আশ্চর্য! পরমুহূর্তেই সেটা সাধারণ জামার মতোই ঠিকরে পড়ল আমার পায়ের তলায়!

একলাফে জামাটা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে বেগে ছুটে গেলাম। নামবার আগে বিদ্যুতের মতন একবার ফিরে, দেখলুম, কোর্তাটা আবার শূন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছে—যেন সে আবার আমাকে ধরতে আসবে।

তিন-চার লাফে এসে পড়লুম একতলায়।

* * *

মানুষ যে কত জোরে ছুটতে পারে, সেদিন সেটা প্রথম অনুভব করলুম। জানলা থেকে দেখা সেই গ্রামের এক মুদির দোকানে না এসে আর থামলুম না।

মাটির উপরে এলিয়ে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'জল! এক গেলাস জল!'

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে মুদির মুখে যা শুনলুম তা হচ্ছে এই—

পঁচিশ বছর আগে ওই বাড়িতে বাস করত এক দারোগা। তার প্রকৃতি ছিল এমন ভীষণ যে, এ অঞ্চলের সাধু-অসাধু সমস্ত লোকই অতিষ্ঠ হয়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে আরম্ভ করেছিল।

হঠাৎ কে একদিন ছোরা মেরে দারোগাকে হত্যা করে যায়। সেই দিন থেকে ও-বাড়ি খালি পড়ে আছে। হাজার টাকা পুরস্কারের লোভ দেখালেও এ অঞ্চলের কোনও গরিব ভিখারিও ওই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে চাইবে না।

ভূত-পেতনির কথা

তোমাদের কাছে আমি কাল্পনিক ভূতের গল্প বলেছি অনেক। কিন্তু সত্যি সত্যি ভূতের অস্তিত্ব আছে কি না, এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই।

এসব নিয়ে দরকার নেই আমাদের মাথা ঘামিয়ে। কারুকেই আমি ভূত বিশ্বাস করতে বলি না। অন্তত ভূত মানলেও ভূতকে ভয় করবার দরকার আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু ভূত মানি আর না মানি, মাঝে মাঝে এমন কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যাদের কোনও মানে হয় না। সেগুলো ভূতের কীর্তি না হতে পারে, কিন্তু তাদের মূলে নিশ্চয়ই কোনও অপার্থিব শক্তি কাজ করে।

প্রায় বছর কুড়ি আগে কলকাতায় জয় মিত্র স্ট্রিটের একটি বাড়িতে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে। কোথাও কিছু নেই, বন্ধ ঘরের মধ্যে হঠাৎ একরাশ ইট বা রাবিশ বৃষ্টি হল। চোখের সামনে ঘটি, বাটি ও থালা মাটি থেকে উঠে শূন্যে উড়তে লাগল পাখির মতো, তারপর ঝনঝন করে আবার মাটির উপরে পড়ে ভেঙেচুরে গেল। থানায় খবর দেওয়া হল। পুলিশবাহিনী এসে বাড়ি ঘেরাও করে সতর্ক পাহারা দিতে লাগল, তবু ওইসব উপদ্রব বন্ধ হল না। অথচ তার কিছুকাল পরে—পুলিশ যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে সরে পড়েছে—তখন সমস্ত উৎপাত আপনা-আপনি আবার থেমে গেল! ওই উপদ্রবের কাহিনি সংবাদপত্রেও প্রচারিত হয়েছিল এবং দলে দলে লোক ঘটনাস্থলে গিয়ে স্বচক্ষে সমস্ত দর্শন করেছিল।

আমাদের নিজেদের ভিতরে দুইবার দুটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে।

অনেক দিন আগে আমরা রাওলপিণ্ডিতে গিয়ে এক বৎসর বাস করেছিলুম। পরিবারের মধ্যে বাবা, মা, আমি আর দুই বোন। পে-অফিস লেন নামক রাস্তায় যে বাড়িখানা আমরা ভাড়া নিয়েছিলুম, সেখানা এখনও বর্তমান আছে কি না জানি না, কিন্তু তখন সে-বাড়িতে সহজে কেউ থাকতে চাইত না। আমরা ভাড়া নেবার পরেই পাড়ার লোকের মুখে খবর পাওয়া গেল, এ বাড়িতে নাকি অনেকরকম ভয় আছে। এর মধ্যে একজন পাঠান নিহত হয়েছে এবং আর একজন পাঠান করেছে আত্মহত্যা। তারপর থেকে এখানে আর কেউ বাস করতে পারে না। বাবা কিন্তু ওসব কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

আমার বয়স তখন অল্প। সব কথা ভালো করে মনে হয় না, তবে কোনও কোনও ঘটনা এখনও ভুলিনি। এক রাত্রে মায়ের ডাকাডাকিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল।

বাবা বিছানার উপরে উঠে বসে বললেন, 'ব্যাপার কী?'

মা বললেন, 'দেখবে এসো।'

আমাদের শোবার ঘরের সামনেই ছিল একটা দালান, তারপর উঠান এবং উঠানের তিন দিকে কয়েকখানা ঘর। বাবা ও মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমিও গেলুম তাঁদের পিছনে পিছনে।

দালান থেকে বেরিয়েই অবাক হয়ে দেখলুম, উঠানের উপরে মাটি থেকে প্রায় চার হাত উঁচুতে জ্বলছে আশ্চর্য একটা আলো। দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, প্রদীপ, বাতি, লণ্ঠন, বা মশাল থেকে সে আলোর উৎপত্তি নয়। নীলাভ আলো, আকার ক্রিকেট বলের মতন। চাঁদের কিরণে ধবধবে উঠানের উপরে আলোটা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত নেচে নেচে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে এক-একটা ঘরের দরজার কাছে গিয়ে যেন ঠোকর খেয়েই আবার ফিরে আসছে।

মায়ের বাধা না মেনে বাবা উঠানের দিকে অগ্রসর হলেন—আলোটাও হঠাৎ নিবে গেল!

তারপর কয়েক রাত ধরে আর এক্‌রকম কাণ্ড! গভীর রাত্রে উঠানের ধারের ঘরগুলোর দরজায় দরজায় শিকল বেজে ওঠে ঝন ঝন ঝন! বাবা বাইরে ছুটে যান, কিন্তু কারুকে দেখতে পান না। হয়তো বাইরের দুষ্ট লোক এসে ভয় দেখাচ্ছে এই ভেবে ভিতরে ঢুকবার দুই দরজার তালাচাবি লাগানো হল কিন্তু তবু থামল না শিকল সংগীত।

মা তো ভয়ে সারা। বলেন, এ অলক্ষুণে বাড়ি ছেড়ে চলো! বাবা কিন্তু অটল। বলেন, আলো দেখিয়ে আর শিকল বাজিয়ে কোনও পাঠান-ভূত আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

পাঠান-ভূতরা শেষটা হতাশ হয়ে আলো দেখানোর ও শিকল বাজানোর কাজে ইস্তফা দিলে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি গুরুতর এবং ঘটনাস্থল হচ্ছে কলকাতা।

আমাদের পৈতৃক বসতবাড়ি ছিল পাথুরিয়াঘাটায়! তিন মহলা বাড়ি, তার পরে একটি হাত দেড়েক চওড়া খানা তারপরে আমাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের এক সারে তিনখানা বাড়ি। শেষোক্ত তিনখানা বাড়ির মধ্যে একখানা ছিল খালি—ভৌতিক বাড়ি বলে তার ভিতরে কেউ বাস করতে পারত না।

ছেলেবেলা থেকেই আমি ভূতকে ভয় করি না—যদিও ভূতের গল্প শুনতে বা পড়তে খুব ভালোবাসি। মনে আছে বালক বয়সে একদিন কৌতূহলী হয়ে ছাদ থেকে পাঁচিল বেয়ে সেই হানাবাড়িতে নেমেছিলুম—ভূতকে বধ করবার জন্যে আমার হাতে ছিল একখানা কাটারি!

দোতলা ও একতলার প্রত্যেক ঘরে ঢুকে দেখলুম খালি দু-ইঞ্চি পুরু ধুলো এবং ধুলোর উপরে নানা আকারের পদচিহ্ন। একটা ঘরে রয়েছে ধুলো ভরা তৈলহীন প্রদীপের ভিতরে আধপোড়া সলিতা এবং আর একটা ঘরের মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা কঙ্কাল! তোমরা চমকে উঠো না, কারণ সেটা হচ্ছে বিড়ালের কঙ্কাল! ভূত দেখাও দিলে না, কোনওরকম শব্দ-টব্দ করবার বা কথা কইবার চেষ্টা করলে না,—বোধহয় আমার হাতে কাটারি দেখে ভয় পেয়েছিল! অথচ এই বাড়িরই ছাদের উপরে ঘটেছিল একটি রোমঞ্চকর ঘটনা! তখন আমার বয়স দশ বৎসরের বেশি নয়।

আমার বাবার একটি অভ্যাস ছিল। গ্রীষ্মকালের রাত্রে তিনি খোলা ছাদের উপরে শয়ন করতেন। একদিন অনেক রাতে বিষম গোলমালে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি, কাকারা আমার বাবার অচেতন দেহ বহন করে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছেন।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর বাবার জ্ঞান হল। তারপর তখন এবং পরেও বাবার মুখে একাধিকবার যে কাহিনিটি শুনেছি তা হচ্ছে এই :

ছাদের উপরে উঠে ঘুমোবার আগে বাবা খানিকক্ষণ পায়চারি করতেন।

দুই-তিন দিন পায়চারি করতে করতে বাবা দেখতে পেলেন, খানার ওপাশে হানাবাড়ির ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে আছে এক শ্বেতবসনা নারীমূর্তি।

ওদিকের পাশাপাশি তিন বাড়ির একটা ছাদে উঠলেই অন্য দুটো ছাদের উপরেও অনায়াসে যাওয়া চলত। হানাবাড়ির ও তার পাশের বাড়ির ছাদে ওঠবার সিঁড়ি ছিল না। বাকি যে বাড়ির সিঁড়ি ছিল তার মধ্যে বাস করতেন 'রাঙা গিন্নি' নামে এক বিধবা নারী ও 'তুলসীর মা' নামে এক মহিলা। ছাদের উপরে প্রথম দুই-তিন দিন নারীমূর্তি দেখে বাবা ভেবেছিলেন, গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যে নিশ্চয়ই রাঙা গিন্নি বা তুলসীর মা ছাদের উপরে উঠে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

ঘটনার দিন বাবা অনেক রাতে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছিলেন। আহারাদি সেরে তিনি যখন ছাদের উপরে শয়ন করতে যান রাত তখন প্রায় তিনটে।

নিঝুম রাতে বৈশাখী জ্যোৎস্নায় চারিদিক সমুজ্জ্বল। বাবা সেদিনও স্পষ্ট দেখতে পেলেন, একটি নারীমূর্তি হানাবাড়ির ছাদ থেকে মেঝের বাড়ির ছাদের উপরে এসে দাঁড়াল।

আজ বাবার মনে কেমন সন্দেহ হল। ওই হানাবাড়িকে পাড়ার সকলেই ভয় করে। ও বাড়ি কেউ ভাড়া পর্যন্ত নেয় না। এই স্তব্ধ শেষ রাতে ওর ছাদের উপরে পাড়ার মেয়ের নিয়মিত আবির্ভাব দেখে তিনি বিস্মিত হলেন।

দূর থেকে বাবা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে কে তুমি দাঁড়িয়ে আছ?'

কোনও সাড়া নেই।

বাবা এগুতে এগুতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রাঙা গিন্নি নাকি? ...তুলসীর মা?'

মূর্তি উত্তর দিলে না।

বাবা তখন খানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এতক্ষণে তিনি লক্ষ করলেন, মূর্তির মুখে ঘোমটা। রাঙা গিন্নি বা তুলসীর মা বাবার সমানে ঘোমটা দিতেন না। ওখানে অন্য কোনও মেয়ের আসবার কথাও নয়। তবে কে এই নারী?

মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোতেও তার কাপড়ের ভিতর থেকে দেহের কোনও অংশই দেখা যাচ্ছে না। তার ভাবভঙ্গি বৃদ্ধার মতন নয় বটে, কিন্তু সে যুবতী কি প্রৌঢ়া, তাও বোঝবার উপায় নেই।

বাবা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে খানা ডিঙিয়ে পাশের ছাদের উপরে গিয়ে উঠলেন। তিনি স্থির করলেন, নিশ্চয় এ কোনও মেয়ে-চোর! ধরা পড়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা তার দিকে অগ্রসর হতেই সে পায়ে পায়ে পিছোতে লাগল।

বাবা বললেন, 'দাঁড়াও। শিগগির বলো কে তুমি?'

কোনও জবাব না দিয়ে মূর্তি পিছোতে লাগল। ক্রমে তার সঙ্গে বাবাও হানাবাড়ির ছাদের উপরে গিয়ে পড়লেন।

নারীমূর্তি একেবারে ছাদের ধারে গিয়ে দাঁড়াল—তারপর আর পিছোবার উপায় নেই।

—'আর কোথায় পালাবে? এখন আমার কথার জবাব দাও। কে তুমি?' বলে বাবা আরও দুই পা এগিয়ে গেলেন।

তারপর যা হল সেটা একেবারেই কল্পনাতীত। বাবা যখন মূর্তির কাছ থেকে মাত্র এক হাত তফাতে, তখন পূর্ণ চন্দ্রালোকেই সেই অদ্ভুত স্ত্রীলোকটি যেন হাওয়ার ভিতরে মিলিয়ে গেল।

বাবা অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, তিনি যে ভূতকে ভয় করতেন না একথা আমি জানি। কিন্তু এই অপার্থিব ও অসম্ভব দৃশ্য দেখে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল এবং তিনি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে আমাদের বসতবাড়ি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের অংশে পড়ে বাড়ির পিছন দিকটা। খানার ধারে হানাবাড়ির ঠিক পাশেই তেতলার ঘরে আমি বহু বৎসর শয়ন করেছিলুম, কিন্তু প্রেতিনী-দর্শনের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনওদিন আমার হয়নি।

বাবা এর পরেও গ্রীষ্মকালে ছাদে শয়ন করতেন, কিন্তু কোনও ছায়ামূর্তিই আর তিনি দেখতে পাননি। হানাবাড়িখানাও পরে সংস্কার করে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনও ভাড়াটিয়া ভূতের ভয় পেয়েছে বলে অভিযোগ করেনি।

বাবা ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী, নির্ভীক, স্বল্পবাক ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তিনি যে মিথ্যা ভয় পেয়েছিলেন বা কাল্পনিক গল্পকে সত্য বলে চালিয়েছিলেন, এমন অসম্ভব কথা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারি না।

দিন-দুপুরের ডাকাত

এক

ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে উত্তর আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম প্রদেশ। কাল ১৯২১ অব্দ।

প্রথমে তিনজন লোকের পরিচয় দরকার!

এডওয়ার্ড অ্যাডাম্‌স—বয়স চৌত্রিশ বৎসর! নরহত্যা করে যাবজ্জীবনের জন্যে জেল খাটছে!

জর্জ উইসবার্গার—বয়স চব্বিশ বৎসর। চুরি করে পাঁচ বৎসর কারাবাস করবার হুকুম পেয়েছে।

ফ্রাঙ্ক ফস্টার—বয়স মোটে উনিশ বৎসর। এই বয়সে এও নরহত্যার চেষ্টা করে পাঁচ বৎসরের জন্যে কারাবদ্ধ হয়েছে।

এক জেলখানায় একসঙ্গে জেল খাটতে খাটতে তিনজনের মধ্যে আলাপ খুব জমে উঠল। ভয়াবহ প্রকৃতির জন্যে অ্যাডাম্‌স ছিল অতিশয় বিখ্যাত। কিন্তু জেল-কর্তৃপক্ষ দেখলেন, অ্যাডাম্‌স ও তাহার দুই বন্ধুর মতো ভালোমানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষ বুঝলেন না, তারা ভালোমানুষির অভিনয় করছে মাত্র।

ভিতরে ভিতরে তারা আঁটছিল পালাবার ফন্দি। ফস্টার আগে দর্জির কাজ করত। সুবিধা পেলেই জেলখানার নানান ঠাঁই থেকে কাপড়-চোপড় বা ন্যাকড়া চুরি করে এনে দড়ির সিঁড়ি তৈরি করত এবং সেটা নিজের জামার তলায় কোমরে জড়িয়ে রাখত।

এক ভরসন্ধ্যাবেলায় রক্ষীরা যখন অন্যমনস্ক, তিন বন্ধুতে চোঁচা দৌড় মেরে একেবারে জেলখানার উঁচু পাঁচিলের তলায় গিয়ে হাজির! উইসবাগার ছিল হালকা ও ছিপছিপে। দুই বন্ধুর কাঁধে চড়ে সে জিমনাস্টিকের কসরত দেখিয়ে টপ করে পাঁচিলের উপরে উঠে পড়ল। তারপর সেখানকার লোহার রেলিং থেকে ঝুলিয়ে দিলে দড়ির সিঁড়ি। অ্যাডাম্‌স ও ফস্টার সিঁড়ি বেয়ে তড়তড় করে উপরে উঠে গেল।

ইতিমধ্যে রক্ষীদের বন্দুকগুলো ভীষণ গর্জন করে উঠেছে এবং আসামিদের চারপাশ দিয়ে ছুটছে তপ্ত গুলির মৃত্যু-ঝড়! কিন্তু সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে বন্দুকের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেল, আসামিরা লাফিয়ে পড়ল পাঁচিলের বাইরে।

দৌড়োতে দৌড়োতে পলাতকরা শহর ছাড়িয়ে ঢুকল গিয়ে বনের ভিতরে।

তখন সে-অঞ্চলের দিকে দিকে ছুটছে পুলিশের মোটরের পর মোটর এবং অতি তীব্র 'সার্চ-লাইট'এর দীর্ঘ শিখাগুলো রাতের কালো বুক করে তুলেছে আলোয় আলোয় আলোময়! সঙ্গে সঙ্গে জেলখানার 'সাইরেন' তীক্ষ্ণ স্বরে পোঁ ধরে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে—'সবাই সাবধান হও! জেল ভেঙে আসামি পালিয়েছে!'

পলাতকরা বন-বাদাড় ভেঙে সারারাত দ্রুতপদে এগিয়ে চলল। কিন্তু পূর্ব আকাশ ফরসা হতেই তারা বন ছেড়ে খোলা মাঠে এসে ছোটোখাটো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে রইল। তারা বুঝেছিল, সকালের আলো ফুটলেই দলে দলে পুলিশ এসে সারা বন তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে!

পুলিশ বাহিনীর আবির্ভাব হল। খোলা মাঠ সন্দেহের অতীত বলে পুলিশের লোকরা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে খানাতল্লাশ আরম্ভ করলে।

আবার এল রাত এবং অসাধুদের প্রিয় অন্ধকার। কাছেই ছিল এক চাষার বাড়ি—পলাতকরা ঝোপ থেকে বেরিয়ে সেই দিকে চলল। তৃষ্ণায় তাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল; আগে তারা জলপান করলে, তারপর সেখানকার টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে চাষার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

তারা দাবি করলে, 'আমাদের খাবার দাও।'

তাদের পোশাক দেখেই চাষা আর তার বউ বুঝতে পারলে যে, তারা হচ্ছে জেল থেকে পলাতক আসামি, সুতরাং সাংঘাতিক লোক! চাষা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি খাবার-দাবার নিয়ে এল! তারপর আসামিরা অদৃশ্য হতেই পুলিশে খবর দেবার জন্যে ছুটে গিয়ে দেখে যে, টেলিফোনের তার কাটা।

দুই

উইচিটা শহরে ছিল উইসবারের বউ, তার বাড়ি এক বস্তির মধ্যে। তিন বন্ধু সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অ্যাডম্‌স-এর এক গুন্ডা স্যাঙাত, নাম তার ফেল্টেলম্যান, সে-ও এখানে এসে দলে ভিড়ে গেল। বুদ্ধি ও কুকীর্তির জোরে অ্যাডাম্‌সই হল দলপতি।

অ্যাডাম্‌স বললে, 'দ্যাখো, একখানা ভাড়া করা মোটরে চড়ে আগে আমরা ব্যাংক লুট করব।'

পরামর্শের ফলে স্থির হল উইচিটা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে রোজহিল নামক স্থানে গিয়ে তারা প্রথম ব্যাংকে হানা দেবে।

মোটর যথাস্থানে গিয়ে থামল। একজন গাড়িতে বসে ইঞ্জিন চালিয়ে রাখলে, বাকি তিনজন ব্যাংকের ভিতরে প্রবেশ করলে। তারা এমন সময় নির্বাচন করেছিল, ব্যাংকে যখন জনতা নেই।

তাদের মারমুখো মূর্তি ও তিন-তিনটে রিভলভার দেখে ব্যাংকের কর্মচারীদের প্রাণ গেল উড়ে! বন্দি হতে তারা কিছুমাত্র আপত্তি করলে না।

ইতিমধ্যে জনৈক পুলিশ কর্মচারী রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলে, মোটর থেকে নেমে তিনজন লোক ঢুকল ব্যাংকের ভিতরে, তবু মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ করা হল না! সে তখনই টেলিফোনে থানায় খবর পাঠিয়ে দিলে!

এ ব্যাংকের টাকাকড়ি নিয়ে ডাকাতদের মোটর খানিক দূর অগ্রসর হয়েই আর একটা ব্যাংক দেখতে পেলে। তৎক্ষণাৎ তারও উপরে হানা দেওয়া হল। তারপর মোটরে উঠে ডাকাতরা দেখে, পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী পুলিশ-ফৌজ।

মোটর চালাচ্ছিল অ্যাডাম্‌স নিজে, সে বেপরোয়ার মতো ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে দিলে পুলিশদের দিকে!

বিষম গুলিবৃষ্টির ভিতর দিয়ে পুলিশফৌজ ভেদ করে ডাকাতদের গাড়ি বিদ্যুৎ বেগে যেন উড়ে বেরিয়ে গেল! গাড়ির বাতাস-পর্দার কাচ চুরমার, তার 'হুড' ছিন্নভিন্ন, এপাশ-ওপাশ শতছিদ্র হয়ে গেল বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ডাকাতদের গায়ে লাগল না একটাও গুলি!

পথিমধ্যে ভাঙা গাড়িখানা ফেলে রেখে, আর একখানা গাড়ি ভাড়া করে ডাকাতরা আবার উইচিটার আড্ডায় ফিরে এল—তাদের পকেটে তখন টাকা ধরছে না।

তিন

অ্যাডাম্‌সের দলের পরের কীর্তি হচ্ছে, একখানা মেল ট্রেন লুট করা। এখানে তারা পেলে প্রায় লক্ষ টাকা!

তারপর কয়েকটা প্রদেশ জুড়ে যে কাণ্ড শুরু হল তার আর তুলনা নেই! কখনও জড়োয়া গহনার

ও কখনও দামি জামাকাপড়ের দোকানের হয় ডাকাতি, কখনও ডাকাতদের আবির্ভাব হয় পোস্ট আফিসে এবং কখনও বা ব্যাংক-বাড়িতে বা মেল ট্রেনে!

পুলিশ শক্তিহীন, দেশময় হুলুস্থুল, সকলে ভীত চকিত স্তম্ভিত, মাত্র চারজন ডাকাতের এমন দুঃসাহস ও বাহাদুরির কথা কেউ কোনওদিন শোনেনি। এ অদ্ভুত ডাকাতদের দেখা পাওয়া যায় যেখানে-সেখানে, কিন্তু ধরতে গেলেই তারা ফাঁকি দিয়ে মিলিয়ে যায় ছায়ার মতো! সর্বদাই তারা আসা যাওয়া করে বেগবান মোটর গাড়িতে। আজ হানা দেয় যে শহরে কাল তাদের আবির্ভাব হয় সেখান থেকে একশো মাইল দূরে। কেবল এক শহরে নয়, তারা এক জেলায় দু-দিন অপেক্ষা করে না, তাদের কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত চার-পাঁচটা জেলা জুড়ে। পুলিশরা যেন আলেয়ার পিছনে মিথ্যা ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ল! ডাকাতরা তিনখানা মোটর গাড়ি চুরি করে দেশের পর দেশ চষে বেড়াতে লাগল!

হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে, ১৩ই আগস্ট জেল থেকে পালিয়ে পরের মাসের ত্রিশ তারিখের ভিতরে তারা লুট করেছিল দশটা ব্যাংক, দু-খানা রেলগাড়ি ও একশো পাঁচখানা জড়োয়া গহনা প্রভৃতির দোকান। ডাকাতদের হস্তগত হয়েছিল মোট প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। এর চেয়েও অদ্ভুত কথার কল্পনাও করা যায় না—দেড় মাসের মধ্যে প্রত্যেক ডাকাত হয়ে পড়ল ধনকুবের।

দেশের লোকেরা ডাকাতদের নাম রাখলে, 'ভয়ঙ্করের দল।'

চার

চুরি করা গাড়ি তিনখানা আর ব্যবহার করা চলল না; পুলিশ—এমনকি জনসাধারণও তাদের বড়ো বেশি চিনে ফেলেছে।

অ্যাডাম্‌স ভারী পাকা লোক, অত্যন্ত অনায়াসেই আর একখানা নূতন হাডসন গাড়ি চুরি করে আনলে।

মারে নামে এক গ্রাম থেকে দুই মাইল তফাতে ছিল একটা পাহাড়, সেইখানে গিয়ে তারা গাড়ি থামালে। অশ্রান্ত ভাবে একটানা চুরি-ডাকাতি করে তারা এমন এলিয়ে পড়েছিল যে, খানিকটা না ঘুমিয়ে আর চলল না। অ্যাডাম্‌স গাড়ির ভিতরেই ঘুমিয়ে পড়ল, বাকি তিনজন নীচে নেমে ঘাস জমির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে দিলে।

সেখান দিয়ে যাচ্ছিল চার্লি জোন্‌স নামে এক ব্যক্তি। ঘুমন্ত লোকগুলিকে উঁকি মেরে দেখে, তার কেমন সন্দেহ হল। সে তখনই গ্রামে ছুটে গিয়ে শেরিফকে খবর দিলে। আমেরিকায় শেরিফদের হাতে শান্তিরক্ষার ভার।

শেরিফ নিজের ফোর্ড গাড়িতে আরও তিনজন পুলিশের লোক তুলে নিয়ে খবরদারি করতে এলেন। কিন্তু তখনও তিনি আন্দাজ করতে পারেননি যে, 'ভয়ঙ্করের দল' এসে হানা দিয়েছে আজ এখানে।

বিনা দ্বিধায় অ্যাডাম্‌স-এর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে শেরিফ বললেন, কে হে তোমরা? এখানে কী করছ?'

চোখ-খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই সদা-সতর্ক অ্যাডাম্‌স ধাঁ করে রিভলভার বার করে সচকিত শেরিফের মুখের উপর দু'বার ঘোড়া টিপলে, কিন্তু কার্তুজ ফাটল না! পরমুহূর্তেই দুইজনের মধ্যে লেগে গেল মহা ঝটাপটি!

সেই ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দে জেগে উঠেই বাকি তিনজন ডাকাত টপাটপ রিভলভার বার করে গুলি

ছুড়তে আরম্ভ করলে এবং তিনজন পুলিশ কর্মচারীই আহত হয়ে মাটির উপরে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তারা যত আর্তনাদ করে, তাদের উপরে ততই গুলিবৃষ্টি হয়। বেগতিক দেখে শেরিফ দিলেন টেনে লম্বা!

ডাকাতদের যে আবিষ্কার করেছিল, সেই চার্লি জোন্‌স বন্দুক নিয়ে আসছিল ঘটনাস্থলের দিকে। 'ভয়ঙ্করের দল' তাকেও গুলি করে মেরে ফেললে। তারপর তারা নিজেদের মোটরে চড়ে সরে পড়ল।

নতুন এক জেলায় গিয়ে তারা আরও দশ জায়গায় ডাকাতির পর বুঝলে, এবার আত্মগোপন না করলে আর আত্মরক্ষা করা অসম্ভব! কারণ জেলায় জেলায় তাদের নামে হুলিয়া বেরিয়েছে; শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে তাদের ছবি প্রচার করা হয়েছে; চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরীরা আনাগোনা করছে; দেশের লোকেরাও তাদের উপরে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে!

অ্যাডাম্‌স বললে, ভাইসব, এইবারে ফাঁদ গুটোতে হবে। আর তো আমাদের টাকার ভাবনা নেই, যা পেয়েছি তাইতেই রাজার হালে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব। এ গাড়িখানাও সবাই চিনে ফেলেছে। চলো, একখানা নতুন গাড়ি চুরি করে আড্ডায় ফিরে যাওয়া যাক।'

কার্লসন নামে এক ধনী ও বুড়ো লোকের 'গ্যারেজ'-এ গিয়ে তারা হানা দিলে। হতভাগ্য বৃদ্ধকে নির্দয় ভাবে হত্যা করে তার বুইক-গাড়ি নিয়ে তারা পালিয়ে গেল।

আড্ডার কাছে এসেই তারা টের পেলে পুলিশ তাদের আড্ডা আবিষ্কার করে ফেলেছে! কিন্তু আবিষ্কার করলে কী হবে! পুলিশ এবারেও তাদের ধরতে পারলে না। রাজপথের উপরে বেঁধে গেল এক যুদ্ধ! যখন যুদ্ধ থামল দেখা গেল, পথের উপরে পড়ে রয়েছে হত ও আহত তিনজন পাহারাওয়ালার রক্তাক্ত দেহ এবং 'ভয়ঙ্করের দল' হয়েছে আবার অদৃশ্য!

পাঁচ

পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানলে, অপরাধীরা এবারে মোটরে চড়ে পালাতে পারেনি। বোঝা গেল, তারা শহরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তখনই চারদিক খানাতল্লাশের সাড়া পড়ে গেল।

তিন দিন তিন রাতের পর অ্যাডাম্‌স বুঝলে, এ শহরে আর লুকিয়ে থাকা অসম্ভব। তখন তারা মরিয়া হয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। তারা একসঙ্গে না বেরিয়ে একে একে বাইরে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানের দিকে চলল।

একজন লোক অ্যাডাম্‌সকে চিনতে পেরে গোপনে পুলিশকে সতর্ক করে দিলে। দু-জন পাহারাওয়ালা একসঙ্গে অ্যাডাম্‌সকে আক্রমণ করলে এবং আরও দু-জন পাহারাওয়ালাও ঘটনাস্থলে এসে পড়ল। অ্যাডাম্‌স একাই তাদের সঙ্গে বাঘের মতো লড়তে লাগল!

দু-জনের বাহু-বন্ধনের মধ্যে থেকেও সে একজনকে গুলি করে মেরে ফেললে এবং আর একজনেরও অবস্থা সে যখন রীতিমতো কাহিল করে এনেছে, তখন হঠাৎ তৃতীয় প্রহরীর বন্দুক গর্জন করে উঠল। যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে অ্যাডাম্‌স-এর অবশ দেহ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে হল তার মৃত্যু।

সর্দারকে হারিয়ে দলের অবস্থা হল নাবিকহীন জাহাজের মতো। চার মাসের মধ্যে বাকি তিনজন ডাকাতও একে একে ধরা পড়ল।

অসাধুরা দু-দিনের জন্যে যতই প্রবল হোক, ধর্ম জাগলে ন্যায়দণ্ড তাদের গ্রহণ করতে হবেই। পাপ কোনওদিন শান্তি আনে না।

আজব সত্য-কাহিনি

এবারে (১৩৪৮ সাল) কালবৈশাখী করেছিল কলকাতাকে 'বয়কট'। বরাবরই সে ফাগুনের শেষ থেকে চৈত্র মাসের মধ্যেই দেখা দেয় এবং সঙ্গে আসে তার অল্পবিস্তর বৃষ্টিধারা। আজ পর্যন্ত আমি তাকে এই বাৎসরিক কর্তব্যপালনে অমনোযোগী হতে দেখিনি।

কিন্তু এবারে সে ছিল অদৃশ্য। এমনকি বৈশাখের তিন-তিনটে দিন গেল, অথচ আকাশ থেকে ঝরল না একটি ফোঁটা জল! রোজই বৈকালে তৃষিত চোখে মুখ তুলে দেখি কাঠফাটা রোদে পুড়ে ঝলসে যাচ্ছে আকাশের নীলিমা। ধুলোয় ধূসর কলকাতায় জাগল নাগরিকদের হাহাকার।

ঠিক এই সময়ে আমাদের 'রংমশালের দল'* রেডিয়োর আসরে বসে একতানে ধরলে যখন গান—

জাগো জাগো কালবৈশাখী!
আর থেকো না সুপ্ত হে—

আকাশে ছিল না তখন একখানা মেঘ।

কিন্তু 'বৈশাখী'র পালা শেষ হবার পরই রেডিয়ো-অফিস থেকে পথে বেরিয়ে সবিস্ময়ে দেখি, পশ্চিম আকাশ ভরে গিয়েছে কালো কালো মেঘে আর মেঘে!

এ যে অবাক কাণ্ড! মনে মনে বললুম, ধন্য 'রংমশালের দল', ধন্য! সারা দেশ গোটা ফাগুন-চৈত্র মাস ধরে কোটি কোটি কণ্ঠে ডেকেও যার সাড়া পায়নি, 'রংমশালের দলে'র কাতর আরজি বেতারে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে শূন্যে ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই হল তার অভাবিত আবির্ভাব! উড়ল মেঘের কাজল-কালো পতাকা, বাজল ঘন ঘন বাজের দামামা, ফুটল বিজলির আলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ঝরল ঝরো ঝরো জলের ঝরনা! 'রংমশালের দলে'র বাহাদুরি আছে বই কি!

এরকম আশ্চর্য ব্যাপার আমার জীবনে আরও বার কয়েক ঘটেছে।

ছেলেবেলায় একদিন আমি ও আমার খুড়তুতো ভাই শক্তি আমাদের পাথুরেঘাটার বাড়ির ছাদের উপরে খেলা করছি। বাড়ির সামনেই তখন গলির ওপাশে ছিল ঘোষেদের লম্বা একতলা আস্তাবল-বাড়ি।

ছেলেমানুষির কোন খেয়ালে হঠাৎ বললুম, 'দেখ শক্তি, আমি যা বলব এখুনি তা ফলে যাবে!'

শক্তি বললে, 'ইস!'

—'বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখবি? আমি যদি বলি, তাহলে ওই আস্তাবল-বাড়ির ছাদ এখুনি ভেঙে পড়বে!'

কেন যে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বিশেষ করে ওই কথাটাই বেরুল তা জানি না, কিন্তু কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই সেই পাকা আস্তাবল-বাড়ির একাংশের ছাদ ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে!

শক্তি বিপুল বিস্ময়ে হাঁ করে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। আমি নিজেও রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলুম।

আর একদিনের কথা বলি। বছর উনিশ-বিশ আগেকার কথা।

আমার বাল্যবন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ হালদার ও আরও দুজন সঙ্গীর সঙ্গে পি, সেট কোম্পানির বাগানে (বোধ হয় দমদমায়) যাচ্ছি। সরু একটা পথ, তার একদিকে একটানা ঝোপঝাপ।

হঠাৎ কী মনে হল, বললুম, দেখ নরেন, এই ঝোপ থেকে এখনই যদি একটা সাপ বেরিয়ে পড়ে?'

নরেন কোনও জবাব দেবার আগেই পাশের ঝোপ থেকে ফস করে বেরিয়ে পড়ল মাঝারি আকারের একটা কালো সাপ! কী সাপ বুঝতে পারলুম না, কারণ দেখা দিয়েই সে বিদ্যুৎবেগে আবার ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল!

অবশ্য, এর মধ্যে আমার নিজের কোনও বাহাদুরি নেই। এই ধরনের ঘটনা প্রত্যেক মানুষের

---

*'রংমশাল' মাসিকপত্রের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিয়ে এই দলটি গঠিত।

জীবনেই ঘটে। হয়তো পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে আট-দশ বৎসর দেখা নেই, তার কথাও ভাবিনি। হঠাৎ একদিন অকারণেই তাকে মনে পড়ল এবং ঠিক সেইদিনেই হল তার আকস্মিক আবির্ভাব!

উপরে যে-দুটি ঘটনার উল্লেখ করলুম, ও-রকম ঘটনা আমার জীবনে আরও ঘটেছে, কিন্তু এখানে আর পুথি বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে 'রংমশালের দলে'র আবাহন গীতির সঙ্গে-সঙ্গেই কালবৈশাখীর বিস্ময়কর উদয় দেখে আর একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল।

আমি তখন বালক। মা-বাবার সঙ্গে থাকি সুদূর রাওলপিণ্ডির পে-অফিস লেনে। রাস্তাটির অস্তিত্ব এখনও আছে কি না জানি না, কিন্তু তখন সেখানে বাস করতেন প্রধানত বাঙালিরাই।

সেখানে একটি প্রাচীন ভদ্রলোক থাকতেন, তাঁর আসল নাম ভুলে গিয়েছি। কিন্তু মনে আছে, সবাই তাকে 'খুড়ো' বলে ডাকতেন।

খুড়োর ভারী গানের শখ ছিল, নিজেকে তানসেন-জাতীয় বলে মনে করতেন।

কিন্তু পাড়ার লোকের ধারণা ছিল অন্যরকম। কারণ প্রতিদিন যখন তানপুরো নিয়ে খুড়ো ভগ্নকণ্ঠে দীর্ঘকালব্যাপী আর্তনাদ বা সংগীতসাধনায় নিযুক্ত হতেন, তখন পাড়ার লোকের প্রাণের ও কানের অবস্থা হয়ে উঠত দস্তুরমতো ভয়াবহ।

এক সন্ধ্যায় খুড়ো তানপুরোর 'তবলি'তে চাঁটি মেরে গান ধরেছেন বিকট স্বরে। সে কী গান! পাড়ার কেউ কেউ আর সইতে না পেরে খুড়োর কাছে গিয়ে করলেন প্রবল প্রতিবাদ।

খুড়ো ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'তোমরা তো আচ্ছা অরসিক হে! জানো, সংগীতের মতন বিদ্যে নেই! জানো, আজ তিন মাস এখানে বৃষ্টি হয়নি?'

—'বৃষ্টি হয়নি তো হয়েছে কী?'

—'হয়েছে কী? বৃষ্টি হয়নি বলেই তো আমি 'মেঘমল্লার' ধরেছি!'

'যাও যাও খুড়ো, বাজে বোকো না। তোমার গান শুনলে বৃষ্টিও পালাবার পথ খুঁজে পাবে না! ওই গানে বৃষ্টি আসবে!'

—'কী! আসবে না? জানো তানসেন 'দীপক' গাইলেই আগুন জ্বলত, মল্লার ধরলে বৃষ্টি পড়ত?'

—'থো করো খুড়ো, তানসেনের কথা থো করো! আমাদের কথা হচ্ছে, তোমার গান আর সহ্য করা অসম্ভব। আমরা হয় প্রাণে মারা পড়ব, নয় পাগল হয়ে যাব?'

—পাড়ার লোকের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রেই এল ঝমঝম করে জল।

শেষ রাতে আমাদের বাড়ির সদর-দরজার কড়া এমন বিষম উৎসাহে নড়তে লাগল যে, বিছানা ছেড়ে উঠে বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

দরজা খুলেই দেখা গেল লণ্ঠনধারী খুড়োকে।

—'কী খুড়ো, ব্যাপার কী? কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি?'

—'বলি, আরও চাই নাকি?'

—'কী আরও চাইব?'

—'কী আবার! বৃষ্টি হে, বৃষ্টি! আমার মেঘমল্লারের মাহাত্ম্যটা দেখলে তো? বৃষ্টিকে কান ধরে টেনে এনেছি—বুঝলে হে?' বলতে বলতে খুড়ো চলে গেলেন এবং তারপরেই পাশের বাড়ির দরজায় বেজে উঠল কড়াজোড়া।

পরদিন সকালে উঠে শুনলুম, সে-পাড়ার কোনও বাড়ির কড়াই সে-রাত খুড়োর কবল থেকে অব্যাহতি লাভ করেনি।

এতদিনে খুড়ো নিশ্চয়ই লোকান্তরে গমন করেছেন। পৃথিবীকে বঞ্চিত করে হয়তো তিনি ধন্য করেছেন স্বর্গসভাকে। কিন্তু মাভৈ, চিন্তারও কারণ নেই। খুড়ো নেই, আমাদের 'রংমশালের দল' আছে, অনাবৃষ্টির সময়ে তোমরা এই দলটিকে গান গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ কোরো।

আলেকজেন্ডার দি গ্রেট

প্রথম অধ্যায়

গ্রিস ও ভারত

আলেকজেন্ডার হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম দিগ্বিজয়ী।

তাঁর আগে আর কোনও বীর দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেননি এমন কথা বলছি না। প্রাচীন মিশর, বাবিলন, আসিরিয়া, ভারত ও পারস্য প্রভৃতি দেশের ইতিহাস পড়লে আরও কয়েকজন দিগ্বিজয়ীর নাম জানা যায়। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ও দিগ্বিজয়ের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। তাঁদের আদর্শবাদও তেমন উচ্চ ছিল না। এবং তাঁদের দিগ্বিজয়ের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে যুগান্তরও উপস্থিত হয়নি।

তিন বা একাধিক মহাদেশের উপরে যাঁরা ধূমকেতুর মতন ছুটে গিয়েছেন এবং যাঁরা আজ পর্যন্ত মানুষের চিন্তার রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে আছেন—যেমন আলেকজেন্ডার, হ্যানিবল, সিজার, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং ও নেপোলিয়ন—যথার্থ দিগ্বিজয়ী বলি তাঁদের। কারণ এঁদের দিগ্বিজয়ের পিছনে ছিল এক-এক শ্রেণির আদর্শবাদ। এঁদের মধ্যেই সর্বপ্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আলেকজেন্ডার।

ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা। আলেকজেন্ডারের যুগে মানুষ এই তিনটির বেশি মহাদেশের নাম জানত না। এবং তিন মহাদেশেই এমন অনেক জায়গা ছিল, যা তখনও পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির অন্তর্গত ছিল না। আজ ইংরেজ, জাপান, আমেরিকান, রোম্যান, জার্মান, ফরাসি ও স্পেনীয় প্রভৃতি কত জাতির কথাই শুনতে পাই। কিন্তু তখন তাদের নামকরণ পর্যন্ত হয়নি। তাদের দেশ ছিল ঘৃণ্য বর্বরদের দেশ। অনেক দেশ তখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তখনকার মানচিত্রে সেসব দেশের স্থান পর্যন্ত ছিল না।

কিন্তু যেসব দেশ তখন সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল, আলেকজেন্ডারের কবল থেকে তারা কেহই মুক্তি পায়নি। এমনকি তখনকার দিনে গ্রিকদের পক্ষে অতি দুর্গম ও দূরদেশ ভারতবর্ষেও তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। যদিও তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজার (ধননন্দ) সঙ্গে তাঁর শক্তিপরীক্ষা হয়নি এবং ভীত সৈনিক ও সেনাপতিদের বিদ্রোহিতায় অধিকাংশ ভারতবর্ষকে নাগালের বাইরে রেখেই তাঁকে প্রত্যাগমন করতে হয়েছিল, তবু তিনি বিজয়পতাকা তুলে যেটুকু অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, সে যুগের পক্ষে তাইই ছিল কল্পনাতীত, অসম্ভব ব্যাপার!

আলেকজেন্ডারের কাছে একটি কারণে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। তাঁর ভারত অভিযানের ফলেই ভারতবর্ষের সত্যিকার ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয়েছে।

আলেকজেন্ডারের আগমনের অনেক আগেই ভারতবর্ষ যে সভ্যতার শীর্ষস্থানে উঠেছিল, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসীরা এক বিষয়ে রীতিমতো পশ্চাৎপদ ছিলেন। লিখিত ইতিহাস বলতে আজ আমরা যা বুঝি, প্রাচীন ভারতবর্ষে কেউ তা রচনা করেনি। কাব্য, পুরাণ, নাটক বা অন্যান্য গ্রন্থে আমরা ভারতীয় ইতিহাসের অনেক মালমশলা পাই বটে, কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত আগোছালো অবস্থায় এমন নানা বিষয়ের সঙ্গে মিশিয়ে আছে যে, তাদের ভিতর থেকে সত্যিকার মানুষকে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কবির কল্পনা ও অবাস্তব প্রলাপ বলে মেনে নিলে আর কোনও গোলমালই থাকে না; কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক সত্য রূপে দেখাতে গেলেই আমাদের সহজ-বুদ্ধি বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায়। রাম, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম ও অর্জুন প্রভৃতি নামধারী ঐতিহাসিক ব্যক্তি যে ছিলেন না, একথা কে জোর করে

বলতে পারে? কিন্তু কবির আকাশচারী কল্পনা ও অবাস্তব অত্যুক্তি তাঁদের মনুষ্যত্বকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, ওঁদের আর সত্যিকার মানুষ বলে মনে হয় না এবং সকলেই জানেন, ইতিহাস হচ্ছে সত্যিকার মানুষদেরই কীর্তিকাহিনি।

উপরন্তু প্রাচীন ভারতীয় লেখকরা ধরতে গেলে সাল-তারিখের কোনও ধারই ধারতেন না। সাল-তারিখ ভুললে ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় উপহাস। বেশিদিনের কথা নয়, স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ি বহু খণ্ডে বিভক্ত প্রকাণ্ড একখানি 'পৃথিবীর ইতিহাস' রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা বলতে গিয়ে তিনি গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে ধরে নিয়েছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত বলে। অথচ ভারতের প্রথম সম্রাট, গ্রিকবিজয়ী মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ছিল সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান! এই দুই সম্রাটের মাঝখানে হয়েছে কত বংশের উত্থান ও পতন এবং ভারতবর্ষের উপরে পড়েছে একাধিকবার অন্ধ যুগের কালো যবনিকা।

আজকাল ভারতের নানা প্রদেশে হাজার হাজার শিলা বা তাম্রলিপি ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে বা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা তাদের পাঠ উদ্ধার করে এতকাল পরে ইতিহাসপূর্ব যুগের অনেক সাল-তারিখ ও গুপ্তরহস্য আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওসব লিপি বা মুদ্রা প্রভৃতি ইতিহাস রচনার জন্যে প্রস্তুত হয়নি।

আলেকজেন্ডারের ভারত অভিযানের ফলেই ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়েছে সত্যিকারের ঐতিহাসিক যুগ। আলেকজেন্ডারের আগেও গ্রিসের সঙ্গে যে ভারতবর্ষের সম্পর্ক একেবারেই ছিল না, তা নয়; তাঁরও অনেক আগে (খ্রি. পূ. ৫১০) স্কাইল্যাক্স নামে এক গ্রিক ভ্রমণকারী ভারতে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন। ভারতীয় সৈনিকরাও পারস্য সম্রাট দরায়ুসের পক্ষাবলম্বন করে গ্রিসে গিয়ে যুদ্ধ করে এসেছে। এমনি ভাবে আরও কোনও কোনও দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গ গ্রিসের অল্পস্বল্প পরিচয় সাধন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এটুকু পরিচয়ের দাম খুব বেশি ছিল না। গ্রিকরা তখনও ভারতকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাত না।

কিন্তু আলেকজেন্ডারের অভিযানের পরেই গ্রিকরা ভারতবর্ষকে সর্বপ্রথমে ভালো করে চিনতে পারলে। তার ফলে নানা গ্রিক-লেখক ও ভ্রমণকারী স্বচক্ষে ভারতবর্ষকে দেখে তখনকার কথা নিয়ে আলোচনা করে গিয়েছেন। এর পরে ভারতের দৃষ্টি হয়ে পড়ে সুদূর প্রসারিত। তারপর নানা যুগে নানা দেশি ভ্রমণকারী এসে ভারতের অনেক উজ্জ্বল ছবি এঁকে গিয়েছেন। এইসব ছবির ভিতর থেকেই প্রাচীন আর্যাবর্তের অখণ্ড না হোক—কতকটা সম্পূর্ণ ইতিহাস ও সাল-তারিখ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে গিয়েছে বটে, কিন্তু বহু স্থলেই ফাঁকগুলি পূর্ণ করতে পারা গিয়েছে প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রা প্রভৃতির দ্বারা। আলেকজেন্ডার এদেশে না এলে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এমন ভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারা যেত না।

আলেকজেন্ডার ভারত ত্যাগ করবার পরেই সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গ্রিকদের আর্যাবর্ত থেকে বিতাড়িত করলেন বটে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে গ্রিসের সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়নি। আলেকজেন্ডারের সেনাপতি সেলিউকসের মেয়েকে চন্দ্রগুপ্ত নিজে বিবাহ করেন। তাঁর সভায় বর্তমান থাকেন গ্রিক-রাজদূত মেগাস্থিনিস। তাঁর দেহরক্ষীরূপে নিযুক্ত থাকে অনেক গ্রিকনারী! এবং বিজয়ী রূপে না হোক, বিভিন্ন কাজ নিয়ে শতশত গ্রিক যে মৌর্যযুগের ভারতবর্ষে বাস করত, এটুকু আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোক অনেক ভারতবাসীকেও গ্রিসে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর কী ফল হয়েছিল জানি না, তবে এটা দেখতে পাই যে, মৌর্য-রাজশক্তির

[illegible] বেশিকাল পরে (খ্রি. পূ. ২০) গ্রিসের প্রধান নগর এথেন্সে একজন ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্মের মহিমা দেখাবার জন্যে জ্বলন্ত চিতায় স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিচ্ছেন!

ভারতের নাট্যশালা থেকে মৌর্য-নৃপতিরা চিরবিদায় নেবার পরে ভারতবর্ষের উপরে আবার গ্রিক প্রভাব বাড়তে থাকে। ভারতের প্রান্তদেশে এবং উত্তর ভারতে একাধিক গ্রিক নরপতি রাজত্ব করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন মেনান্ডার—এঁর জয়পতাকা প্রায় পাটলিপুত্রের (বর্তমান পাটনা) কাছ পর্যন্ত এসে পড়েছিল এবং ইনি ও এঁর সমস্ত গ্রিক সভাসদ বৌদ্ধধর্ম পর্যন্ত অবলম্বন করেছিলেন (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে)। এরই কয়েক বৎসর পরে দেখি, তক্ষশিলার (বর্তমান পেশোয়ার অঞ্চল) অধিবাসী গ্রিক-রাজদূত হেলিয়োডোরাস হিন্দুধর্ম অবলম্বন করে বাসুদেবের নামে একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করছেন! 'বেসনগর স্তম্ভ' নাম নিয়ে সেটি আজও বিদ্যমান আছে। এইসব দৃষ্টান্ত দেখেই বোঝা যায়, আলেকজেন্ডারের পরবর্তী কালে গ্রিকরা নিজেদের কেবল ভারতবাসী বলেই মনে করতেন না, তাঁরা ভারতীয় ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করতে ছাড়েননি।

বহু ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে, গ্রিকদের আগমনের আগে ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। হিন্দু ও বৌদ্ধরা নাকি মূর্তি গড়তে ও মন্দির তৈয়ারি করতে শেখেন গ্রিকদের কাছ থেকেই। অথচ এখনকার ইউরোপীয় গ্রিকদের মাথার করে রাখলেও পৌত্তলিক বর্বর বলে ঘৃণা করেন হিন্দুদেরই!

ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পও এক সময়ে আশ্রয় নিয়েছিল গ্রিক শিল্পীদের কাছে। তার ফলে উত্তর ভারতের বিখ্যাত গান্ধার ভাস্কর্যের আবির্ভাব। পরবর্তী যুগে এই ভাস্কর্য কেমন করে ভারতের নিজস্ব শিল্প হয়ে উঠেছিল, এখানে সবিস্তারে তা দেখাবার দরকার নেই।

সংস্কৃত ভাষায় আজও কিছু কিছু গ্রিক শব্দ বর্তমান আছে। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যেরও উপরে অল্পস্বল্প গ্রিক প্রভাব থাকতে পারে। কেউ কেউ বলেন, নেই।

কিন্তু যাঁরা প্রথম হিন্দু-জ্যোতির্বিজ্ঞান রচনা করে গেছেন তারা যে গ্রিকদেরই শিষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গার্গী-সংহিতায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে : 'যবনরা (গ্রিকরা) বর্বর বটে, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম প্রকাশ হয়েছে তাদের মধ্যেই। এবং এই কারণে তাদের দেবতা বলে ভক্তি করা উচিত।'

আলেকজেন্ডারের ভারত অভিযানের ফলেই আর্যাবর্তের জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে এসেছে এমনি উন্নতিমূলক নানা পরিবর্তন। তিনি সাহস করে অগ্রবর্তী না হলে আর কোনও গ্রিক যে এই বিপদসঙ্কুল পথে পদার্পণ করতেন না, সে কথা নিশ্চিত রূপেই বলা যায়।

ভারতবর্ষের উপরে রক্তাক্ত খড়্গ তুলে এসে দাঁড়িয়েছেন আরও কত দিগ্বিজয়ী! তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন তাতার তৈমুর লং, গজনীর মামুদ, পারসি নাদির শা ও আফগান আহম্মদ শা আবদালি! কিন্তু তাঁদের অভিযানের ফলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে শুধু রক্ত-সাগরের তরঙ্গ। বারংবার ভারতের সোনার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে তাঁরা দস্যুর মতন অদৃশ্য হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে ভারত পায়নি কোনও দান। তাঁরা ডাকাতি করেছেন মাত্র, মানবতার পরিচয় দেননি।

আলেকজেন্ডার রক্তলোভী দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ঠুর হলেও আদর্শবাদী ছিলেন। পরে দেখাব, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের মধুর মিলন সাধন করবার জন্যে তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল কতখানি প্রবল!

দ্বিতীয় অধ্যায়

যবনিকার অন্তরালে

হঠাৎ পৃথিবী জয় করবার বাসনা হল, অমনি সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে যুদ্ধসাজ পরে 'মারমার' রবে পথে বেরিয়ে পড়লুম—আলেকজেন্ডারের দিগ্বিজয়ের মুলে এ নীতি কাজ করেনি কোনওদিন।

আলেকজেন্ডারের ঠিক পরেই পৃথিবী যে দিগ্বিজয়ীকে প্রসব করেছিল তাঁর নাম হচ্ছে হানিবল। তিনি আফ্রিকার অধুনালুপ্ত কার্থেজের (বর্তমান টিউনিসের নিকটবর্তী) বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম হামিলকার।

খ্রিস্টপূর্ব ২৩৮ বৎসরের কথা। ভারতে তখন সম্রাট অশোক রাজত্ব করছেন। গ্রিসের বদলে, ইউরোপের কর্তা তখন রোম। এবং রোম হচ্ছে কার্থেজের মহাশত্রু।

কার্থেজের বিখ্যাত সেনাপতি হামিলকার বাআলদেবতার মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছেন—সঙ্গে ছেলে হানিবল, বয়স তাঁর মোটে নয় বৎসর।

পূজা শেষ করে পিতা ডাকলেন, 'হানিবল!'

হানিবল এগিয়ে এলেন।

—'হানিবল! তুমি আমার সঙ্গে অভিযানে যাত্রা করতে চাও?'

—'হ্যাঁ বাবা!'

—'তাহলে দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করো।'

—'কী শপথ বাবা?'

—'শপথ করো, যতদিন বাঁচবে ততদিন রোমকে শত্রু বলে মনে করবে?'

—'শপথ করছি বাবা, রোম হবে আমার চিরশত্রু।'

নয় বছর বয়সে হানিবল যে প্রতিজ্ঞা করলেন, আজীবন তার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বারংবার দর্পী রোমের গর্ব চূর্ণ করে বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন, তবু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেননি।

আলেকজেন্ডারের মূলেও আছে অনেকটা এইরকম ব্যাপার। কিন্তু সেটা বুঝতে গেলে আমাদের আরও কিছুকাল পিছিয়ে যেতে হবে।

খ্রিস্ট জন্মাবার প্রায় পাঁচ শত বৎসর আগেকার কথা। তার কিছুকাল আগে ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার করে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেছেন। অজাতশত্রুর পৌত্র উদয় তখন হিন্দুস্থানের রাজধানী পাটলিপুত্রের সিংহাসনে।

পারস্যের সম্রাট প্রথম দরায়ুস তখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট—তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার অধীশ্বর। কেবলমাত্র এশিয়ার চিন ও আফ্রিকার কার্থেজ ছিল তাঁর নাগালের বাইরে। উত্তর ভারতের সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশও তাঁর অধিকারভুক্ত।

গ্রিস বলতে বোঝাত তখন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং তাদের মধ্যে প্রধান ছিল এথেন্স।

দরায়ুসের অধীনস্থ গ্রিক রাজ্য ও প্রজারও অভাব ছিল না। হঠাৎ তারা বিদ্রোহী হল এবং এথেন্স করলে সেই বিদ্রোহে সাহায্য।

কোথায় 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' বা 'রাজার রাজা' দরায়ুস, আর কোথায় তুচ্ছ, নগণ্য এথেন্স! গ্রিকদের বিরুদ্ধে দরায়ুস পাঠিয়ে দিলেন এক বিপুল বাহিনী। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের এই প্রথম শক্তি পরীক্ষা।

কিন্তু প্রথম পরীক্ষায় দরায়ুস শোচনীয় রূপে হেরে গেলেন, বিখ্যাত মারাথন প্রান্তরে।

কিছু কাল যায়। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে এক অধিকতর বিপুল বাহিনী গঠন করতে করতে দরায়ুস মারা পড়লেন। সম্রাট হলেন তাঁর ছেলে জ্বের্ক্সেস (Xerxes)।

পিতার কর্তব্য পালন করবার জন্য পুত্র অগ্রসর হলেন। জ্বের্ক্সেস গ্রিস আক্রমণ করলেন—তাঁর সঙ্গে ভারতীয় ধনুকধারী সৈন্যরাও ছিল। এইসময়ে বা কিছু পরে ভারতে মগধের সিংহাসন লাভ করেন নন্দ বংশের প্রথম রাজা।

গ্রিসের নানা রাষ্ট্র একজোট হয়ে বাধা দিতে এল। প্রথম যুদ্ধ হল থার্মাপলির গিরিসঙ্কটে—যার নাম যুগে যুগে গ্রিক-বীরত্বকে অমর করে রেখেছে। কিন্তু বীরত্ব ফলপ্রদ হল না। নায়ক লিওনিডাস ও তাঁর দলভুক্ত গ্রিকদের মৃত্যু-শয্যার উপর দিয়ে গ্রিসের উপরে ভেঙে পড়ল পারস্যবাহিনী, বাঁধ-ভাঙা সমুদ্র-তরঙ্গের মতো।

জলপথে গ্রিকরা জয়লাভ করেও বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারলে না। কারণ স্থলপথে অগ্রসর হয়ে পারস্যবাহিনী বেশ কিছুকাল ধরে অধিকাংশ গ্রিস দখল করে রইল।

কিন্তু তারপর প্লাতায়ার যুদ্ধে আবার হল পারস্যের পরাজয়। এই যুদ্ধে বিশেষ রূপে প্রমাণিত হল, পারসিরা সংখ্যায় অগণ্য হলেও রণকৌশলে, অস্ত্রশস্ত্রে ও সৈন্যচালনায় গ্রিকদের সমকক্ষ নয়।

পারসিরা ইউরোপ ছেড়ে আবার এশিয়ায় নিজেদের স্বদেশে ফিরে গেল বটে, কিন্তু তারা যে এতকাল ধরে গ্রিসের অধিকাংশ গ্রাস করে বসেছিল, গ্রিকরা এ অপমান ভুলতে পারলে না।

তবু উপায় নেই। ক্ষুদ্র গ্রিস যে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, এইটুকুই হচ্ছে আশ্চর্য ও যথেষ্ট; এশিয়ায় গিয়ে পারস্য আক্রমণ করবার শক্তি তাদের নেই। কাজেই গ্রিকরা মনের রাগ মনেই পুষতে লাগল।

আবার কিছুকাল যায়। তারপর এল খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৯। গ্রিসের উত্তরে মাসিডনিয়া রাজ্য। এ দেশটি নিজ গ্রিসের যে-কোনও রাষ্ট্রের চেয়ে ঢের বড়ো হলেও এবং এর বাসিন্দারা গ্রিকজাতিভুক্ত হলেও সামাজিক সম্মানে ছিল যথেষ্ট নিচু। এথেন্স ও স্পার্টা প্রভৃতি দেশের গ্রিকরা মাসিডনিয়ার লোকদের কুলীন বলে গ্রাহ্য করত না, বরং তাদের অর্ধ গ্রিক ও অর্ধ বর্বর বলে মনে মনে, এমনকি প্রকাশ্যেও, ঘৃণা করতে ছাড়ত না।

মাসিডনিয়ার রাজা পার্ডিকাস যুদ্ধে মারা পড়লেন। তাঁর একমাত্র ছেলে আমিনটাস হচ্ছেন শিশু। নাবালক রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রতিনিধিনৃপ রূপে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন মৃত রাজার ছোটোভাই ফিলিপ। তিনি যুবক, বয়স তেইশ বৎসর মাত্র। তাঁর নিজের ছেলের নাম আলেকজেন্ডার—বয়স বছর তিনেক।

ফিলিপ বয়সে তরুণ হলেও, তাঁর মনের ভিতরে ছিল প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং প্রথম শ্রেণির সামরিক জ্ঞান। তিনি গ্রিসের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ এপামিননডাসের কাছ থেকে যুদ্ধনীতিতে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

এতদিন মাসিডন কুলীন গ্রিক রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ এক বলে মনে করবার অবসর পায়নি, সে তার উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পেয়োনিয়া ও ইল্লিরিয়ার পার্বত্য-জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছিল।

রাজ্যচালনার ক্ষমতা হাতে পেয়েই ফিলিপ নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তা হচ্ছে প্রথমত, একদল সৈন্যকে নূতন রণকৌশলে শিক্ষিত করে তোলা। দ্বিতীয়ত, পেয়োনিয়া ও ইল্লিরিয়াকে সম্পূর্ণরূপে দমন। তৃতীয়ত, মাসিডনকে কুলীনশ্রেণিতে উন্নত করা। চতুর্থত, ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গ্রিক রাষ্ট্রগুলিকে একতা

বন্ধনে বেঁধে, তাদের মধ্যে মাসিডনকে প্রধান করে তোলা। পঞ্চমত, গ্রিসের সবচেয়ে বড়ো শত্রু পারস্যকে পদদলিত করা।

অপাঙ্‌ক্তেয় মাসিডনের নবীন এক প্রতিনিধিনৃপের পক্ষে এতবড়ো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হয়তো হাস্যকর। কিন্তু ফিলিপ ছিলেন ভাগ্যদেবীর বরপুত্র। তাঁর কাছে কিছুই অসম্ভব ছিল না।

সারা শীতকাল ধরে সৈন্যদের যুদ্ধশিক্ষা নিয়ে তিনি নিযুক্ত হয়ে রইলেন। যে সে শিক্ষা নয়—নূতন ধরণের শিক্ষা।

এতদিন যেসব গ্রিক পদাতিক গুরুভার অস্ত্রধারণ করত, তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। কিন্তু ফিলিপ রচনা করলেন নূতন এক 'ঘনব্যূহ' বা 'ফেল্যাক্স' (Phalanx)। এক একটি ঘনব্যূহ রচিত হল ষোলো সার সৈন্য নিয়ে। রণক্ষেত্রে তারা দাঁড়াবে একেবারে পরস্পরের সঙ্গে গা মিশিয়ে এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে আঠারো ফুট লম্বা বর্শা।

তারপর তিনি সেনাদলের দুই পার্শ্বে ঘন সন্নিবিষ্ট গুরুভার অস্ত্রধারী অশ্বারোহীদের রাখবার ব্যবস্থা করলেন। তারা প্রকাণ্ড এক এক খণ্ড নিরেট পর্বতচূড়ার মতন শত্রুদের দুই দিকে ভেঙে পড়বে।

অর্থাৎ মাঝখানকার ঘনব্যূহের পদাতিকরা যখন অখণ্ড প্রস্তর প্রাচীরের মতন শত্রু আক্রমণ সহ্য করবে, তাদের দুই পাশের ঘন সন্নিবিষ্ট অশ্বারোহীদল তখন প্রবল পরাক্রমে করবে শত্রুদের আক্রমণ। তখনকার যুগে এ শ্রেণির রণকৌশল ছিল সম্পূর্ণ নূতন ও কল্পনাতীত।

সৈন্যদল প্রস্তুত হল। ফিলিপ তাদের নিয়ে পেয়োনিয়া ও ইল্লিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। পার্বত্য জাতিরা উড়ে গেল ঝড়ের মুখে কুটোর মতো। ফিলিপের নূতন সৈন্যদল অদম্য!

এথেন্স, স্পার্টা ও থিব্‌জ প্রভৃতি গ্রিকরাষ্ট্র মাসিডনকে ঘৃণা করে। খালি ঘৃণা নয়, সুবিধা পেলে তারা শত্রুতা করতেও ছাড়ে না। এইবারে তাদের মন ফেরাতে হবে। কিন্তু তার আগে চাই টাকা। মাসিডন হচ্ছে গরিব। আকারে বড়ো হলেও তার দারিদ্র্যের জন্যে কেউ তাকে শ্রদ্ধা করবে না।

মাসিডনের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত থ্রেস। এখন ওদেশটি গ্রিসের অন্তর্গত বটে, কিন্তু তখন প্রাচীন গ্রিকদের মতে ওটি ছিল বর্বরদের দেশ।

থ্রেসের প্রান্তদেশে পতিত অবস্থায় অনেক মূল্যবান খনি ছিল। ফিলিপ থ্রেসিয়ানদের মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে সেসব খনি হস্তগত করলেন। তারপর কিছুকাল যেতে না যেতেই মাসিডনের ভাণ্ডারে ঐশ্বর্য আর ধরে না। মাসিডন এখন সমগ্র গ্রিসের মধ্যে ধনগৌরবে শ্রেষ্ঠ।

ভ্রাতুষ্পুত্র আমিনটাস ক্রমেই বড়ো হচ্ছে। সে সাবালক হলে ফিলিপের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হবে না। কোনওরকম গোলমাল না করে তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ফিলিপ নিজের মাথায় পরলেন রাজমুকুট। তাঁর যোগ্যতায় প্রজারা সন্তুষ্ট ছিল, কেউ আপত্তি তুললে না। পরে ফিলিপ নিজের মেয়ের সঙ্গে আমিনটাসের বিবাহ দিলেন। দুই দিক রক্ষা করা হল।

এইবার ফিলিপ গ্রিক রাষ্ট্রগুলির ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন। আমরা ফিলিপের জীবনচরিত লিখতে বসিনি, সুতরাং সবিস্তারে ওসব কথা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। সংক্ষেপে বললেই চলবে।

নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপারে ফিলিপের মুরুব্বিয়ানা কুলীন গ্রিকদের ভালো লাগল না। কয়েকটি রাষ্ট্র মারমুখো হয়ে উঠল—তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে এথেন্স। তারা দল বেঁধে সৈন্য সংগ্রহ করে ফিলিপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হল।

এখনও সময় হয়নি বুঝে ফিলিপ পিছিয়ে এলেন। তাঁর সৈন্যবল প্রচুর নয়। তিনি চুপিচুপি শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

এথেন্সের গুপ্তচররা সে খবর যথাস্থানে পৌঁছে দিতে দেরি করলে না। সেখানে ভয়ের সাড়া পড়ে গেল। এথেন্সের অমর বাগ্মী ডিমসথেনেস চারিদিকে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন—'ফিলিপ সারা গ্রিসকে গোলাম করে রাখতে চান। অর্ধ-বর্বর ফিলিপ গ্রিসের শত্রু—পারস্যের চেয়ে বড়ো শত্রু!'

কিন্তু ফিলিপের ইচ্ছা ছিল একেবারে উলটো। তিনি গ্রিক অভিজাতদের মধ্যে সমকক্ষের মতন আদর পেতে চান। তিনি তাঁর দেশকে গ্রিসের মধ্যে অদ্বিতীয় করে তুলতে চান বটে, কিন্তু এথেন্সকে ভক্তি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তিনি চান সমস্ত গ্রিককে একগোষ্ঠীভুক্ত করে চিরশত্রু পারস্যের গর্ব খর্ব করতে। অবশ্য এই অভিযানে নায়ক হতে চান তিনিই নিজে, কারণ নায়ক হবার যোগ্যতা তখন আর কোনও গ্রিকের ছিল না। মাথার উপরে পারস্যের মতন বলবান ও বৃহৎ শত্রু নিয়ে ছোটো ছোটো গ্রিক রাষ্ট্রগুলি তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটি নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে—এ দৃশ্য ফিলিপের পক্ষে অসহনীয়।

কিন্তু ফিলিপের এই স্বদেশপ্রীতি ও আদর্শবাদের মহিমা অন্যান্য গ্রিক রাষ্ট্রপতিরা উপলব্ধি করতে পারলে না। ডিমোসথেনেসের বক্তৃতা ক্রমেই বেশি বিষোদগার করতে লাগল। কোনও কোনও রাষ্ট্র ফিলিপের দলভুক্ত হতে চাইলেই এথেন্স দিতে লাগল বাধার পর বাধা।

ফিলিপ তখন বাধ্য হয়ে কৌলীন্যগর্বিত গ্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। ইতিমধ্যে তিনি রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন।

থিব্‌জ ও এথেন্স সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল। ফিলিপ জয়লাভ করেই তুষ্ট হলেন, পরাজিত শত্রুর উপরে কোনও অত্যাচার করলেন না। তাঁর সন্ধির শর্তও হল উদার।

তখন সমগ্র গ্রিস ফিলিপকে একমাত্র নায়ক বলে স্বীকার করতে বাধ্য হল। ফিলিপের মনের বাসনা পূর্ণ। আজ তিনি কুলীন—আজ তিনি সর্বেসর্বা!

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষ-তৈরির কারখানায়

আমাদের নায়ক আলেকজেন্ডারের কথা বলবার সময় এসেছে। এতক্ষণ ফিলিপের কথা বললুম, আলেকজেন্ডার কেমন বাপের ছেলে তাই দেখাবার জন্যে। ফিলিপের মতন বাপ না পেলে আলেকজেন্ডার কোনওদিনই পৃথিবীজয়ী হতে পারতেন না। ছেলের জন্যে ফিলিপ সমস্ত জমিই তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন।

এইবারে দেখা যাক, তাঁর মা কেমনধারা? পৃথিবীতে যাঁরা মহাপ্রতিভার অবতার ও মহামানুষ বলে অমর হয়ে আছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, তাঁদের জননীরা ছিলেন অসাধারণ নারী।

আলেকজেন্ডারের জননীও ছিলেন এই শ্রেণির। তাঁর নাম ওলিম্পিয়াস। তিনি উত্তর গ্রিসের এপিরাসের রাজার মেয়ে।

ওলিম্পিয়াসের মন ছিল স্বপ্নকুহকময় ও ভাবপ্রবণ। মাঝে মাঝে ধর্মোন্মাদে তিনি উদ্দাম হয়ে উঠতেন। মাঝে মাঝে রাগে পাগলের মতন হয়ে যেতেন। মায়ের চরিত্রের এইসব দোষগুণ ছেলের চরিত্রেও দেখা গিয়েছিল।

ওলিম্পিয়াস ছিলেন ধর্মের ক্ষেত্রে ধ্যানরহস্যের অনুগামী। এক শ্রেণির তান্ত্রিকদের প্রভাব ছিল তাঁর উপরে প্রবল। আলেকজেন্ডার সম্বন্ধেও ওই কথা বলা যায়। ওলিম্পিয়াস কারুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারতেন না। আলেকজেন্ডারও তাই।

এ শ্রেণির স্ত্রী নিয়ে ঘর করা কঠিন। ফিলিপও পারলেন না। তিনি মাসিডনের আর এক রাজকন্যাকে প্রাসাদে এনে রাখলেন। সেকালে গ্রিসে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল।

আলেকজেন্ডার মাকে ভক্তি করতেন দেবীর মতো। বাবা তাঁর মাকে অবহেলা করবেন, এটা তিনি সইতে পারলেন না। তিনি বাবার সঙ্গে করলেন ঝগড়া। তারপর মাকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

এক কিছুকাল পরে তিনি যখন রাজা হয়ে এশিয়ায় যাত্রা করেন, তখন নিজের প্রতিনিধিরূপে মাসিডনে রেখে যান আন্টিপেটার নামে এক রাজকর্মচারীকে।

একদিন আন্টিপেটারের কাছ থেকে অভিযোগ পত্র এল ঃ 'রাজা, আপনার মা রাজ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে বাধা দিচ্ছেন।'

পত্র পাঠ করে আলেকজেন্ডার ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কী, আমার মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ! আন্টিপেটারের মতন নির্বোধ জানে না যে, কোনও জননীর এককোঁটা চোখের জলে এমন দশহাজার পত্র কোথায় ভেসে যেতে পারে!'

মায়ের সঙ্গে আলেকজেন্ডারের সম্পর্কের কথা বলা হল। এইবারে তাঁর বাল্যবয়সের কথা কিছু কিছু বলি।

ফিলিপ কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়েও পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্যের কথা ভোলেননি।

তাঁর দৃষ্টি ও বুদ্ধি দুইই ছিল সমান তীক্ষ্ণ। বালক পুত্রের কথাবার্তা ও ধরনধারণ দেখেই তিনি বুঝলেন, এ কাঁচা বাঁশ নয়—একে নোয়ানো কঠিন। এর মন তেজে পরিপূর্ণ হলেও উচিতমতো শিক্ষার ব্যবস্থা করলে একে দিয়ে বড়ো কাজ করানো যাবে।

আরিস্টটলের নাম তখন গ্রিসের দেশে দেশে বিখ্যাত। প্লেটো তাঁর গুরু এবং গ্রিসে প্লেটোর পরেই তাঁর আসন। দর্শন-শাস্ত্র ও জীব-বিজ্ঞানে তাঁর তুলনা মেলে না। ফিলিপ তাঁকেই নির্বাচন করলেন পুত্রের শিক্ষকরূপে। আলোকজেন্ডারের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর। ফিলিপ যে ভুল নির্বাচন করেননি এবং আলেকজেন্ডার যে গুরুর মানরক্ষায় অক্ষম হননি, পৃথিবী চিরদিন মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকার করবে।

পিতার কাছ থেকে পুত্র লাভ করতে লাগলেন সামরিক শিক্ষা। বলা বাহুল্য, এবিভাগে ফিলিপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক গ্রিসে আর দ্বিতীয় ছিল না। পিতার কাছ থেকে তিনি আর একটি মস্ত গুণ পেয়েছিলেন। তা হচ্ছে দৃঢ়ব্রত।

তখন গ্রিসে ওলিম্পিক-ক্রীড়ার বড়ো ধূম। ওই খেলায় একটি প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল, রথের দৌড়।

ফিলিপের নিজের রথ এই দৌড়-প্রতিযোগিতায় যোগ দিত। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলেকজেন্ডার, তুমিও কি এই খেলায় যোগ দিতে চাও?'

আলেকজেন্ডার সগর্বে উত্তর দিলেন, 'হাঁ,—যদি রাজারাজড়াদের প্রতিযোগীরূপে পাই!'

আর একদিন বালক আলেকজেন্ডার নিজের দুঃসাহস ও পর্যবেক্ষণ—শক্তির পরিচয় দিলেন।

জনৈক অশ্ব-ব্যবসায়ী রাজসভায় একটি ঘোড়া বিক্রি করতে এসেছে। সেকালে যোদ্ধাদের কাছে ভালো ঘোড়ার দাম ছিল সোনাদানা ও মণিমুক্তারও চেয়ে বেশি। ব্যবসায়ী ঘোড়ার খুব চড়া দাম হাঁকলে।

ফিলিপ ঘোড়ায় চড়তে পটু এমন কয়েকজন লোককে ঘোড়াটিকে পরীক্ষা করতে বললেন।

কিন্তু সে হচ্ছে বিষম তেজি ঘোড়া! অনেক চেষ্টার পরেও তার পিঠে চড়ে কেউ তাকে বাগ মানাতে পারলে না। আরোহী পিঠে উঠলেই সে চার পা তুলে লাফালাফি করতে থাকে।

ফিলিপ বললেন, 'দূর করে দাও এই দস্যি ঘোড়াকে!'

বালক আলেকজেন্ডারও সেখানে হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি এ ঘোড়াকে বাগে আনতে পারি। এমন ঘোড়াকে হারানো উচিত নয়। রাজসভায় ভালো সওয়ার নেই।'

ফিলিপ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'এ তোমার আস্পর্দ্ধার কথা! আমার সভার পাকা যোদ্ধারা যা পারলে না, তুমি তা করতে পারবে?'

আলেকজেন্ডার বললেন, 'হ্যাঁ বাবা! ঘোড়ার যা দাম সেই টাকা আমি বাজি রাখতে রাজি আছি!'

ফিলিপ বললেন, 'তাই নাকি? বেশ, দেখা যাক!'

রাজসভার বড়ো বড়ো যোদ্ধারা বালকের বাচালতা দেখে উপহাসের হাসি হাসতে লাগল।

কিন্তু আলেকজেন্ডার একটুও দমলেন না। কারণ এতক্ষণ ধরে তিনি লক্ষ করছিলেন, ঘোড়াটা রয়েছে সূর্যের দিকে পিছন ফিরে এবং তার সামনের দিকে মাটির উপরে পড়েছে তার চঞ্চল ছায়া। সেই ছায়া দেখেই ঘোড়ার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

আলেকজেন্ডার এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিলেন সূর্যের দিকে। ফলে সে আর নিজের ছায়া দেখতে পেলে না।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি রাশ ধরলেন—কিন্তু জোরে টেনে নয়। তারপর তাঁর নির্দেশ মতো ঘোড়া পরম শান্তভাবে ছুটাছুটি করতে লাগল।

বালক-পুত্রের কীর্তি দেখে ফিলিপের আনন্দ আর ধরে না। বললেন, 'বৎস, তোমার যোগ্য কোনও বৃহৎ রাজ্য হস্তগত করো। এই ক্ষুদ্র মাসিডনে তোমাকে ধরবে না!'

এ কি কথার কথা? না, বিচক্ষণ পিতার ভবিষ্যদ্বাণী?

সেইদিন থেকে ঘোড়াটি হল আলেকজেন্ডারের নিজস্ব। তিনি তার নাম রাখলেন, 'বুকোফেলাস' বা 'ষণ্ডমুণ্ড'। তাঁর প্রত্যেক অভিযানে ঘোড়াটি সঙ্গী হত। সে ছিল তাঁর প্রিয় বন্ধু—এমনকি আত্মীয়ের মতো!

আরিস্টটল মানসিক চর্চায় আলেকজেন্ডারকে উৎসাহিত করে তুলতে লাগলেন। বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে প্রকৃতিকে দেখতে ও জানতে হয়। ভৈষজ্য সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতে ত্রুটি করলেন না। গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়ে আলেকজেন্ডার অত্যন্ত পুস্তকপ্রেমিক হয়ে উঠলেন। হোমারের কাব্য তাঁকে মাতিয়ে তুলত। আশ্চর্য নয়, কারণ ভবিষ্যতে যে পৃথিবীজয়ী হবে, হোমারের বীররস না হলে তার মনের ক্ষুধা মিটবে কেন?

তাঁর জীবনে এই পুস্তক-অনুরাগ বরাবরই লক্ষ করা গিয়েছে। তিনি যখন সুদূর এশিয়ার অন্তঃপুরে, যখন চারিদিকে তাঁর যুদ্ধ-কোলাহল, নবনব উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা, তখনও তাঁর দুর্লভ অবসর মুহূর্তগুলি কেটে যেত গভীর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে। সেই দূর প্রবাসেও তিনি স্বদেশ থেকে নিয়মিত ভাবে আনাতেন অন্যান্য বহু গ্রন্থের সঙ্গে ইস্কিলাস (Aeschylus), সোফোক্লেস (Sophocles) ও এইরিপিদেশের (Euripides) নাট্যকাব্যগুলি। এই পুস্তকানুরাগই প্রমাণিত করে, আলেকজেন্ডারের মন সাধারণ সংস্কৃতিহীন যোদ্ধার মতো ছিল না।

বন্ধুদের সঙ্গে খাবারের টেবিলের ধারে বসে কাটিয়ে দিতেন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা! এটা তাঁর

ভোজনবিলাসিতার লক্ষণ নয়। আহারে বসে তিনি অনেকক্ষণ ধরে নানা শ্রেণির গুণী ও রসিকদের সঙ্গে ধর্ম, ইতিহাস ও কাব্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে ভালোবাসতেন।

আগেই বলেছি, তিনি রণবিদ্যা শিখেছিলেন পিতার কাছ থেকে। ধরতে গেলে, আবাল্য তিনি মানুষ হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রেই এবং সৈনিকেরাই ছিল তাঁর সহচর। শিক্ষা পেয়েছেন তিনি হাতেনাতে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০ অব্দে তাঁর বয়স যোলো বৎসর। ফিলিপ স্থির করলেন, আলেকজেন্ডার নাবালক হলেও রাজার ছেলে, অতএব রাজ্যচালনা সম্বন্ধেও তাঁকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে।

বাইজানটিয়াস (এখনকার কনস্তান্তিনোপল) হচ্ছে থ্রেসের একটি বড়ো শহর, ফিলিপ তা অধিকার করার জন্যে যাত্রা করলেন এবং যাবার সময়ে আলেকজেন্ডারের হাতে দিয়ে গেলেন রাজ্য চালনার ভার।

আলেকজেন্ডার স্থির করলেন, বাবাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাঁর ছেলেও লড়াই করতে শিখেছে!

দেশের কাছাকাছি এক জায়গায় একটা জাতি বিদ্রোহী হয়েছিল। আলেকজেন্ডার তাদের বিরুদ্ধে সদলবলে করলেন যুদ্ধযাত্রা। বিদ্রোহীরা পরাজিত হল। তিনি তাদের শহর কেড়ে নিলেন। তারপর আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে নিজের নামে সেই শহরের নামকরণ করলেন। এই আত্মগর্ব থেকে তিনি কোনওদিনই মুক্তিলাভ করেননি। এর পরেও আফ্রিকায় ও এশিয়ায় আরও অনেক শহর পরিচিত হয়েছে তাঁর নিজের নামে।

যে যুদ্ধের ফলে ফিলিপ সমস্ত গ্রিসের একমাত্র নায়করূপে গণ্য হন, হাতিয়ার হাতে করে আলেকজেন্ডার সে যুদ্ধেও যোগ দিয়েছিলেন। এইভাবে পিতার চোখের সামনে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় ক্রমেই পরিপক্ক হয়ে উঠতে লাগলেন।

ফিলিপের মুখেই তিনি যে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা শুনেছিলেন, এটুকু অনুমান করা যেতে পারে। 'পারস্য হচ্ছে গ্রিসের চিরশত্রু। সে আবার গ্রিসকে আক্রমণ করবে। তার সঙ্গে গ্রিসের যুদ্ধ অনিবার্য। এবং এবারের যুদ্ধে হয় গ্রিস, নয় পারস্যকে একেবারে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে হবে। অতএব সমস্ত শক্তি একত্র করে আগেই আমাদের করতে হবে শত্রুকে আক্রমণ।'

ছেলেবেলা থেকেই আলেকজেন্ডার শুনে এসেছেন, পারস্যের কবলে পড়ে গ্রিসকে কত দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে। কাজেই শিশুবয়স থেকেই রোমের বিরুদ্ধে হানিবলের মতন তাঁরও মনের ভিতরে এই চিরশত্রুর বিরুদ্ধে একটা বিজাতীয় ক্রোধ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল। এবং হামিলকারের মতন ফিলিপও ছেলের হৃদয়ে জ্বালিয়ে তুললেন এই দারুণ হিংসার আগুন!

চতুর্থ অধ্যায়

সাপ আর সাপের ডিম

রাজা ফিলিপ গায়ের জোরে গ্রিসের রাষ্ট্রগুলিকে মাথা নত করতে বাধ্য করলেন। তাঁকে স্বীকার করলে না কেবল স্পার্টা।

কিন্তু মনে মনে কুলীন গ্রিকরা তাঁর শত্রু হয়েই রইলেন। ডিমোসথেনেস তো স্পষ্ট ভাষাতেই বলে বেড়াতে লাগলেন, 'ফিলিপকে গ্রিক বলাই যেতে পারে না। সে হচ্ছে যোলো আনা বর্বর।'

ডিমোসথেনেসের এ উক্তি হচ্ছে ভিত্তিহীন। মাসিডনের বাসিন্দারা গ্রিক ছাড়া আর কিছুই নয়। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেও আলেকজেন্ডার নামে মাসিডনের আর এক রাজা গ্রিকদের সঙ্গে গ্রিকের মতই পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

ডিমোসথেনেস চাইতেন, গ্রিসের মধ্যে সর্বপ্রধান হোক এথেন্স। এই স্বপ্নকে সফল হতে দিলেন না বলেই ফিলিপ পড়লেন তাঁর বিষ দৃষ্টিতে।

ফিলিপ কিন্তু এইসব বিরুদ্ধতাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন। স্পষ্ট কথা সহ্য করবার শক্তি তাঁর ছিল। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

সেকালকার গ্রিকরা অত্যন্ত মদ্যপান করতেন। ফিলিপও মাঝেমাঝে মদের মাত্রা বাড়িয়ে মত্ত হয়ে পড়তেন।

একদিন ফিলিপ মাতাল হয়ে বসে আছেন, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক কোনও বিষয় নিয়ে কী অভিযোগ করতে এল।

ফিলিপ তাকে ধমক দিয়ে বিদায় করতে চাইলেন।

স্ত্রীলোকটি বললে, 'আমি আপনার বিরুদ্ধে নালিস করব।'

ফিলিপ রাগে গর্জন করে বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে তুই কার কাছে নালিস করবি?'

স্ত্রীলোকটি বললে, 'অমাতাল ফিলিপের কাছে।'

ফিলিপ একেবারে চুপ।

ফিলিপ শত্রুকেও মিত্র করতে জানতেন। আর একটি গল্প শোনো।

একদিন ফিলিপের কাছে খবর এল, একজন সেনানী তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন।

পরামর্শদাতারা বললেন, 'লোকটাকে হয় প্রাণদণ্ড দেওয়া, নয় কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক।'

ফিলিপ বললেন, 'না। দেহের কোনও অংশে রোগ হলেই কি সেই অংশ কেটে ফেলা উচিত? আগে কি দেখা উচিত নয়, ওষুধ দিয়ে তা সারানো যায় কি না?'

ফিলিপ সেই চক্রান্তকারী সেনানীকে ডেকে আনালেন। তাকে আদর-যত্ন করলেন, উপহার দিলেন।

লজ্জিত সেনানী চলে গেল। সেইদিন থেকে সে হল ফিলিপের পরম ভক্ত। বাপের এ গুণও ছেলে পেয়েছিলেন আংশিক ভাবে।

গ্রিসের নায়ক হয়ে ফিলিপ তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো উচ্চাকাঙক্ষাকে মেটাবার জন্যে উদ্যোগ আয়োজনে নিযুক্ত হলেন। একটি মহাসভায় গ্রিসের সমস্ত রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করা হল। সবাই প্রতিনিধি পাঠালে—কেবল স্পার্টা ছাড়া (খ্রিঃ পূঃ ৩৩৭)।

সেই সভায় ফিলিপ সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে, চিরশত্রু পারস্যের বিরুদ্ধে সমগ্র গ্রিস যদি না এক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার সর্বনাশের সম্ভাবনা! পারস্যকে আগে আক্রমণ না করলে সেইই আমাদের আক্রমণ করবে।

রাষ্ট্র প্রতিনিধিরা প্রস্তাবটাকে মনে মনে পছন্দ না করলেও মুখে সায় দিতে বাধ্য হলেন। এবং কী কী উপায়ে প্রস্তাবটাকে কার্যে পরিণত করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হল—যদিও এ-আলোচনায় কারুরই বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না।

ফিলিপের পক্ষে প্রতিনিধিদের সম্মতিই হল যথেষ্ট। তাঁদের আগ্রহ থাক আর না থাক, ফিলিপের আগ্রহ জ্বলন্ত!

কোমর বেঁধে ফিলিপ কাজে লেগে গেলেন। সামরিক ব্যবস্থাপক ও রণকৌশলী ও সৈন্যচালক হিসাবে গ্রিসের মধ্যে তিনি তখন ছিলেন অদ্বিতীয়। তার উপরে গত মহাসভায় তিনি পেয়েছেন সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের ভার—কারুর নেই তাঁকে বাধা দেবার অধিকার।

পুরো বারো মাস ধরে চলল উদ্যোগ পর্ব।

আলেকজেন্ডারেরও চিত্তে তখন জাগ্রত হয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা! তিনি বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'পৃথিবীর সমস্ত দেশ বাবাই নিজে দখল করবেন, আমাদের জন্যে আর কিছুই রেখে যাবেন না।'

ফিলিপের নির্দেশে এথেন্সের সমস্ত যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রের বুকে ভাসল। এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত অধিকার করবার জন্যে মাসিডনের সেনাপতি পার্মেনিয়োকে সসৈন্যে প্রেরণ করা হল।

ফিলিপ তাঁর চিরপ্রার্থিত অভিযানের জন্যে প্রস্তুত! এমন সময়ে ঘটল বিষম দুর্ঘটনা।

পারিবারিক এক বিবাদে হত্যাকারীর হস্তে ফিলিপ হঠাৎ মারা পড়লেন। তাঁর বয়স তখন ছ-চল্লিশ বৎসর (খ্রি. পূ. ৩৩৬)।

সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যময় বিপ্লবের সূত্রপাত।

এথেন্সে আনন্দ উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। সে মাসিডনের কাছে নত হয়েছিল কেবল ভয়ে, পারস্যের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার ইচ্ছা তার কিছুমাত্র ছিল না।

বক্তা ডিমোসথেনেস অভিনয়ের সুরে বললেন, 'ফিলিপ মরেছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। ফিলিপ মরলে তার দেহের দুর্গন্ধে এতক্ষণে সারা গ্রিস পূর্ণ হয়ে যেত!'

অন্যান্য গ্রিক রাষ্ট্রও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। চারিদিকেই মাসিডনের শত্রু! ফিলিপ মৃত, বজ্রমুষ্টির ভয় আর নেই। থ্রেস ও ইল্লিরিয়াও আবার বিদ্রোহের জন্যে তৈরি হতে লাগল। ফিলিপের ছেলে আলেকজেন্ডার, সে তো একফোঁটা বালক! মাত্র কুড়ি বৎসর বয়স তার! তাকে আবার ভয় কী? সর্বত্রই এই মনোভাব।

এখন কালবিলম্ব করলেই সর্বনাশ! কিন্তু বিলম্ব হল না।

শত্রুরা নির্বোধ। তারা আলেকজেন্ডারকে এখনও চিনতে পারেনি। তারা কিছু সন্দেহ করবার আগেই আলেকজেন্ডার বিপদের গুরুত্ব বুঝে সচেতন হয়ে উঠলেন। সর্বপ্রথমে তিনি করলেন পিতৃহত্যাকারীকে বধ। তারপর বিভিন্ন শত্রুরা সম্মিলিত হবার আগেই সসৈন্যে ঝড়ের মতন তাদের উপরে গিয়ে পড়লেন। শত্রুরা স্তম্ভিত! একে একে আবার তারা করলে মাথা নত।

এথেন্সে গুজব রটল, পার্বত্য প্রদেশের ভিতরে গিয়ে আলেকজেন্ডার যুদ্ধে মারা পড়েছেন। পথ একেবারে নিষ্কণ্টক ভেবে এথেন্সের বিদ্রোহীরা মুখোশ খুলে ফেললে— এমন সময়ে তাদের সামনে এসে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেন অত্যন্ত জীবন্ত, বিজয়ী বীর আলেকজেন্ডার!

তাড়াতাড়ি আবার মাথা নত করে এথেন্স হাসিমুখে বললে, 'এসো বীর, অভিনন্দন নাও।'

আলেকজেন্ডার সব বুঝেও মুখে কিছু বললেন না।

সমগ্র গ্রিস বললে, 'রাজা ফিলিপ পরলোকে। আজ থেকে তুমিই আমাদের নেতা।'

থিব্‌জ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তার ফলও হল ভয়ানক। আলেকজেন্ডারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে সে হেরে গেল। তারপর গোটা থিব্‌জ পরিণত হল ধ্বংসস্তূপে। আলেকজেন্ডার চিরদিনই কাব্যপ্রিয়। তাঁর হুকুমে ভাঙা হল না খালি গ্রিসের গীতিকবি পিণ্ডারের বাড়ি। যদিও পিণ্ডার তখন পরলোকে, তবু তাঁর স্মৃতিমাখা ওই বাড়িখানি আলেকজান্ডার পবিত্র বলেই মনে করলেন।

থিব্‌জের পরিণাম দেখে গ্রিসের অন্যান্য নগর সভয়ে উপলব্ধি করতে পারলে, প্রৌঢ় ফিলিপের চেয়ে প্রায় বালক আলেকজেন্ডার কম সাংঘাতিক নন। প্রভু হবার যোগ্যতা তাঁর আছে। তাঁর কাছে বশ মানা ছাড়া উপায় নেই।

গ্রিসে 'সিনিক' নামে এক সম্প্রদায়ের দার্শনিক ছিলেন। তাঁদের মোটামুটি মত হচ্ছে এই: বেশির

ভাগ মানুষ অসুখী, কারণ তারা হরেক রকম সামাজিক বন্ধনে বন্দি এবং তারা যা চায় তা পায় না—অর্থাৎ ভালো খাবার, ভালো পোশাক ও বিলাসী জীবন। যদি সত্যিকার সুখী হতে চাও, তবে ওইসব তুচ্ছ জিনিসের কথা ভুলে যাও এবং পথচারী কুকুরের মতন সরল ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করো। এই রকম মতের জন্যে গ্রিসের লোকরা 'সিনিক'-দার্শনিকদের নাম রেখেছিল, 'কুকুর'।

গ্রিসে তখন ডায়োজেনেস নামে একজন বিখ্যাত 'সিনিক' ছিলেন। আজও তাঁর নাম অমর। তিনি কেবল ল্যাঙট পরে বাস করতেন মস্তবড়ো একটা মাটির জালার ভিতরে। সরল জীবনযাত্রার চূড়ান্ত!

আলেকজেন্ডার একদিন কৌতূহলী হয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। ডায়োজেনেস তখন প্রায় নগ্ন অবস্থায় জালার ভিতরে বসেছিলেন।

আলেকজেন্ডার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পণ্ডিত, আপনাকে সুখী করবার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

জালার ভিতর থেকে ডায়োজেনেস বললেন, 'আমার সুমুখ থেকে বিদায় হতে পারো।'

এই কবুল জবাবে আলেকজেন্ডার খুশি হলেন। আসবার সময়ে বললেন, 'আমি যদি আলেকজেন্ডার না হতুম, তাহলে আমি ডায়োজেনেস হতে চাইতুম!'

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্বনাট্যশালায় প্রথম আবির্ভাব

বিশ বছর বয়সের এক ছোকরা এই আলেকজেন্ডার!

এ বয়সে গরিবের ছেলেও বিদ্যালয় ও নিজের বাড়ির বাইরেকার কোনও খবর রাখতে পারে না। বিপুল পৃথিবীতে ছেড়ে দিলে সে হবে একান্ত অসহায়।

গরিবের ছেলে তবু নানা কারণে বাস্তব জগতের কিছু কিছু শেখবার সুযোগ ও সময় পায়, কিন্তু জন্মসুখী রাজার ছেলের কাছে তেমন অবসর বড়ো একটা আসে না।

তবু আলেকজেন্ডার সমগ্র গ্রিসের অসংখ্য বিচক্ষণ ও বলবান শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, চারিদিক সামলে কেমন করে আত্মরক্ষায় সক্ষম হলেন? অসাধারণ বহুদর্শিতা না থাকলে এতটা সম্ভবপর হয় না। এই বহুদর্শিতার জন্ম কোথায়?

উত্তরে বলা যায়, তাঁর প্রতিভার মধ্যে। প্রতিভার ভিতরে থাকে ইন্দ্রজাল, সম্ভব করে সে অসম্ভবকে। কেবল শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় প্রতিভা তৈরি হয় না।

কিছুদিন পরে ভারতে গিয়ে আলেকজেন্ডারের সঙ্গে আর একটি যুবকের আলাপ হয়েছিল, তাঁর নাম, চন্দ্রগুপ্ত। তিনিও ছিলেন প্রায় আলেকজেন্ডারেরই সমবয়সি। এবং তিনিও প্রথম যৌবন গত হবার আগেই সমগ্র ভারতকে গ্রিক-নাগপাশ ও অরাজকতা থেকে মুক্ত করে বিরাট এক সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। সেও প্রতিভার মহিমায়। একই যুগে এমন দুই অসাধারণ প্রতিভা পৃথিবী আর কখনও দেখেছে কি না জানি না।

ইউরোপের ইতালিতে মিকেলাঞ্জেলো বলে একজন প্রতিভাবান শিল্পী জন্মেছিলেন। তাঁর প্রায় শিশু বয়সে আঁকা দু-একখানি রেখাছবি পাওয়া যায়। সমালোচকেরা বলেছেন, সেসব ছবির তলায় যদি কোনও প্রবীণ ও পৃথিবীবিখ্যাত চিত্রকরও নাম সই করেন, তাহলেও তাঁর অমর্যাদা হবে না।

প্রথম যৌবনেই কোনও কোনও কবি মারা পড়ে সারা জগতে অমর হয়ে আছেন। তাঁদের বাল্যরচনাও পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির কবিদের কবিতার সঙ্গে সমান ঠাঁই পায়।

এসব হচ্ছে, প্রতিভার খেলা। প্রতিভার মধ্যে আছে কী যে রহস্য, কেউ তা জানে না, কিন্তু নবীনকে সে করে তোলে প্রবীণ।

বিশ বছর বয়সে আলেকজেন্ডার হলেন গ্রিসের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

কিন্তু গ্রিসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রিক হয়েও আলেকজেন্ডার নিজের কর্তব্য ভুললেন না। হানিবলের মতন তিনিও পিতৃকৃত্য পালন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন।

একদিন তিনি দুঃখিতভাবে বলেছিলেন, তাঁর জন্যে পিতা কোনও গৌরবজনক কার্য অসমাপ্ত রেখে যাবেন না। এখন দেখলেন, সামনে তাঁর গৌরবের অনেক পথই খোলা। কিন্তু সর্বাগ্রে আবশ্যক, পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কার্যে পরিণত করা। গ্রিসের চিরশত্রু পারস্যের বিষদাঁত ভাঙতে হবে।

একাজে যা-যা দরকার, ফিলিপ নিজের হাতেই সমস্ত ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পনা নিখুঁত। সবচেয়ে বড়ো কথা, সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত ফিলিপের দুর্জয় সৈন্যদল আলেকজেন্ডারের আদেশ মানবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। ইতিহাস তাই বলে, আলেকজেন্ডারের অসামান্য সাফল্যের জন্যে ফিলিপের প্রতিভার দাবি আছে যথেষ্ট। হয়তো ফিলিপের মতন পিতা না থাকলে আজ আলেকজেন্ডারের দিগ্বিজয়ীর নাম কেউ জানত না।

পারস্যের সাম্রাজ্য তখন পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। অর্থবল ও সৈন্যবল তার অফুরন্ত। গ্রিসের পক্ষে তাকে আক্রমণ করতে যাওয়া হচ্ছে হাতির সঙ্গে পিঁপড়ের যুদ্ধের মতো। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৪ অব্দে আলেকজেন্ডার যখন সদলবলে দার্দানেলেসের দিকে অগ্রসর হলেন, গ্রিসের বুদ্ধিমানরা স্থির করলেন, আলেকজেন্ডার কেবল গোঁয়ার নন, পাগলও।

কতখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আলেকজেন্ডার গ্রিসের বাইরে পা বাড়াতে উদ্যত হলেন, সেটাও ভাববার কথা।

মাসিডন ছাড়া গ্রিসের আর সব রাষ্ট্রই অবাধ্য, মুখে তারা বাধ্যতার অভিনয় করছে মাত্র। আসলে তারা আলেকজেন্ডারকে ভয় করে। সে ভয় ভাঙলে, অর্থাৎ তিনি দেশ ত্যাগ করে সুদূরে গেলেই যে-কোনও মুহূর্তে আবার তারা অস্ত্রধারণ করতে পারে। এথেন্সের জনপ্রিয় বক্তা ডিমোসথেনেস আজ পর্যন্ত মাসিডন ও আলেকজেন্ডারের বিষম শত্রু হয়েই আছেন। এমনকি, তিনি আলেকজেন্ডারের বিরুদ্ধে সমস্ত গ্রিসকে উত্তেজিত করবার জন্যে পারস্যের কাছ থেকে নিয়মিতরূপে প্রচুর ঘুষের টাকাও গ্রহণ করেন। গ্রিস বিদ্রোহী হলে আলেকজেন্ডারের সর্বনাশ।

আলেকজেন্ডার যে এসব কথা ভেবে দেখেননি, তা বলা যায় না। কিন্তু উদ্দাম যৌবন চিরদিনই অগ্রগামী, যুক্তিকে ভক্তি করে না, এবং এই কারণেই চিরদিন অসম্ভবকে সম্ভব করে এসেছে।

গ্রিকরা যে আক্রমণ করতে আসছে, পারস্যের তা জানতে বাকি ছিল না। কিন্তু তৃতীয় দরায়ুস নামে পারস্যের যে নূতন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, রাজদণ্ড ধারণের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তাঁর চরিত্রমাধুর্য থাকলেও সম্রাট হিসাবে তিনি ছিলেন নগণ্য। যদি পূর্বপুরুষদের মতন থাকত তাঁর বুদ্ধি ও পুরুষত্ব, কখনওই সফল হত না আলেকজেন্ডারের দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন।

তৃতীয় দরায়ুসের অধীনে অনেক বেতনভোগী গ্রিক সৈন্য ও সেনানী ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, মেমনন। পারস্য সম্রাটের উচিত ছিল, মেমননের হাতে কর্তৃত্ব ভার দেওয়া। কারণ, সৈন্য চালনায় ও সামরিক বুদ্ধি বিবেচনার জন্যে মেমননের খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মেমননকে অগ্রাহ্য করে দরায়ুস যুদ্ধচালনার ভার দিলেন তাঁর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপরে।

সমুদ্র পার হয়ে আলেকজেন্ডার পদার্পণ করলেন এশিয়ার মাটিতে। তারপর প্রথমেই ছুটলেন

তীর্থদর্শন করতে! সে তীর্থ হচ্ছে তাঁর প্রাণের কবি হোমারের অমর কাব্যে উল্লিখিত ট্রয় নগরের ধ্বংসাবশেষ। মহাভারতে উল্লিখিত কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়ালে হিন্দুর চিত্ত যেমন অতীত স্মৃতির প্রভাবে অভিভূত হয়, প্রাচীন ট্রয়ের মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আলেকজেন্ডারেরও মনের অবস্থা হয়েছিল যে সেই রকম, এটুকু আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি। কারণ, বীরধর্মী গ্রিকদের কাছে হোমারের বীররসাত্মক অমর কাব্যের চেয়ে পবিত্র আর কিছুই নেই।

সেখানে ছিল মহাবীর অ্যাকিলিজের সমাধি—আলেকজেন্ডার যাঁকে নিজের পূর্বপুরুষ বলে দাবি করেন এবং যাঁর অপূর্ব বীরত্ব গাথা হোমার বিচিত্র ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ভক্তিনত প্রাণে আলেকজেন্ডার আগে করলেন বীরপূজা। তারপর নিজের পথে অগ্রসর হলেন।

খুব সম্ভব এই সময়েরই একটি গল্প আছে।

ফ্রাইগিয়া নামে এক প্রাচীন দেশ ছিল এশিয়া মাইনরে। তার বাসিন্দারা নানা কারণে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে দৈববাণী হয়, জুপিটার দেবের মন্দিরের পথে প্রথম যে পথিকের দেখা পাবে, বাসিন্দারা তাকেই যদি রাজা করে তাহলে দূর হয়ে যাবে দেশের সব দুঃখ কষ্ট।

বাসিন্দারা পথের ধারে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেপথে সর্বপ্রথমে গাড়ি চালিয়ে এল এক চাষা, নাম তার, গর্ডিয়াস। বাসিন্দারা সেই অবাক চাষার মাথাতেই পরিয়ে দিলে রাজার মুকুট।

কৃতজ্ঞ চাষা তখন নিজের গাড়িখানিকে জুপিটার দেবের নামে উৎসর্গ করে মন্দিরের গায়ে বেঁধে রাখলে।

কিন্তু রাজা হয়েছিল বলেই গর্ডিয়াস আজ পর্যন্ত বিখ্যাত হয়ে নেই। মন্দিরের গায়ে গাড়ির রজ্জু এমন সুকৌশলে সে গ্রন্থি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল যে, দড়ির প্রান্ত কেউ খুঁজে পেত না, গ্রন্থিও কেউ খুলতে পারত না।

দৈববাণী শোনা গেল, এ গ্রন্থি যে খুলতে পারবে, সমগ্র এশিয়া হবে তার হস্তগত।

আলেকজেন্ডারের যুগেও এ গল্পটি ছিল প্রাচীন। লোকের মুখে গল্পটি শুনে তিনিও গেলেন জুপিটারের মন্দিরে। কিন্তু গ্রন্থি এমন জটিল যে, তা খোলবার কৌশল মাথায় আনতে পারলেন না।

তখন খাপ থেকে তরোয়াল খুলে তিনি গ্রন্থির উপরে বসিয়ে দিলেন এক কোপ। গ্রন্থি কেটে দু-টুকরো।

গ্রন্থি খোলবার এই অতি সহজ উপায় দেখে সকলেই চমৎকৃত। চারিদিকে রটে গেল—আলেকজেন্ডার গর্ডিয়াসের গ্রন্থি খুলেছেন, নিশ্চয়ই তিনি হবে এশিয়া-বিজয়ী!

ইংরেজি অভিধান খুললে আজও দেখা যাবে 'Gordian Knot' নামে কথাটি।

গ্রানিকাস একটি নদীর নাম, সে গিয়ে পড়েছে মর্মরসাগরে। আলেকজেন্ডার নদীর একপারে সসৈন্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই হচ্ছে এশিয়ায় প্রবেশ করার প্রথম ও প্রধান পথ।

নদীর ওপারে পারস্য-সৈনিকদের নিয়ে শিবির স্থাপন করেছেন প্রাদেশিক শাসন-কর্তারা।

গ্রানিকাসের স্রোতের বেগ দেখে আলেকজেন্ডারের সৈন্যাধ্যক্ষরা রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়লেন। এ নদী পার হওয়া সহজ কথা নয়।

ফিলিপের মতন আলেকজেন্ডারেরও প্রধান সেনাপতি ছিলেন প্রবীণ পার্মেনিয়ো। তিনিও বললেন, 'রাজা, এখন নদী পার হবার চেষ্টা করবেন না। ওপারে তাকিয়ে দেখুন, বেতনভোগী গ্রিক সৈনিকদের সঙ্গে পারসিরা কীরকম সুরক্ষিত জায়গায় ব্যূহ রচনা করেছে। এখন ওদের আক্রমণ করা নিরাপদ নয়।'

কিন্তু কোথায় রাজা? তিনি তখন তেরোজন মাত্র অশ্বারোহী সৈনিক সঙ্গে নিয়ে নদীর মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন!

তিনি জানতেন, নদীর খরস্রোতও তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে তুচ্ছ—চিরশত্রু পারস্যের সঙ্গে এই প্রথম শক্তি পরীক্ষার সুযোগ পেয়ে আলেকজেন্ডার আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে রাজি নন। সাবধানতা? সাবধান হোক বুড়োরা—'যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?'

তিনি জানতেন, তাঁর সুশিক্ষিত গ্রিক সৈনিকদের ঘনব্যূহের ধাক্কা সামলাতে পারে, পারসিদের এমন শক্তি নেই।

রাজাকে অগ্রসর হতে দেখে সমস্ত গ্রিক সৈন্য মরিয়ার মতন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আলেকজেন্ডার সর্বাগ্রে ওপারে গিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে পারসিরাও আক্রমণ করলে। আরম্ভ হয়ে গেল লড়াই—দুই পক্ষেরই কতক সৈন্য জলে এবং কতক সৈন্য স্থলে।

ভাগ্যে আলেকজেন্ডার সেদিন প্রিয় ঘোড়া ষণ্ডমুণ্ডকে এই বিপদের মধ্যে টেনে আনেননি! কারণ, শত্রুদের আক্রমণে তাঁর ঘোড়া মারা পড়ল। দুইজন পারসি সেনাপতি একসঙ্গে তাঁর উপরে অস্ত্রচালনা করলেন, তাঁর মৃত্যু অনিবার্য!

ক্লিটাস ছিলেন আলেকজেন্ডারের বন্ধু। কোথা থেকে তিনি বেগে ছুটে এসে পারসি সেনাপতিদের কবল থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন।

ওদিকে দেখতে দেখতে গ্রিক সাদী-সৈনিকদের প্রচণ্ড আক্রমণে পারসিদের প্রথম দল ভেঙে গেল। তখন এল ফিলিপের হাতে তৈরি ঘনব্যূহের কৃতিত্ব দেখাবার সময়!

উচ্চভূমিতে যে সুশিক্ষিত বেতনভোগী গ্রিকরক্ষীসৈন্যদল অপেক্ষা করছিল, পারসিরা তখনও তাদের কাজে লাগায়নি।

আলেকজেন্ডার প্রবীণ সৈন্যচালকের মতন আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন যে, শত্রুরা তাদের সাদী-সৈন্যদের, আক্রমণের জন্যে নয়—আত্মরক্ষার জন্যে সজ্জিত করে রেখেছে। প্রথমেই তিনি শত্রুদের এই ভ্রমের সুযোগ গ্রহণ করলেন।

আলেকজেন্ডারের হুকুমে তাঁর সৈন্যরা শত্রুদের বামপার্শ্বভাগ আক্রমণের ভান করলে এবং শত্রুরাও সেই ছলনায় ভুলে সেইদিকে রক্ষা করার জন্যে অগ্রসর হতেই মধ্যভাগ দুর্বল হয়ে পড়ল।

আলেকজেন্ডার চিৎকার করে বললেন, 'ঘনব্যূহের সৈনিকগণ, আক্রমণ করো—আক্রমণ করো! সর্বাগ্রে আক্রমণ করো শত্রুপক্ষের পেশাদার গ্রিকদের! তারা দেশদ্রোহী! তাদের একজনকেও ক্ষমা কোরো না!'

ভয়াবহ ঘনব্যূহ! এরকম আক্রমণ ছিল পারসিদের ধারণাতীত! তারা চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এতক্ষণ পরে বিপদ বুঝে পারসি সাদী-সৈন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে বাধা দিতে এল বটে, কিন্তু সুসময় উৎরে গিয়েছে—তাদের সমস্ত বাধা দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হল।

দশ হাজার পদাতিক ও দুই হাজার সাদী-সৈন্যের মৃতদেহ রণক্ষেত্রে ফেলে পারসিরা পালিয়ে গেল। হাজার হাজার লোক বন্দি হল। বেতনভোগী গ্রিক সৈন্যদের প্রায় সকলেই মারা পড়ল। আলেকজেন্ডারের জয়!

এই যুদ্ধের ফলে আলেকজেন্ডার এশিয়া মাইনরের অনেকখানি জায়গা দখল করে ফেললেন।

পারসি সৈনিকদের তিনশোখানা ঢাল আর বহু সামগ্রী উপহার স্বরূপ স্বদেশে পাঠিয়ে আলেকজেন্ডার সগর্বে এই পত্রখানি লিখলেন—'স্পার্টা ছাড়া গ্রিসের আর সকলের কাছেই এইসব ভেট পাঠাচ্ছি—এগুলি হচ্ছে, এশিয়াবাসী বর্বরদের সম্পত্তি। আমি ফিলিপের ছেলে আলেকজেন্ডার!'

এই ছোট্ট চিঠিখানির ভিতরে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আলেকজেন্ডার যথেষ্ট রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমত, এথেন্সের বক্তা ডিমোসথেনেস যে ফিলিপকে হেয় প্রমাণিত করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় ত্রুটি করেননি, আলেকজেন্ডার সদর্পে নিজেকে পরিচিত করতে চেয়েছেন তাঁর পুত্ররূপে। দ্বিতীয়ত, কৌলীন্যগর্বিত স্পার্টা মাসিডনের প্রাধান্য স্বীকার করতে নারাজ, তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে এই বিজয়গৌরব থেকে। তৃতীয়ত, যে 'বর্বর' (যে কোনও বিদেশিকে গ্রিকরা এই নামে ডাকত) শব্দ গ্রিকরা মাসিডনের বাসিন্দাদের উপরে প্রয়োগ করত, তাই প্রয়োগ করা হয়েছে পারসিদের উপরে। অর্থাৎ গ্রিকদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মাসিডনবাসীরা বর্বর বা বিদেশি নয়, তারাও সত্যিকারি গ্রিক এবং আসল বর্বর হচ্ছে গ্রিকদের শত্রু পারসিরাই!

একসঙ্গে যুদ্ধ ও রাজনীতি ব্যবসায়ীরূপে আলেকজেন্ডার আরও নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। যেসব শহর ও দেশ তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল, সেখানে প্রজাদের হিতকর অনেক নব নব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। পারসিদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে ওইসমস্ত জায়গায় বাসিন্দারা হয়ে পড়ল তাঁর পরম বন্ধু।

জলপথে পারসিরা ছিল গ্রিকদের চেয়ে ঢের বেশি প্রবল। আলেকজেন্ডার তাই জলযুদ্ধে কোনও রকম শক্তি পরীক্ষার চেষ্টা না করে স্থলপথেই পারস্য সাম্রাজ্যের ভিতরদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

তাঁকে খুব বেশিদূর এগুতে হল না। কারণ, পারসিরা এইবার বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসাস প্রান্তরের যুদ্ধ

(খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৩)

পারস্য সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস প্রথমটা আলেকজেন্ডারকে গ্রাহ্য করেননি। তারপর তিনি বুঝলেন, এই গ্রিক শত্রু বড়ো সামান্য নয়। তখন তিনি নিজের সাম্রাজ্যের চারিদিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আলেকজেন্ডারকে একেবারে পিষে মেরে ফেলতে এলেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা ইউরোপের গৌরব বাড়াবার জন্যে বারংবার অনেক সত্য গোপন করেছেন। তাঁদের মত হচ্ছে, সংখ্যায় গ্রিস ছিল নগণ্য এবং পারস্য ছিল ছয় লক্ষ সৈন্যের অধিকারী। দুই দলের মধ্যে এতটা পার্থক্য হয়তো ছিল না। তবে পারসিরা সংখ্যায় যে বেশি ছিল, একথা মানা যেতে পারে। কারণ, জনসংখ্যায় পারস্য সাম্রাজ্য ছিল অতুলনীয়। সুদূর উত্তর ভারত থেকে হাজার হাজার ভারতীয় সৈনিকও এসেছিল পারসিদের সাহায্য করতে। এমনকি, দরায়ুসের অধীনে যে ত্রিশ হাজার বেতনভুক গ্রিক সৈন্য ছিল, এটাও জানতে পারা গিয়েছে।

আলেকজেন্ডারের গতি রোধ করবার জন্যে দরায়ুস যে স্থানে সৈন্য সমাবেশ করলেন তার নাম হচ্ছে, ইসাস প্রান্তর।

এইটেই হল তাঁর পক্ষে মারাত্মক ভুল। এই প্রান্তর ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ—এক ক্রোশেরও কম। পারস্য রাজসভায় একজন গ্রিক এসে আশ্রয় নিয়েছিল, দরায়ুসকে বিশেষ রূপে মানা করে দিয়েছিল এখানে ছাউনি ফেলতে। কারণ, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পারসি সৈন্য চালনা করবার কোনও উপায়ই ছিল না।

সে বলেছিল, 'সম্রাট খুব প্রশস্ত ক্ষেত্রে গিয়ে আপনার বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করুন। তাহলে আলেকজেন্ডার এলে আপনি তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলতে পারবেন।'

এত বড়ো সৎপরামর্শ দরায়ুস কানে তুললেন না। ফল হল এই যে, পারসিদের সংখ্যাধিক্য কোনও কাজেই লাগল না। ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লিওনিডাসের অধীনে মাত্র এক হাজার গ্রিক সৈন্য থার্মোপলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে দাঁড়িয়ে বিপুল পারসি বাহিনীকে কী আশ্চর্য বাধা দিয়েছিল, দরায়ুস সে কথাও ভুলে গেলেন। এই ভুলই তাঁর কাল।

পারসিদের সামনে ছিল সমুদ্র, পিছনে ছিল গিরিবর্ত্ম। এখানে পরাজিত হলে গ্রিকদের সর্বনাশ হত, কারণ ইউরোপে পালাবার পথ গিয়েছিল বন্ধ হয়ে। হয়তো এই লোভেই দরায়ুস তাঁর গ্রিক পরামর্শদাতার কথা কানে তোলেননি, কিন্তু প্রবাদে লোভকে বলে পাপ—যে পাপের ফলে হয় মৃত্যু!

ভয়ের কারণ যথেষ্ট ছিল বটে, তবু আলেকজেন্ডার স্থির করলেন, এইখানে দাঁড়িয়েই তিনি দরায়ুসের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। কারণ, পারসিরা সংখ্যার অগণ্য হলেও এই সংকীর্ণ স্থানে স্বল্পসংখ্যক গ্রিকরা এখানে তাদের সঙ্গে সমানভাবে লড়াই করতে পারবে।

গ্রিক সৈন্যদের ডান দিকে রইল পাহাড়, বাঁ দিকে সমুদ্র। তাদের সামনে পিনেরাস নদী এবং নদীর ওপারে পারসিরা।

ডান দিক পাহাড়ের দ্বারা সুরক্ষিত বলে আলেকজেন্ডার সেদিক সম্বন্ধে হলেন নিশ্চিন্ত। কিন্তু পাছে সমুদ্রতীর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পারসিরা গ্রিকদের ঘিরে ফেলে, সেই ভয়ে তিনি তাঁর সেনাপতি পার্মেনিয়োকে বামপার্শ্ব রক্ষা করার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। দরায়ুস জানতেন, পার্মেনিয়ো হচ্ছেন আলেকজেন্ডারের চেয়ে কম সাহসী। কাজেই তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীদলকে সর্বাগ্রে পাঠিয়ে দিলেন গ্রিকদের বামপার্শ্ব আক্রমণ করার জন্যে। শত্রুদের ফন্দি বুঝে আলেকজেন্ডারও তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদলকে পার্মেনিয়োর সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করলেন। এতক্ষণ পরে দরায়ুস নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেন। এই সংকীর্ণ স্থানে না এলে তিনি অনায়াসেই দুইদিক থেকেই গ্রিকদের উপরে হানা দিতে পারতেন এবং দুই দিকেই অসংখ্য পারসিদের আক্রমণে বাধা দেবার মতো সৈন্য আলেকজেন্ডারের ছিল না। সরু গিরিপথ দিয়ে এখন আর পিছু হটবারও সময় নেই, কারণ, ইতিমধ্যেই গ্রিকরা আক্রমণ করবার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে! এখন তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে দরায়ুস নিজের ত্রিশ হাজার পেশাদার গ্রিক সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন। গ্রিকের বিরুদ্ধে গ্রিক! ভারতবর্ষেও এমনি অনেকবার অন্য জাতির হয়ে লড়েছে মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু!

আলেকজেন্ডারের বাহিনীর মধ্যভাগ রক্ষা করছিল তাঁর বিখ্যাত 'ফেলাঙ্কস' বা 'ঘনব্যূহ'। আগেই বলা হয়েছে, এই ঘনব্যূহের মধ্যে সাধারণত ষোলো সারে একেবারে পরস্পরের গা ঘেঁসাঘেঁসি করে গুরুভার অস্ত্রাদি নিয়ে সৈন্যেরা দাঁড়িয়ে থাকত এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকত আঠারো ফুট লম্বা বর্শা। এইভাবে ঘনব্যূহের পদাতিকরা যখন বর্শা সামনের দিকে উঁচিয়ে অগ্রসর হত, তখন তাদের বাধা দেওয়া বা দল ভাঙা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে উঠত। আলেকজেন্ডার অধিকাংশ যুদ্ধ জিতেছিলেন এই ঘনব্যূহেরই মহিমায়। ইসাসের যুদ্ধেও গ্রিকদের বিরুদ্ধে এই ঘনব্যূহ প্রমাণিত করলে তার সার্থকতা।

আলেকজেন্ডার নিজের সৈন্যদের উৎসাহিত করে বললেন, 'অগ্রসর হও গ্রিক বীরগণ! পারসিদের আগেও তোমারা হারিয়েছ এবারেও অনায়াসে হারাতে পারবে! মনে রেখো, এই যুদ্ধে জিততে পারলে প্রাচ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য হবে তোমাদের হস্তগত!'

আলেকজেন্ডার নিজে পুরোভাগে থেকে অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে পেশাদার গ্রিক শত্রুদের বামপার্শ্ব

আক্রমণ করলেন বিষম তেজে। এবং ঘনব্যূহের সৈন্যদলকে পারসিদের মধ্যভাগ আক্রমণ করবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।

দুইদলের মাঝখানে তখন আর নদীর ব্যবধান নেই। পারসি অশ্বারোহীদল আক্রমণের পর আক্রমণ করতে লাগল, তাদের সংখ্যাধিক্যের জন্যে গ্রিকদের বামপার্শ্বের অবস্থা হয়ে উঠল সঙ্কটজনক। কিন্তু দেখতে দেখতে আলেকজেন্ডারের চালিত সাদী-সৈন্য ও তাঁর প্রচণ্ড ঘনব্যূহের আক্রমণে পারসিদের মধ্যভাগ একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পারসিরা সংখ্যায় বেশি বটে, কিন্তু সেই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ ও আড়ষ্ট হয়ে থাকার দরুন দু-দিকে ছড়িয়ে পড়ে তারা গ্রিকদের ঘিরে ফেলতে পারলে না। রাস্তায় মারামারি বা দাঙ্গা দেখেছেন কি? একপক্ষে একশোজন ও একপক্ষে দশজন লোক যদি কোনও বড়ো চওড়া রাজপথে দাঁড়িয়ে মারামারি করে, তাহলে দশজন লোক চোখের নিমেষেই হেরে যায়। কিন্তু ওই দশজন লোক যদি কোনও খুব সরু গলির ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তাহলে দলে ভারী হয়েও একশোজন লোকও তাদের কাবু করতে পারবে না। ইসাস প্রান্তরে ঠিক এই কারণেই পারসিদের বিপুল বাহিনী পরাজিত হল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পারসিরা পলায়ন করতে লাগল—গ্রিকরা ছুটল তাদের পিছনে পিছনে। হতভাগ্য দরায়ুসও রথ থেকে নেমে ধরা পড়বার ভয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেলেন। গ্রিকদের ক্ষতি হল সামান্য। কিন্তু সংখ্যাতীত পারসি বীরের মৃতদেহে রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

ধরতে গেলে এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য লুপ্ত হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত পারসিরা আর তাদের পূর্বগৌরবের শিখরে গিয়ে উঠতে পারেনি।

সপ্তম অধ্যায়

অসম্পূর্ণ মহাকাব্য

ইসাস প্রান্তরের যুদ্ধে বোঝা গেল, গ্রিসকে গোলাম করবার ক্ষমতা পারস্যের আর কোনওদিন হবে না।

দরায়ুস পালিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গ হল আলেকজেন্ডারের হাতে বন্দি। কিন্তু আলেকজেন্ডার তাঁদের সঙ্গে এমন ভদ্র ব্যবহার করলেন যে, তাঁরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেকালে বিজেতার কাছে বিজিত এমন শিষ্ট ব্যবহার প্রত্যাশা করত না।

ঐশ্বর্যে পারস্য ছিল অতুলনীয়, গ্রিস স্বাধীন হলেও তার কাছে এ হিসাবে একান্ত নগণ্য ছিল। চাষার ছেলে রাজার প্রাসাদে ঢুকলে যেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, দরায়ুসের বিচিত্র পটমণ্ডপে প্রবেশ করে তার সোনার থালাবাটি ও অন্যান্য পাত্রের স্তূপ, বহুমূল্য আসবাব ও কারুকার্যকরা কার্পেট প্রভৃতি দেখে আলেকজেন্ডার হতভম্ব হয়ে গেলেন। অভিভূতকণ্ঠে বললেন, 'রাজা বলতে কী বোঝায়, এইবারে বুঝতে পারছি!'

জয়লাভ করেও আলেকজেন্ডার কিন্তু দরায়ুসের অনুসরণ করতে পারলেন না। তাঁর পিছনে ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের বিপুল আর এক অংশ—সিরিয়া ও মিশর প্রভৃতি নিয়ে যা গঠিত। পিছন দিকে এত বড়ো শত্রু-সাম্রাজ্য রেখে তিনি পারস্যের দিকে অগ্রসর হতে সাহস করলেন না—এবং রণনীতিতে অভিজ্ঞ অন্য কেহই যা করতেন না। প্রাচ্যভূমির দিকে অগ্রসর হতে গেলে যে সিরিয়া প্রভৃতি দেশ নিজের অধিকারভুক্ত রাখা উচিত, সেই প্রাচীন কালেই তরুণ আলেকজেন্ডার তা উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন। বহুকাল পরে আঠারো শতাব্দীতে ফরাসি দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নও এই সত্য বুঝে ভারতবর্ষ বিজয়ের বাসনা নিয়ে আলেকজেন্ডারেরই পায়ে চলা পথে পথিক হয়েছিলেন—যদিও তিনি সিরিয়া পার হবার সুযোগ পাননি।

অল্পবিস্তর চেষ্টার পর সিরিয়া আলেকজেন্ডারের হস্তগত হল। প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র মিশর, পারসিদের শাসন যন্ত্রের চাপে আর্তনাদ করছিল, তার জন্যে আলেকজেন্ডারকে আর লড়াই করতে হল না। নবীন গ্রিকদিগ্বিজয়ীকে সে মুক্তিদাতা বলে অভ্যর্থনা করে সিংহদ্বার খুলে দিলে। আলেকজেন্ডার নিজের নামে এখানে যে নগর প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই আলেকজেন্দ্রিয়া আজও পৃথিবীর অন্যতম প্রধান নগরী রূপে বিখ্যাত হয়ে আছে। গ্রিসের অধঃপতনের পরে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এথেন্সের স্থানগ্রহণ করেছিল, আলেকজেন্দ্রিয়াই।

আলেকজেন্ডারের কল্পনাতীত সাফল্য দেখে এতদিন পরে গ্রিসের প্রধান সম্ভ্রান্ত রাষ্ট্র এথেন্সেরও চোখ ফুটল। এথেন্সও দূত প্রেরণ করে অভিনন্দন জানালে যে—আলেকজেন্ডারই হচ্ছেন এশিয়ার বিরুদ্ধে গ্রিসের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা!

এরপর এই পৃথিবীতে আলেকজেন্ডারের পরমায়ু ছিল মাত্র সাত বৎসর! কিন্তু কী বিচিত্র, কী অদ্ভুত ও কী অসাধারণ ঘটনার ধারার সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে এই সাতটি বৎসরের প্রত্যেকটি দিন! সাত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর আর কোনও মানুষ সভ্যতার ইতিহাসে এমন চিরস্মরণীয় পরিবর্তন আনতে পারেনি।

এইবারে আলেকজেন্ডার নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পারস্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। পারস্যের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অদ্বিতীয়তার মূলে তিনি প্রচণ্ড আঘাত করেছেন বটে, কিন্তু এখনও সে ধূলিসাৎ হয়নি, এখনও সে মৃত নয়।

এদিকে দরায়ুসও বুঝতে পেরেছেন, আলেকজেন্ডার হচ্ছেন অপরাজেয়। অন্তত তাঁকে দমন করতে পারে পারস্যের এমন শক্তি নেই। তাড়াতাড়ি তিনি সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। ইউফ্রেটেস নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আলেকজেন্ডারের হাতে তিনি নিজের কন্যা ও প্রচুর অর্থ সমর্পণ করতে চাইলেন। অন্য যে-কোনও লোক এ শর্তে রাজি হয়ে যেত—কিন্তু আলেকজেন্ডার সে লোক নন।

প্রধান সেনাপতি পার্মেনিয়ো বললেন, 'রাজা, আমি যদি আলেকজেন্ডার হতুম, তাহলে এই প্রস্তাবেই সায় দিতুম।'

আলেকজেন্ডার বললেন, 'ঠিক। আমি যদি পার্মেনিয়ো হতুম, এ প্রস্তাবে নিশ্চয়ই নারাজ হতুম না!'

দরায়ুস তখন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্যে বিপুল আয়োজন করলেন। তখনও তাঁর সাম্রাজ্য ছিল বহুজনপূর্ণ ও বহুদূরবিস্তৃত। সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশ থেকে নানাজাতীয় সৈনিক এসে দরায়ুসের পতাকার তলায় সমবেত হল—এমনকি, ভারত থেকে কয়েক হাজার ভারতীয় ধনুকধারী সৈনিক পর্যন্ত। এবারে যুদ্ধের আয়োজন হল আর এক বিখ্যাত প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রে—অর্থাৎ বাবিলনে। টাইগ্রিস নদীর নিকটে গৌগামালা নামক স্থানে দরায়ুস তাঁর শিবির স্থাপন করলেন।

আলেকজেন্ডারের সৈন্যসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু পারসিদের সংখ্যা তার চেয়ে এত বেশি ছিল যে, রণপ্রবীণ সেনাপতি পার্মেনিয়ো পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'রাজা, দিনের আলোয় শত্রুদের সংখ্যা দেখলে গ্রিকরা হতাশ হতে পারে। তার চেয়ে রাতের অন্ধকারে আমরা আক্রমণ করব, আমাদের সৈন্যরা কিছু বুঝতে পারবে না।'

আলেকজেন্ডার বললেন, 'তা হয় না। আমি বিজয়গৌরব চুরি করতে চাই না!'

রাত্রির তিমিরাবগুণ্ঠন ভেদ করে ফুটে উঠল পারস্যশিবিরের হাজার হাজার আলোকমালা এবং সেখান থেকে বায়ু তরঙ্গে ভেসে আসতে লাগল সাগর গর্জনের মতন গম্ভীর কোলাহল। সেখানে দাঁড়ালে চোখ আর কান দুইই অভিভূত হয়।

এই যুদ্ধের উপরে গ্রিসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আলেকজেন্ডার ছিলেন অদৃষ্টবাদী। জ্যোতিষীদের আনিয়ে নিজের ভাগ্যগণনা করলেন। ফল হল সন্তোষজনক। তখন দেবতার উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি নিশ্চিন্ত শিশুর মতো।

পরদিন যুদ্ধ আরম্ভ হলে দেখা গেল, ঘনব্যূহ ভেদ করবার জন্যে পারসিরা একরকম অস্ত্র-কণ্ঠকিত রথ আবিষ্কার করেছে। একে পারসিদের সংখ্যা এত বেশি যে, গ্রিকসৈন্যসীমার দুই পাশ ছাড়িয়ে তাদের ব্যূহ অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছে, তার উপরে আবার এই নূতন আবিষ্কারের বিভীষিকা! গ্রিকরা রীতিমতো চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে লাগল।

কিন্তু আলেকজেন্ডার অচঞ্চল। রথ ছুটতে পারে সমতলক্ষেত্রে। তাঁর ডান পাশে ছিল অসমোচ্চ পাহাড়ে জমি, অস্ত্র-কণ্ঠকিত রথের গতিরোধ করবার জন্যে তিনি সৈন্য সমাবেশ করলেন সেইখানে। এবং পারসিরাও তাঁর অভিপ্রায় বুঝে গ্রিকদের বামপার্শ্বস্থ সমতল ক্ষেত্রে সরে এল।

দরায়ুস, আলেকজেন্ডারের কৌশল ধরে ফেলে গ্রিকদের ডান পাশ আক্রমণ করবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন অশ্বারোহী সৈন্যদের। বর্শা ও তরবারি নিয়ে পারসি অশ্বারোহীরা আকাশে বাতাসে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এসে পড়ল গ্রিকদের উপরে, হই হই রবে! খড়ো খড়ো ঝন ঝন সংগীত—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমক! হাজার হাজার বর্শা ফলক উঠল এবং নামল—শত শত গ্রিকদেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল রক্ত ফোয়ারা! গ্রিকদল পশ্চাৎপদ—পারসিদের বিজয় হুঙ্কার।

আলেকজেন্ডার চিৎকার করে বললেন, 'গ্রিসের ছেলে তোমরা, পিছিয়ে এসো না—এগিয়ে যাও! ভুলো না, এই পারসি বর্বররা একদিন গ্রিক দেবতাদের মন্দির কলঙ্কিত করেছিল—আজ তার প্রতিশোধ নাও!'

গ্রিকরা আবার ফিরে দাঁড়াল—এবারে পারসিরা হল পশ্চাৎপদ!

অস্ত্র-কণ্টকিত রথ ছুটে আসতে লাগল গ্রিকদের বাম পাশের সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়ে। রথ আর রথ আর রথ—কত রথ! তাদের গাত্র-সংলগ্ন ধারালো অস্ত্রগুলো মুখ বাড়িয়ে আছে যেন ঘনব্যূহের নরদেহগুলোকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেবার জন্যে! কিন্তু গ্রিক ধনুক থেকে ছুটতে লাগল শোঁ শোঁ শব্দে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ এবং আঠারো ফুট লম্বা বর্শাগুলো আন্দোলিত হতে লাগল ঘন ঘন! কত রথ অচল! তবু ছুটে আসে অন্য রথ! তখন ঘনব্যূহের সৈন্যরা হঠাৎ দুইপাশে সরে গেল এবং সামনে গলিপথ বেয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল রথগুলো! অমনি ঘনব্যূহের দুইপাশ আবার এক হয়ে বন্ধ করে দিলে পথ এবং চারিপাশ থেকে আক্রান্ত রথগুলো হল চূর্ণবিচূর্ণ।

আগেই বলা হয়েছে, পারসি ফৌজের অধিকাংশ সরে এসেছিল গ্রিকদের বাম পার্শ্বে। ফলে তাদের মধ্যভাগ দুর্বল হয়ে পড়ল।

তীক্ষ্ণচক্ষু আলেকজেন্ডার তা লক্ষ করেই তাঁর প্রধান সৈন্যদল দিয়ে প্রচণ্ড বেগে পারসিদের মধ্যভাগ আক্রমণ করলেন।

ফল হল সাংঘাতিক। পারসিদের অশ্বারোহী দল পশ্চাৎপদ, পারসিদের অস্ত্র-কণ্টকিত রথগুলো অচল বা চূর্ণবিচূর্ণ এবং পারসিদের দুর্বল মধ্যভাগ বিধ্বস্ত! এরপর তাদের আর কোনও আশা রইল না।

ওই দেখা যায় সম্রাট দরায়ুসের সমুজ্জ্বল রথ! কিন্তু কী দুর্গতি তার! চারিদিকে তার হত বা আহত নরদেহের স্তূপ—সামনে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে কোনওদিকে তার নড়বার উপায় নেই। অচল-রথের অসহায় সম্রাট, আর তাঁর রক্ষা নেই!

আলেকজেন্ডার নিজের অশ্বারোহীদের ডেকে সম্রাটকে বন্দি করবার হুকুম দিতে যাবেন, সেইসময় বামপার্শ্ব থেকে পার্মেনিয়োর জরুরি আবেদন এল—'আমি আর শত্রুদের রুখতে পারছি না—সৈন্য পাঠান, সৈন্য পাঠান!'

যে পারসি সৈন্যরা গ্রিকদের বাম পাশে ছিল, তারা তখনও ভয়াবহ বিক্রমে যুদ্ধ করছিল, তাদের ঠেকাতে পারছিল না গ্রিকরা।

যে গ্রিক অশ্বারোহীরা বিশৃঙ্খল পারসিব্যূহের মধ্যভাগ গিয়ে দরায়ুসকে বন্দি করতে পারত, তখন তাদের ছুটে যেতে হল পার্মেনিয়োকে সাহায্য করতে।

সেই ফাঁকে সচল-রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা ঘোড়ায় চড়ে দরায়ুস তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলেন। আলেকজেন্ডার মহা আক্রোশে পার্মেনিয়োকে দিতে লাগলেন অভিশাপ! তাঁর অভিযোগ হচ্ছে, পারসিদের মধ্য ও বাম ভাগ যখন বিধ্বস্ত হয়েছে তখন তারা তো শক্তিহীন! দরায়ুসকে বন্দি করতে পারলে তাদের বাকি সৈন্যরা কতক্ষণ আর লড়াই করতে পারত? পার্মেনিয়ো আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন!

সম্রাট পলাতক শুনে যেসব পারসি সৈন্য তখনও লড়াই করছিল তারাও অদৃশ্য হল কে কোথায়!

নেমে এল অন্ধ-রাত্রির তিমির যবনিকা, ঢেকে গেল পৃথিবীর বীভৎস রক্ত চিত্র, জেগে রইল কেবল আসন্ন মৃত্যুর কাতর ক্রন্দন।

দরায়ুসের সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন পারস্যের সৌভাগ্যলক্ষ্মী।

বাবিলন আলেকজেন্ডারের হস্তগত। কিন্তু এখনও অক্ষত আছে নিজ পারস্য ও মিডিয়া—যেখান থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে পারসি সাম্রাজ্য! তার উপরে দরায়ুস এখনও নাগালের বাইরে! সুতরাং কর্তব্য এখনও অসমাপ্ত।

আলেকজেণ্ডার আবার অগ্রসর হলেন। আবার এখানে ওখানে দুই-একটা ছোটোখাটো যুদ্ধের পর পারস্যের বৃহৎ নগর সুসা এবং তার রাজধানী পার্শেপোলিস তাঁর হস্তগত হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেলেন যুগে যুগে সঞ্চিত পারসি রাজভাণ্ডারের অতুল ঐশ্বর্য। আরও পেলেন সেইসব লুণ্ঠিত দ্রব্য, সম্রাট জের্ক্সেস গত যুগে যা এথেন্স থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর দরায়ুসকে অধীনতা স্বীকার করবার জন্যে তিনি কিছুদিন সময় দিলেন। কিন্তু দরায়ুস এতখানি মাথা নোয়াতে রাজি হলেন না, একবেতানার (বর্তমান হামাদান) প্রাসাদে অচলের মতন বসে বসে ফেলতে লাগলেন দীর্ঘশ্বাস। এরপর এখানেও আর একবার যুদ্ধের চেষ্টা হল। কিন্তু আলেকজেন্ডারের আগমন সংবাদ পেয়েই দরায়ুসের সমস্ত সাহস উপে গেল, আবার তিনি পলায়ন করলেন।

আলেকজেন্ডার আজ পারস্যে অদ্বিতীয়। পারস্যের রাজসিংহাসন এখন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। পারস্য আর কোনওদিন গ্রিসের প্রভু হবার জন্যে স্পর্ধা প্রকাশ করবে না। তিনি পিতৃকৃত্য পালন করেছেন।

পরিষদবর্গ বললে, 'রাজা, এখনও পূর্ণ প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি।'

—'আরও কী প্রতিশোধ নিতে চাও?'

—'রাজা, ভুলে যাবেন না, তৃতীয় দরায়ুসের পূর্বপুরুষ জের্ক্সেস আমাদের পবিত্র এথেন্স নগরীকে

সমর্পণ করেছিল অগ্নিশিখার মধ্যে। তারই প্রতিশোধ চাই! আমরাও পুড়িয়ে ছাই করব ক্সের্ক্সেসের প্রাসাদকে!'

—'উত্তম! তার আয়োজন করো।'

দলে দলে লোক ছুটে এল জ্বলন্ত মশাল হাতে করে। তাদের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ালেন আলেকজেন্ডার—তাঁরও হাতে নৃত্যশীল অগ্নিশিখা এবং মাথায় জড়ানো ফুলের মালা।

ধু ধু করে জ্বলে উঠল সেই জগতে অতুলনীয় বিরাট প্রাসাদ—হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল তার বর্ণবিচিত্র, কারুকার্যে কমনীয় উচ্চ ভিত্তি, ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল তার দর্পণের মতন মসৃণ শিলাস্তম্ভগুলো, অগ্নিবেত্রাঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যেন আর্তরব করতে লাগল ওস্তাদ শিল্পীদের হাতে গড়া প্রস্তরমূর্তিরা! একটা বৃহৎ সভ্যতার বহুযুগব্যাপী শিল্পসাধনার আদর্শ গড়াগড়ি দেয় বুঝি ধুলায়!

আলেকজেন্ডার তরুণ যুবক ছাড়া কিছুই নন, বন্ধুদের প্ররোচনায় হঠাৎ তিনি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন। এখন হঠাৎ আবার কী ভেবে অনুতপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে হুকুম দিলেন—'না, না! নিবিয়ে ফ্যালো, নিবিয়ে ফ্যালো—আগুন নিবিয়ে ফ্যালো!'

আগুন নিবল বটে—কিন্তু প্রাসাদের অনেকখানি গ্রাস করে। আজ প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবার আবিষ্কার করেছেন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

কিন্তু কী ভেবে আলেকজেন্ডার আগুন নেবাবার আদেশ দিয়েছিলেন? পারস্যের প্রভু হয়ে কি তাঁর মনে হঠাৎ নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত জেগেছিল? না, দিগ্বিজয়ে বেরুবার আগেই মানস নেত্রের সামনে তিনি নিজের সে অপূর্ব পরিকল্পনা দেখতে পেয়েছিলেন, আবার তারই ছবি আচম্বিতে তাঁর মনে পড়ে গেল?

জোর করে কিছু বলা যায় না। কারণ, আলেকজেন্ডারের নিজের মুখের কথা সেদিন কেউ শোনেনি।

কিন্তু আর একদিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলে যেন এই রহস্যের ভিতরটা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়!

একদিন আলেকজেন্ডার পথে যেতে যেতে দেখলেন, মস্ত একটি পাথরের মূর্তি গড়াগড়ি যাচ্ছে। শুনলেন, এ হচ্ছে ক্সের্ক্সেসের প্রস্তরমূর্তি।

আলেকজেন্ডার সেই ভূপতিত মূর্তির উপরে উঠে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'আমার কী করা উচিত? তুমি গ্রিসকে আক্রমণ করেছিলে বলে তোমাকে কি এই পথের ধুলোতেই শুইয়ে রাখব? না, তোমার অসীম সাহস আর শক্তিকে মর্যাদা দেবার জন্যে আবার তোমাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেব?'

মনে মনে যেন এই সমস্যা পূরণের জন্যেই তিনি মৌন হয়ে রইলেন। তারপর আর কিছু না বলে প্রস্থান করলেন।

পারস্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আলেকজেন্ডার দেখতে হয়তো পেয়েছিলেন নিজের জন্যে একটি বিশেষ পথ। এখনও এ নতুন পথে চলেনি আর পথিক। সে পথের শেষে ছিল এমন একটি মিলন ক্ষেত্র, প্রতীচ্য যেখানে দাঁড়াতে পারে প্রাচ্যের হাত ধরে।

এই হচ্ছে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনুমান। এমন অনুমানের কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি না, পরে আমরা তাও দেখবার চেষ্টা করব। তবে জোর করে কিছু বলা যায় না। কারণ, আলেকজেন্ডারের স্বল্পস্থায়ী জীবন হচ্ছে অসম্পূর্ণ মহাকাব্য।

অষ্টম অধ্যায়

পথের নেশা

এখনও দরায়ুস পলাতক! তাঁকে বন্দি ও বশীভূত করতে না পারলে আলেকজেন্ডারের শান্তি নেই। বিষধর পালিয়ে গেলেই নির্বিষ হয় না।

কিন্তু দরায়ুস যাবেন কোথায়? তিনি যত এগিয়ে যান, আলেকজেন্ডার তাঁর পিছনে লেগে থাকেন কায়ার পিছনে ছায়ার মতো।

এই অনুসরণ করতে করতে আলেকজেন্ডারকে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল বারংবার। তিনি এক প্রদেশ পার হয়ে অন্য প্রদেশে গিয়ে পড়লেই তাঁর পশ্চাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নব নব শত্রু। তাঁকে ফিরে এসে শত্রু দমন করে তবেই আবার অগ্রসর হতে হয়। এইসব কারণে দরায়ুসের পলায়নের সুবিধা হতে লাগল যথেষ্ট।

আলেকজেন্ডার ও তাঁর যুগে আর কেউ সন্দেহ করেনি, যে গ্রিক ও পারসিরা আজ মৃত্যু সংগ্রামে নিযুক্ত, মূলত তারা একই জাতি। আলেকজেন্ডার পরে পাঞ্জাবে গিয়েও বুঝতে পারেননি যে, ওখানকার ভারতীয়রাও তাঁর জাতভাই। স্মরণাতীত কাল আগে মধ্য এশিয়া থেকে যে মূল আর্যজাতি দক্ষিণ দিকে অভিযান আরম্ভ করে, উত্তর ভারতীয় হিন্দু, ইরানের পারসি ও গ্রিসের গ্রিকগণ হচ্ছে তারই তিনটি শাখা। বহুযুগের এপারে এসে পড়ে তারা নিজেদের পূর্ব-কাহিনি ভুলে গিয়েছে, তাই পরস্পরকে 'বর্বর' বা 'যবন' বা অন্য কিছু বলে গালাগালি দেয় এবং ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি করে।

দরায়ুসের মন্দ ভাগ্য! আলেকজেন্ডারের হাতে আত্মসমর্পণ করলেই ভালো করতেন, কিন্তু তা না করে তিনি পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন অভিশপ্ত ভবঘুরের মতো। শেষটা তিনি গিয়ে পড়লেন তপ্ত তৈল থেকে জ্বলন্ত আগুনে।

দরায়ুস পালালেন ইরানের উত্তর দিকে, আলেকজেন্ডারও ছুটলেন উত্তর দিকে। এগুতে এগুতে হঠাৎ একদিন দেখা গেল, পথের উপরে পড়ে রয়েছে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' উপাধিধারী পারসি সম্রাট তৃতীয় দরায়ুসের মৃতদেহ! তাঁর দেহের সর্বত্র ছোরার আঘাত (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দ)! সাম্রাজ্য স্থাপক, মহামহিমময় দিগ্বিজয়ী কুরুষ (Cyrus) থেকে যে রাজবংশের আরম্ভ, দরায়ুস তার শেষ বংশধর। আজকের পারস্যের রাজাও 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' উপাধিটির উপরে দাবি করেন বটে, কিন্তু সে যেন বিষম ঠাট্টার মতন শোনায়!

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দরায়ুসকে হত্যা করেছেন তাঁরই এক জ্ঞাতি, নাম—বেসাস। লোকটি ছিল ব্যাকট্রিয়ার ক্ষত্রপ বা শাসনকর্তা।

আলেকজেন্ডার রাগে জ্বলে উঠে বললেন, 'সম্রাট হত্যা! ছুটে চলো হত্যাকারীর পিছনে! যেখানে থাক, খুঁজে বার করো তাকে!'

বেসাস প্রমাদ গুণে ব্যাকট্রিয়ায় চম্পট দিলে। ব্যাকট্রিয়া হচ্ছে আফগানিস্তানের উত্তরে। বেসাস ভেবেছিল, আলেকজেন্ডার দেশ ছেড়ে কখনওই এত উত্তরে আসতে সাহস করবেন না।

আলেকজেন্ডার খবর পেলেন। আরও শুনলেন যে, পারস্য সাম্রাজ্যের উত্তরে যেসব শাসনকর্তা দরায়ুসকে হত্যা করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তারা বেসাসকেই বসাতে চায় 'সর্বশক্তিমানে'র সিংহাসনে। বেসাস নিজেও রাজ নাম গ্রহণ করেছে।

আলেকজেন্ডার ঝড়ের মতন ছুটলেন এই নূতন 'সর্বশক্তিমানে'র সর্বশক্তি খর্ব করতে। বেসাস

রক্ষা পেলে না, সে ধরা পড়ল এবং রাজহত্যার শাস্তিস্বরূপ তাকে প্রাণদণ্ড দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হল।

তারপর নানা খণ্ডযুদ্ধ, কষ্টস্বীকার ও গিরি-নদী-প্রান্তর অতিক্রম করবার পর আলেকজেন্ডার তুর্কিস্থান পর্যন্ত দখল করে ফেললেন। এখানে সেসব কথা না বললেও চলবে। কারণ, আলেকজেন্ডারকে বাধা দিতে পারে, এ অঞ্চলে এমন কোনও শত্রু ছিল না।

কিন্তু একদিনের কাহিনি উল্লেখযোগ্য।

তপনতপ্ত এশিয়ার এক মরু-প্রান্তর। আকাশের দিকে তাকানো যায় না, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গায়ে এসে লাগে যেন প্রখর অগ্নিবাণ, শুকনো ধু ধু প্রান্তরে কোথাও নেই জলবিন্দু। গ্রিক সৈন্যরা ধুঁকতে ধুঁকতে পথ চলতে গিয়ে এলিয়ে পড়ছে—দারুণ তৃষ্ণায় তাদের জিভ গেছে শুকিয়ে, প্রাণ করছে টা টা। নেই লোকালয়, নেই যেন পথের শেষ।

জনকয় সৈনিক অপূর্ব ও অভাবিত এক আবিষ্কার করলে। মাটির ভিতরে একটি গর্ত, তার ভিতরে একটুখানি জল!

একজন সৈনিক লোহার শিরস্ত্রাণ খুলে জলটুকু সংগ্রহ করলে। হাজার হাজার সৈনিক সেই জলের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে। কারণ, সেটুকু জলে তৃষ্ণানিবারণ হতে পারে মাত্র একজনের!

সৈনিক ভাবলে, রাজার দাবি সকলের আগে। সে জলটুকু এনে ধরলে আলেকজেন্ডারের সামনে।

রাজাও কম তৃষিত নন। তাঁরও ছাতি তখন যেন ফেটে যেতে চাইছে। তিনি বিপুল আগ্রহে সেই জলপূর্ণ শিরস্ত্রাণ টেনে নিয়ে নিজের ঠোঁটের কাছে তুললেন। তারপরেই দেখতে পেলেন, তৃষ্ণা-কাতর শতশত চোখের আকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে শিরস্ত্রাণের দিকেই।

শিরস্ত্রাণ সুদ্ধ দুই হাত ঠোঁটের কাছে থেকে নামিয়ে আলেকজেন্ডার বললেন, 'একজনের মতো জল, অথচ সবাই চায় তেষ্টা মেটাতে! সকলের আগে রাজার দাবি বলে আমি তো এ জল পান করতে পারি না।'

তিনি শিরস্ত্রাণ উপুড় করে ধরলেন—তৃষিত মাটির খানিকটা স্নিগ্ধ হল, ক্ষণিকের জন্যে।

কী স্বার্থত্যাগ, কী মহত্ত্ব! হাজার হাজার সৈনিক তৃষ্ণার জ্বালা ভুলে আলেকজেন্ডারের নামে করলে জয়ধ্বনি!

ইতিহাসে যেসব সেনাপতি নাম কিনেছেন, তাঁদের অনেকেই এমনি ভাবে সাধারণ সৈনিকদের সুখ-দুঃখ নিজের বলে মনে করে সেনাদলের কাছে হয়েছেন আদরের দেবতার মতন!

এই অঞ্চলে আলেকজেন্ডার সৈনিকদের নিয়ে বৎসরখানেক ধরে বিশ্রাম করেন। (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০-২৯ অব্দ) এবং এর মধ্যে কতকগুলি ছোটো বড়ো এমন ঘটনা ঘটে, যার দ্বারা ধরা পড়ে তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব।

তিনি আলেকজেন্দ্রিয়ার মতন নিজের নামে অনেকগুলি নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এইরকম নিজের নামে নূতন নগর-প্রতিষ্ঠার ঝোঁক শেষটা তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। আর কোনও দিগ্বিজয়ী এমন অহমিকা প্রকাশ করেননি।

শকরাজ অক্সিয়ার্তেজকে পরাজিত করে তিনি তাঁর কন্যা রোক্সানাকে বিবাহ করেন। আলেকজেন্ডারের ভাবপ্রবণ চিত্ত কি এখানেও তাঁর পরিকল্পনার প্রথম প্রকাশ দেখাবার চেষ্টা করেছিল? এই ঘটনায় তাঁর সঙ্গী গ্রিকগণ বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, কারণ, তাদের পক্ষে এটা ছিল ধারণাতীত! সাম্রাজ্যস্রষ্টা অভিজাত গ্রিকবীর হয়ে বর্বর ও অসভ্য রাজার মেয়েকে বিবাহ! কিন্তু তারা জানত না, এর পর এমন কত ঘটনা তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে!

আলেকজেন্ডার যখন ভারতে জয়পতাকা উড়িয়ে পারস্যের সুসা শহরে প্রত্যাগত, তখন তিনি দরায়ুসের মেয়ে স্তাতিরাকেও করেছিলেন নিজের অঙ্কলক্ষ্মী। সেই সময়ে সেখানে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়।

আলেকজেন্ডারের দেখাদেখি তাঁর কয়েক শত সেনাধ্যক্ষও এক একটি ইরানি সুন্দরীর পাণিপীড়ন করেন। আবার এইসব দেখে সাধারণ গ্রিক সৈনিকের সঙ্গে হয় দশ হাজারেরও বেশি পারসি কন্যার বিবাহ! ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার এমন বিবাহবন্ধনের কথা ইতিহাসে আর কখনও লেখা হয়নি!

আলেকজেন্ডার নিজেই তাঁর সৈনিকগণকে উৎসাহ দিতে ছাড়েননি। বহু সৈনিক পারস্যে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আলেকজেন্ডার নিজের তহবিল থেকে টাকা দিয়ে তাদের ঋণ পরিশোধ করে বলেন, 'এইবারে তোমাদের প্রত্যেককে পারসি মেয়ে বিয়ে করতে হবে!'

সেইখানেই আলেকজেন্ডার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি চান, ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—দুই মহাদেশের সর্বজাতি সম্মেলন! পিতৃকৃত্য পালনের জন্যে প্রথমে তিনি এশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন বটে, কিন্তু তারপরেই তাঁর শত্রু ভাব লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের মিলন ঘটাতে পারলে তার ফল হবে অত্যন্ত শুভ। তিনি যে কেবল এশিয়ার কন্যাদের গ্রহণ করেই এই মিলনস্বপ্নকে সফল করতে চেয়েছিলেন, তা নয়; পরে আমরা দেখাব, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি অবলম্বন করেছিলেন ওই এক পন্থাই।

বর্বর ও অসভ্য রাজকন্যা হলেও রোক্সানা হচ্ছে প্রাচ্যেরই মেয়ে এবং প্রাচ্য দেশ বলতে আলেকজেন্ডার কেবল পারস্যদেশই বোঝেননি।

আলেকজেন্ডার যখন সমরখন্দে, তখন বিশেষ একটি অন্যায় কাজ করেছিলেন।

ছয় বছর আগে গ্রানিকাস ক্ষেত্রে ক্লিটাস তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন, একথা বলা হয়েছে যথাসময়েই।

সমরখন্দের এক ভোজসভায় একদিন আলেকজেন্ডারের সঙ্গে তাঁর বন্ধু ক্লিটাসের ঝগড়া হল। দু-জনেই সমান ক্রুদ্ধ!

ক্লিটাস—রাজা বলে আলেকজেন্ডারকে সমীহ করলেন না। মুখে যা আসে তাই বলে গালাগালি দিতে লাগলেন।

শেষটা আলেকজেন্ডার আর সহ্য করতে পারলেন না। রাগে অজ্ঞান হয়ে বন্ধুর দেহে বসিয়ে দিলেন তীক্ষ্ণ বর্শা! তৎক্ষণাৎ ক্লিটাসের মৃতদেহ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

রাগের মাথায় এই অসম্ভব কাণ্ড করে ফেলে আলেকজেন্ডার কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর সহজ অবস্থা ফিরে এল। তারপরেই তিনি দুঃখে পাগলের মতন হয়ে উঠলেন।

বিষম অনুতাপে হঠাৎ তিনি বন্ধুর মৃতদেহে বিদ্ধ বর্শাটা একটানে খুলে নিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন।

ভাগ্যে সেখানে তাঁর দেহরক্ষী ছিল উপস্থিত। সে তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিলে।

এই হচ্ছে আলেকজেন্ডারের আর এক স্বরূপ। একদিকে তিনি ধীর, স্থির, ভাবুক, কাব্যপ্রিয়, নির্ভীক, উদার ও দয়ালু 'জনগণমনঅধিনায়ক'; আর একদিকে গোঁয়ার, ক্রোধে উন্মত্ত, অধীর, অহঙ্কারী, নিষ্ঠুর ও হিংস্র।

এমনকি, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন এই সন্দেহে পরে তিনি তাঁর পিতৃবন্ধু ও প্রবীণ সেনাপতি বৃদ্ধ পার্মেনিয়ো এবং তাঁর পুত্র ফিলোটাস এবং আরও অনেক বিখ্যাত সেনারক্ষীকে পর্যন্ত প্রাণদণ্ডে

দণ্ডিত করতে কুণ্ঠিত হননি! এবং পরে আমরা দেখব, ভারতবর্ষে গিয়েও তিনি তৈমুর লং ও নাদির শাহের মতোই নৃশংস হয়ে করেছিলেন কী দারুণ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান।

আবার এই লোকই পরম শত্রুকেও ক্ষমা করতে পেরেছিল হাসিমুখে। প্রমাণ, মহারাজ পুরু।

এক জলদস্যু-সম্পর্কীয় বিখ্যাত গল্পেও আলেকজেন্ডারের চরিত্রের এমনি মাধুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ডায়োমেডেস—নামজাদা বোম্বেটে। সমুদ্রের দিকে দিকে জাহাজ ভাসিয়ে নিজের সাংঘাতিক ব্যাবসা চালাত। সে কত বাণিজ্য-জাহাজ ডুবিয়েছে, কত পণ্য ও অর্থ হরণ করেছে, কত লোককে প্রাণে মেরেছে তার আর সংখ্যা নেই। শেষটা সে ধরা পড়ল। তাকে আলেকজেন্ডারের সম্মুখে এনে হাজির করা হল।

আলেকজেন্ডার ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ওরে ডাকাত, সমুদ্রে সমুদ্রে কোন সাহসে তুই এমন অত্যাচার করে বেড়াস?'

ডায়োমেডেস মৃত্যু নিশ্চিত জেনে নির্ভীক ভাবে বললে, 'রাজা, তার চেয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, দেশে দেশে কোন সাহসে আপনি এমন অত্যাচার করে বেড়ান? আমি তো একখানি মাত্র বোম্বেটে জাহাজের মালিক, আমি আর কতটুকু অত্যাচার করতে পারি? আর আপনি হচ্ছেন অগণ্য জাহাজের ফৌজের মালিক, জলে স্থলে দেশে দেশে নিয়ে যান ধ্বংস আর যুদ্ধ! তবু আমার উপাধি 'ডাকাত', আর আপনার উপাধি 'রাজা' ও 'দিগ্বিজয়ী'! অদৃষ্টের গতি যদি ফেরে, আমি যদি বেশি সফল হই আর আপনি হন কম সফল, তাহলে আমাদের উপাধি আর অবস্থাও বদলে যেতে কতক্ষণ!'

যুক্তি শুনে আলেকজেন্ডার রাগ করলেন না। ডাকাতকে বহু অর্থদান করে বললেন, 'কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে আর যেন ডাকাতি কোরো না।'

পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত। আলেকজেন্ডার এইবারে স্থির করলেন, তিনি সাম্রাজ্যের বাকি অংশটুকুকেও রেহাই দেবেন না। উত্তর ভারতে যদি পারস্যের দাবি না থাকত, তাহলে আলেকজেন্ডার ভারতের মাটি মাড়াতেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

কিন্তু রণক্ষেত্রে গ্রিকরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে একাধিক বার পরিচিত হবার সুযোগ পেলেও ভারতবর্ষ ছিল তাদের কাছে এক অজানা রহস্যময় অতি দুর্গম দেশ। কোথায় গ্রিস, আর কোথায় ভারতবর্ষ! মাঝে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান! আজকাল ট্রেন, বাষ্পীয় জাহাজ ও এরোপ্লেনের যুগে, গ্রিস থেকে ভারতবর্ষে যেতে কোনও দুশ্চিন্তা হয় না, কিন্তু সে যুগে পায়ে হাঁটা পথে এই দুই দেশে আনাগোনা করার কথা স্বপ্নেও কেউ মনে আনতে পারত না। তার উপরে গ্রিকদের যেতে হবে শত্রু রূপে, পথে কোনও সাহায্য পাবার আশা নেই—আছে পদে পদে শুধু বিপদ ও মৃত্যুর সম্ভাবনা!

এবং কত বৎসর আগে গ্রিকরা স্বদেশ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পিছনে ফেলে এসেছে! চিরশত্রু পারস্যের পতন হল, এখনও আবার নূতন অভিযানের প্রস্তাব!

গ্রিকরা ভারতবর্ষে যেতে ভয় পেলে এবং তাদের মনও কাঁদতে লাগল দেশের জন্যে।

আলেকজেন্ডার নিজের সৈনিকদের মন জানতেন। তারা যে তাঁকে পিতার মতো, দেবতার মতো ভালবাসে, এ সত্যও তাঁর অজানা ছিল না। তাদের মন ফেরাবার গুপ্ত অস্ত্র তাঁর কাছেই ছিল। অবশেষে তিনি সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করলেন।

বললেন, 'বেশ, তাই হোক। যদিও আমি জানি এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে গেলে আমরা

পালিয়ে যাচ্ছি ভেবে শত্রুরা আমাদের পিছন থেকে বারংবার আক্রমণ করবে, তবু তোমাদের ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না। বেশ, দেশেই যাও! তোমাদের আমি ত্যাগ করলুম!'

আলেকজেন্ডার তাদের ত্যাগ করবেন! তাদের বন্ধুর মতো, পিতার মতো, দেবতার মতো আলেকজেন্ডার তাদের ত্যাগ করবেন! এতবড়ো দুর্ভাগ্য তারা ধারণাতেই আনতে পারলে না। না, না, এ হতেই পারে না—অসম্ভব!

সৈনিকেরা সমস্বরে বলে উঠল, 'রাজা, রাজা! আমরা দেশে যেতে চাই না, আমরা তোমার সঙ্গে থাকতে চাই! তোমার সঙ্গে আমরা পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও যেতে রাজি!'

ভারতবর্ষেই যাওয়া স্থির হল।

এক দেশ থেকে আর এক দেশ, এক সভ্যতা থেকে সভ্যতার অন্তঃপুরে বিজয়ী বীরের মতন প্রবেশ করবার জন্যে আর একবার অগ্রসর হলেন আলেকজেন্ডার। ছিলেন ম্যাসিডনের ক্ষুদ্র নরপতি, আজ হয়েছেন বিশ্ববিজয়ী সম্রাট! কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেন, ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ পেয়েও এবং শক্তির মদিরা পান করেও কোনও দিন তিনি আত্মহারা হননি। মানুষের তুচ্ছতা অসহায়তা কতখানি সেটা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।

পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা কুরুষের সমাধিভবন। একদিন আলেকজেন্ডার সেখানে গিয়ে উপস্থিত।

তিনি সমাধি প্রস্তরের উপরে লেখা এই কথাগুলি পড়লেন :

'হে মানুষ, তুমি যেইই হও এবং যেখান থেকেই তোমার আগমন হোক—কারণ আমি জানি তুমি আসবেই—আমার এই কথাগুলি শুনে রাখো : আমি হচ্ছি সেই কুরুষ—পারসিদের জন্যে যে বিপুল সাম্রাজ্য জয় করেছিল : আজ এই যে একমুঠো মাটি হয়েছে আমার আবরণ, এর জন্যে তুমি আমাকে হিংসা কোরো না।'

শোনা যায়, এই লিপি পাঠ করবার পর আলেকজেন্ডার মনুষ্য জীবনের নশ্বরতা ও অনিশ্চয়তার কথা স্মরণ করে ভাবের আবেগে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

নবম অধ্যায়

ভারতের অযাচিত অতিথি

আলেকজেন্ডার যে সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন উত্তর ভারতে বাস করতেন প্রধানত হিন্দুরাই। প্রধানত বললুম এইজন্যে, ভারতে তখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়নি। হিন্দুদের তুলনায় বৌদ্ধ ও জৈনরা ছিল মুষ্টিমেয়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে তখন খ্রিস্ট ও মুসলমান ধর্ম আত্মপ্রকাশই করেনি। আর একটি কথা। তখন ভারতে প্রচলিত ছিল বৈদিক হিন্দুধর্ম—যার মধ্যে পৌত্তলিকতা নেই। পৌত্তলিক ছিলেন ইউরোপীয় গ্রিকরাই।

উত্তর ভারতের সীমান্ত প্রদেশে তখন হিন্দু ছাড়া অভারতীয় আরও নানা জাতি বাস বা আনাগোনা করত। ও-অঞ্চলে তখন একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল, তার নাম তক্ষশীলা (বর্তমান রাওলপিন্ডির অদূরে)। তক্ষশীলা গান্ধার রাজ্যের অন্তর্গত—মহাভারতের গান্ধারী এখানকারই রাজকন্যা। প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার জন্যে তক্ষশীলা ছিল অদ্বিতীয়। কোনও কোনও বিভাগে তখনকার বারাণসীও তার কাছে দাঁড়াতে পারত না।

উত্তর ভারতে তখন বিশেষ কোনও বড়ো রাজা ছিলেন না। তবে ওরই মধ্যে পুরু ও তক্ষশীলার

ও অভিসারের রাজারা শ্রেষ্ঠতার দাবি করতে পারতেন বটে। খুব বড়ো না হোন, পুরু নিতান্ত তুচ্ছ রাজাও ছিলেন না, কারণ তাঁর রাজ্যে তিন শত নগর ছিল বলে শোনা যায়। ঝিলাম ও চিনাব নদের মাঝখানে ছিল রাজা পুরুর রাজ্য।

হিন্দুস্থানে তখন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন পাটলিপুত্রের নন্দ—আলেকজেন্ডারের সঙ্গে যাঁর শক্তি পরীক্ষা হয়নি।

সীমান্ত প্রদেশ এখনকার মতন তখনও বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেসব জায়গাকার রাজ্য ও রাজ্যের নাম ভারতীয় পুথিপত্রে পাওয়া যায় না। গ্রিক ঐতিহাসিকরা অনেক জাতির ও রাজ্যের নাম করেছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ নাম পড়েই আজ তার কিছু বোঝবার জো নেই। এর কারণ, গ্রিকরা ভারতীয় নাম শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করতে পারতেন না। এমন বিকৃত করে ফেলতেন যে, প্রায়ই আসল নামের সঙ্গে কিছুই মিলত না। যেমন ঝিলামকে তাঁরা ডাকতেন Hydaspes বলে এবং তাঁদের কাছে চিনাব ছিল Akesines! আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা বহু চেষ্টার পর কোনও কোনও দেশ বা জাতির অবস্থান অনুমান করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু নানা ক্ষেত্রে তা অনুমান মাত্র, কারণ, তা নিয়ে নেই তর্কবিতর্কের অভাব। তখনকার ওইসব খণ্ডরাজ্যের কোনওটিই আজ বর্তমান নেই।

ওখানকার বাসিন্দারাও আজ ধর্মান্তর গ্রহণ করে নিজেদের সমস্ত প্রাচীন অবদান হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তারা একটি বিশেষত্ব হারায়নি। সে যুগেও সীমান্তের বাসিন্দারা ছিল যুদ্ধপাগল। তারা কারুর অধীনতা স্বীকার করতে রাজি ছিল না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যে-কোনও বৃহৎ ও পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করত। আজও তাদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়নি।

আর একটি ছোটো রাজ্যের কথা চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য। এ রাজ্যের নাম আজ কেউ জানে না, কিন্তু রাজার নাম ছিল, হস্তী। এটুকুও জানা গিয়েছে, রাজা হস্তীর দেশ ছিল তক্ষশীলারই অদূরে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দের বসন্তকাল। পর্বতমালার তুষারআবরণ গলে পড়ছে সূর্যের তপ্ত ছোঁয়ায়।

এই পর্বতমালার নাম, হিন্দুকুশ। ইউরোপীয়রা একে ভারতীয় ককেসাস বলেও ডাকে। ভারতের বিপুল সিংহদ্বারে চিরদিন সে দাঁড়িয়ে আছে দিগ্‌বিদিক পূর্ণ করে আকাশঢাকা বিরাট প্রহরীর মতো।

আলেকজেন্ডার সসৈন্যে হিন্দুকুশ পার হলেন। তারপর প্রবেশ করলেন ভারতবর্ষে। বলা বাহুল্য, তখন আফগানিস্তানের নাম কেউ শোনেনি। ও জায়গাটি ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত ছিল।

আলেকজেন্ডার কত সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন? আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা হয়তো গ্রিকদের—অর্থাৎ ইউরোপীয়দের—গৌরব বাড়াবার জন্যেই বলেছেন, তাঁর সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট হাজারের বেশি ছিল না। কিন্তু আমাদের মতে এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক বা লেখকদের কথাই অধিকতর প্রামাণিক। প্লুটার্ক পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, ভারতীয় অভিযানে আলেকজেন্ডারের সঙ্গে ছিল পনেরো হাজার অশ্বারোহী ও এক লক্ষ বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য। এ হিসাব অস্বীকার করবার প্রমাণ নেই।

এর উপরেও পথে আসতে আসতে আলেকজেন্ডার যে পেশাদার সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। অভিসারের রাজা ও তক্ষশীলার রাজা অম্ভি এবং আরও কোনও কোনও নরপতি আলেকজেণ্ডারের পক্ষ অবলম্বন না করে পারেননি। গ্রিক লেখকরা বলেছেন, তাঁরাও গ্রিক দিগ্বিজয়ীকে বহু সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং কম করে ধরলেও আমরা বলতে পারি, আলেকজেন্ডার যখন পাঞ্জাবে আসেন তখন তাঁর সৈন্যসংখ্যা নিশ্চয়ই দুই লক্ষের কম ছিল না।

আধুনিক জালালাবাদের কাছে এসে আলেকজেন্ডার তাঁর সৈন্যগণকে দুই দলে বিভক্ত করলেন।

জেনারেল হিফেসান ও পার্ডিকামের উপরে হুকুম দেওয়া হল, তাঁরা যেন কাবুল নদীর ধার ধরে সিন্ধু নদের তটে গিয়ে হাজির হন।

সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ রাজাই বন্ধুতা স্বীকার করলেন। কিন্তু রুখে দাঁড়ালেন একজন, নাম তাঁর হস্তী। তিনি যে খুব বড়ো বা বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তা নয়। খ্যাতি প্রতিপত্তিতে তক্ষশীলার রাজা তাঁর চেয়ে ঢের বেশি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেবল শ্রেষ্ঠ নন, বেশি বুদ্ধিমানও ছিলেন নিশ্চয়! কারণ, আলেকজেন্ডারকে বাধা দেওয়া অসম্ভব বুঝে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি, নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে গ্রিকদের সঙ্গে মহারাজা হস্তীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও আপত্তি করেননি।

কিন্তু মহারাজা হস্তীর কাছে প্রাণের চেয়ে মানের গৌরবই ছিল বড়ো। তিনিও জানতেন, গ্রিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার মানেই হচ্ছে বালির বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের গতিরোধ করবার দুশ্চেষ্টা। তবু তিনি বললেন, প্রাণ দেব কিন্তু স্বাধীনতা দেব না! তারপর যেমন অসমসাহসে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ক্ষুদ্র বেলজিয়াম, তিনিও তেমনি পথরোধ করে দাঁড়ালেন গ্রিক বন্যার সুমুখে।

ছোট্ট রাজ্য, অল্প শক্তি। তবু দীর্ঘ একমাসকাল ধরে মহারাজা হস্তী গ্রিকদের বাধা দিয়েছিলেন, আর্যাবর্তে প্রবেশ করতে দেননি। তারপর অসম্ভব আর সম্ভবপর হল না। ইংরেজ ও ফরাসিরা সাহায্য করেও বেলজিয়মকে রক্ষা করতে পারেনি, কিন্তু হস্তীকে সাহায্য করবার জন্যেও আর কোনও ভারতীয় রাজা অগ্রসর হলেন না। বিশ্ববিজয়ী গ্রিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র এক প্রাদেশিক শাসনকর্তা কতদিন আর দাঁড়াতে পারেন? মহারাজা হস্তীর পরিণাম কী হল তা জানি না, কিন্তু তাঁর রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। খুব সম্ভব হস্তীও করেছিলেন আত্মদান।

আশ্চর্য কথা যে, ভীমার্জুনের যোগ্য বংশধর এমন এক হিন্দু বীরের কাহিনি ভারতের কোনও পুরাণে বা গ্রন্থে স্থান লাভ করেনি, তাঁর কথা আমরা জানতে পারি গ্রিক লেখকদের কাছ থেকেই।

আলেকজেন্ডারের সমগ্র ভারতীয় অভিযানের কথা বিস্তৃত ভাবে বলতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখতে হয়। আমাদের এখানে অত জায়গা নেই, কারণ, আমাদের বলতে হবে সংক্ষেপে আলেকজেন্ডারের গোটা জীবনের কথা। অতএব এখানে ভারতীয় অভিযানের কেবল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিই বলব।

একদল গ্রিক ভারতবর্ষের ভিতরে প্রবেশ করলে, কিন্তু আলেকজেন্ডার তখন তাদের সঙ্গী হলেন না। সীমান্তের পার্বত্য জাতিদের কিছু কিছু বীরত্বের পরিচয় পেয়েই তিনি বুঝলেন, এদের পিছনে রেখে ভারতের ভিতরে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা!

বাকি সৈন্য নিয়ে তিনি পার্বত্য জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। চারিদিকে কেবল শত্রুপরিপূর্ণ পাহাড়ের পর পাহাড়; গ্রীষ্ম এল সূর্যের অগ্নিবৃষ্টি নিয়ে; শীত এল ভয়াবহ তুষার নিয়ে; তার উপরে নির্ভীক ভারতসন্তানদের অস্ত্র প্রতিপদে বর্ষণ করতে লাগল মৃত্যুর অভিশাপ। পার্বত্য জাতিদের দমন করবার জন্যে আলেকজেন্ডারের দরকার হল দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ। পারস্যেও তাঁকে এত বাধা পেতে হয়নি।

চিত্রল নদীর কাছে একটি নামহীন গিরি নগর। কোনও অনামা ভারতীয় বীরের বাণে আলেকজেন্ডার এখানে সর্বপ্রথমে আহত হন। এই ব্যাপারে গ্রিক সৈন্যরা এমন খাপ্পা হয়ে উঠল যে, তারা নগরটিকে একেবারে ভূমিসাৎ করে সমস্ত বাসিন্দাকে হত্যা করলে।

বাজর প্রদেশে 'আস্পাসিয়ান' নামক জাতিকে মস্ত একটি যুদ্ধে পরাজিত করে আলেকজেন্ডার বন্দি করলেন প্রায় চল্লিশ হাজার লোক। তারপর তিনি অগ্রসর হলেন 'আস্যাকেনই'দের বিরুদ্ধে। এই

জাতি বাস করত মালাকান্দ গিরিসঙ্কটের অদূরে। ওখানে তাদের একটি বিখ্যাত ও বৃহৎ নগর ছিল, নাম—মাসাগা। এখানে একটি বিষম লড়াই হয় এবং আলেকজেন্ডার আহত হন দ্বিতীয়বার। যুদ্ধে মাসাগার রাজা মারা পড়লেন এবং তার ফলে দুর্গ ও নগর হল গ্রিকদের হস্তগত।

তারপর যা হল, আলেকজেন্ডারের পক্ষে বড়ো কলঙ্কের কথা। গ্রিক ঐতিহাসিকরাও তাঁকে নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছেন।

মাসাগার দুর্গে সাত হাজার ভারতীয় পেশাদার সৈন্য ছিল। তারাও বন্দি হয়েছিল।

আলেকজেন্ডার বললেন, 'তোমাদের আমি মুক্তি দিলুম। কিন্তু এই শর্তে যে, তোমরা আমার ফৌজে ভরতি হবে।'

ভারতীয় সৈনিকেরা খানিক দূর গিয়ে ছাউনি ফেললে। সঙ্গে তাদের স্ত্রী ও সন্তানরাও ছিল।

কিন্তু তাদেরও মধ্যে ছিল রাজা হস্তীর মতন জ্বলন্ত বীরত্ব ও প্রবল স্বদেশানুরাগ। তারা পেশাদার হলেও ভারতের শত্রুর অধীনে চাকরি করে স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে রাজি হল না। তারা স্থির করলে, সেই রাত্রেই এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে।

আলেকজেন্ডার এই কথা শুনেই রাগে আগুন হয়ে উঠলেন। তারপর গোপনে রাত্রের অন্ধকারে করলেন তাদের চারিধার অতর্কিতে থেকে আক্রমণ।

ভারতীয় বীরেরা নিশ্চিন্ত হয়েছিল—কারণ তারা জানত, যুদ্ধের কোনওই সম্ভাবনা নেই।

এখন বিস্মিত হয়ে দেখলে, চতুর্দিকেই অস্ত্রধারী শত্রু! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়েই তারা স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের মাঝখানে রেখে মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে অস্ত্রধারণ করলে।

সাত হাজার মাত্র ভারত সন্তান, কিন্তু গ্রিকদের সংখ্যা হয় না। তবু ভারতীয়রা অস্ত্রত্যাগও করলে না, আলেকজেন্ডারের চাকর হয়ে মাতৃভূমির কুসন্তান হতেও রাজি হল না। এমনকি, দলের ভারত নারীরাও দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে স্বহস্তে অস্ত্রচালনা করতে ভয় পেলে না! এসব ঐতিহাসিক সত্য।

অবশেষে তারা সকলেই একে একে ভারতের মাটি নিজেদের বুকের রক্তে রাঙা করে—গ্রিক ঐতিহাসিকেরই ভাষায়—'অপমানকর জীবনের পরিবর্তে গৌরবজনক মৃত্যুকে' বরণ করে নিলে।

পেশাদার গ্রিক সৈন্যরা পারস্য সম্রাটের চাকরি নিয়ে গ্রিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তাই আলেকজেন্ডার ঘৃণাভরে তাদের দেশদ্রোহী বলে প্রত্যেককে বধ করতে হুকুম দিয়েছিলেন। অথচ এখানে দেশদ্রোহী হতে চাইলে না বলেই সাত হাজার মহাবীর ভারতসন্তানকে রীতিমতো কাপুরুষের মতন হত্যা করা হল! তারপর দুই হাজার বৎসরেরও বেশি কাল চলে গিয়েছে, কিন্তু ইতিহাস আজও আলেকজেন্ডারের কলঙ্ক কাহিনি ভোলেনি।

ভারতের বীরত্বকাহিনিরও সঙ্গে জড়িত আছে ভারতের লজ্জা। সেকালে শশীগুপ্ত নামে এক হিন্দু ছিল, সে-ও যুদ্ধ ব্যবসায়ী। আগে সে দরায়ুসের হত্যাকারী ও ব্যাথট্রিয়ার রাজা বেসাসের সেনাদলে ভরতি হয়েছিল, তারপর আলেকজেন্ডারের দলে গিয়ে সেনাধ্যক্ষের কাজ পায়। ভারত আক্রমণ করবার সময়ে এই শশীগুপ্ত নানা দিক দিয়ে আলেকজেন্ডারকে সাহায্য করেছিল।

এই সময়ে বা এর কিছু পরে আলেকজেন্ডারের সঙ্গে ভবিষ্যতের ভারত সম্রাট ও গ্রিকদের দর্পচূর্ণকারী, কিন্তু তখন নির্বাসিত চন্দ্রগুপ্তের আলাপ পরিচয় হয়েছিল।

এরপর আরও কয়েকটি দেশ দখল করে গ্রিকরা অগ্রসর হল ঝিলাম নদের দিকে।

গ্রিকরা এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল তার প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে, উত্তর ভারত ছিল ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত এবং সেখানকার কোনও রাজাই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বিবাদ ভুলে দেশ রক্ষার জন্যে

পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারতেন না। কাজেই নিজের বিপুল বাহিনী নিয়ে আলেকজেন্ডার একে একে সকলকেই পরাজিত করলেন।

এইবারে মহারাজা পুরুর পালা। মহারাজ হস্তীর মতন তিনিও ভারতের শত্রুকে পথ ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না, সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। যদিও তাঁর সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি হল না, তবু তাই নিয়েই তিনি বৃহত্তর গ্রিকবাহিনীকে বাধা দিতে ছুটলেন।

খবর পেয়ে আলেকজেন্ডারও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন! আগে তিনি পুরুকে পত্রে জানিয়েছিলেন, 'রাজা, অন্যান্য সকলের মতন তুমিও আমার বশ্যতা স্বীকার করো।'

পুরু সগর্বে উত্তর দেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে যাব। কিন্তু সসৈন্যে। আমাদের দেখা হবে রণক্ষেত্রে।'

এরপর যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় রইল না।

দশম অধ্যায়

ঝিলামের যুদ্ধ এবং তারপর

শিয়ালকোটের মাইল পঞ্চাশ উত্তর-পশ্চিমে ঝিলাম শহর। তার পাশে কারি প্রান্তর। সেইখানে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে জুনের শেষে কিংবা জুলাইয়ের প্রথম দিকে আলেকজেন্ডারের সঙ্গে পুরুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু বিশেষ বড়ো যুদ্ধ নয়। গ্রিক ও অন্যান্য পাশ্চাত্য লেখকরা আলেকজেন্ডারের মহিমাকীর্তনের জন্যেই একটি সাধারণ যুদ্ধকে অসাধারণ বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এর চেয়ে ঢের বড়ো যুদ্ধ হয় সেলিউকসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের। কিন্তু সেখানে গ্রিকরা পরাজিত হয়েছিল, তাই গ্রিক লেখকরা তার কোনও বর্ণনাই দেননি।

পাহাড়ের বরফ গলা জল নদীতে এসে পড়েছে, ফুলে উঠেছে তাই ঝিলামের বুক।

নদীর এক পারে গ্রিক ফৌজ, আর এক পারে ভারতীয় শিবির।

গ্রিকদের ভাবভঙ্গি দেখে পুরু ভাবলেন, নদীর জল না কমলে আলেকজেন্ডার পার হবার চেষ্টা করবেন না। পুরুকে ঠকাবার জন্যেই আলেকজেন্ডার এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

এক দুর্যোগের রাত। বৃষ্টি পড়ছে মুষল ধারে। আলেকজেন্ডার গোপনে একদল সৈন্য নিয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে নদী পার হলেন।

পুরু কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি নদীর পরপারের গ্রিক সৈন্যদের সামনাসামনি জায়গা বেছে ব্যূহ রচনা করেছিলেন। হঠাৎ অন্যদিক থেকে গ্রিকরা আক্রমণ করতে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি ব্যূহের মুখ ফেরাতে গেলেন, এমন সময়ে ওপার থেকেও গ্রিকরা নদী পার হতে লাগল। তিনি কোন দিক সামলাবেন বুঝতে না বুঝতেই প্রায় চারিদিক থেকেই আক্রান্ত হলেন। তাঁর সামনে আলেকজেন্ডার, পিছনে ওপারের গ্রিক ফৌজ।

আলেকজেন্ডারের চমৎকার রণকৌশলে পুরুকে পরাজিত হতে হল।

পুরু নিজে বীরের মতন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিলেন। তার পর দেহের নয় জায়গায় আহত হয়ে যখন প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছেন, তখন গ্রিকরা তাঁকে বন্দি করতে পারলে।

পুরুকে নিয়ে যাওয়া হল গ্রিক দিগ্বিজয়ীর শিবিরে।

আলেকজেন্ডার মুগ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন, সাড়ে-ছয় ফুট দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও গৌরবর্ণ দেহ।

সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে, যুদ্ধশ্রমে ও রক্তপাতে ক্লান্ত শরীর—মাথা তবু উঁচু, দৃষ্টি তবু তেজে পরিপূর্ণ! মূর্তিমান বীরত্ব!

আলেকজেন্ডার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বীর, তোমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করব?'

পুরু সগর্বে উত্তর দিলেন, 'রাজার সঙ্গে রাজার মতো!'

আলেকজেন্ডার তাই করেছিলেন—বীর হয়ে তিনি বীরের মর্যাদা ভুললেন না। পুরুর রাজ্যই কেবল পুরুকে ফিরিয়ে দেওয়া হল না—সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের দেশের চেয়ে বড়ো দেশের শাসনভার লাভ করলেন।

এই যুদ্ধকে স্মরণীয় করবার জন্যে আলেকজেন্ডার ভারতে দুইটি নূতন নগর স্থাপন করলেন এবং তার একটির নাম বৌকেফালা। তাঁর আদরের ঘোড়া যণ্ডমুণ্ড এতদিন পরে ভারতে এসে বুড়ো হয়ে মারা পড়েছে—তার নামেই এই নগরটির নামকরণ! সে নাম আর নেই, কারণ, নগরটি আজ ঝিলাম নামে প্রসিদ্ধ।

ঝিলামের যুদ্ধ চরম যুদ্ধও নয়। কারণ, তখনও আলেকজেন্ডারের চারিদিকেই শত্রু! কাজেই তাঁকে ক্রমাগত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকতে হল। এসব যুদ্ধের বর্ণনা অনাবশ্যক।

তারপর আলেকজেন্ডার স্থির করলেন, তিনি মগধের দিকে অগ্রসর হবেন! তিনি বুঝেছিলেন, আসল ভারত এখনও তাঁর নাগালের বাইরে পড়ে আছে।

সত্যই তাই। আর্যাবর্তের প্রধান সাম্রাজ্য তখন মগধ। ভারতে এসে এতদিন পর্যন্ত আলেকজেন্ডার যেসব রাজ্য অধিকার করেছেন, আকারে ও ক্ষমতায় মগধের কাছে তারা নগণ্য বললেও চলে।

কিন্তু মগধের ফৌজে ছিল আশি হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধরথ ও ছয় হাজার হস্তী। মগধরাজ ইচ্ছা করলে তাঁর বাহিনীকে আরও ঢের বড়ো করে তুলতে পারতেন, কারণ, তাঁর জনবল ও অর্থবল ছিল অফুরন্ত।

গ্রিক সৈন্যদের কানেও এসব খবর গিয়েছিল। তারা আলেকজেন্ডারের ইচ্ছার কথা শুনে প্রমাদ গুনলে।

সৈন্যদের ভাবভঙ্গি দেখে আলেকজেন্ডার তাদের উৎসাহিত করবার জন্যে বললেন, 'গ্রিক বীরগণ! স্মরণ করে দ্যাখো, গ্রিসের প্রান্ত থেকে ভারতের এই সিন্ধুনদের প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা কী অতুল বীরত্বের ও কী অক্ষয় গৌরবের প্রতিষ্ঠা করেছ! আমার সঙ্গে অগ্রসর হও—সমস্ত এশিয়া ও তার সমস্ত ধনসম্পত্তি আমি তোমাদেরই হাতে তুলে দেব!'

কিন্তু সৈন্যরা আর এসব কথা শুনতে নারাজ, তারা স্তব্ধ হয়ে রইল।

অবশেষে সেনাপতি কইন্‌স সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'রাজা, আট বছর আমরা স্বদেশ ত্যাগ করে এসেছি। আমাদের অনেকেই মারা পড়েছে। যারা বেঁচে আছে তাদেরও অবস্থা ভালো নয়। এখন আমাদের দেশেই ফেরা উচিত।'

সৈনিকরা চারিধারে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। কইন্‌সের কথা শেষ হতেই তারা সানন্দে চিৎকার করে সেনাপতির মতো সমর্থন করলে। তইতেই বোঝা গেল সৈনিকদের মনের গতিক।

আলেকজেন্ডার অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কিন্তু তিনি যে মত পরিবর্তন করেছেন, এমন কোনও ভাব প্রকাশ করলেন না। জবাব না দিয়ে নিজের তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তাঁবুর বাইরে কেউ আলেকজেন্ডারের দেখা পেলে না। সেখানে তিনি কী করছেন? ভাবছেন আর ভাবছেন। মনের ভিতরে তিনি ভবিষ্যতের জন্যে হয়তো একখানি

বিশ্ব-বিস্তৃত নূতন মানচিত্র এঁকে রেখেছিলেন। হয়তো তার অনেকখানিই এখন তাঁকে গুটিয়ে ফেলতে হল। সৈনিক না পেলে দিগ্বিজয় অসম্ভব। কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত সৈনিকরাই আজ বিদ্রোহী। এদের মন তাঁর মতো বিশ্বগ্রাসী নয়। তাঁর কোনও কথাতেই ওরা আর বশ মানবে বলে বোধ হয় না।

তৃতীয় দিনে আলেকজেন্ডার আবার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জ্যোতিষীরা এসে বললে, 'রাজা, গুণে দেখলুম, লক্ষণ মন্দ। গ্রহদেবতারা আপনার প্রতি এখন বিমুখ।'

জ্যোতিষীদের আর মাথা না ঘামালেও চলত। আলেকজেন্ডার এর আগেই মন স্থির করে ফেলেছেন। নীরস বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'সৈন্যগণ, আমরা স্বদেশে যাত্রা করব।' (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬)।

কিন্তু এ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন, না, পলায়ন? আলেকজেন্ডার মগধের ভয়ে ভারত ছেড়ে সরে পড়েছিলেন, এমন কথা বললে আধুনিক ইউরোপীয়রা আমাদের তেড়ে মারতে আসবেন। কিন্তু মেগাস্থেনেসের ভারতভ্রমণ নিয়ে আলোচনা করবার সময়ে প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক দায়াদরাস কী বলছেন শুনুন:

'মাসিডনপতি আলেকজেন্ডার সকলকেই পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি মগধের সঙ্গে লড়াই করতে সাহসী হননি। তিনি ভারত অধিকারের ইচ্ছা দমন করেন মগধের সৈন্যবলের কথা শ্রবণ করে।'

এর উপরে আমাদের টীকা অনাবশ্যক।

ইতিমধ্যে গ্রিস থেকে পঁচিশ হাজার—কেউ কেউ বলেন, ছত্রিশ হাজার নূতন সৈনিক এসে পড়ল। তারা এসেছিল দিগ্বিজয়ের অংশ গ্রহণ করতে, কিন্তু ধুলো পায়েই তাদের আবার দেশের দিকে মুখ ফেরাতে হল। তবে তাদের পেয়ে সুবিধাই হল আলেকজেন্ডারের। কারণ, প্রত্যাবর্তনের পথ কেবল সুদীর্ঘই নয়, আলেকজেন্ডারের পক্ষে যথেষ্ট বিপদসঙ্কুলও হয়েছিল। সৈন্যবল অল্প হলে তাঁর অবস্থা কী হত বলা যায় না।

আলেকজেন্ডার স্থির করলেন, প্রত্যাবর্তন করবেন নূতন পথ দিয়ে। কেবল স্থলপথ নয়, অবলম্বন করবেন জলপথও। তাঁর মন ছিল নব নব পথের নেশায় পাগল। তিনি নূতন নূতন দেশ দেখে নূতন নূতন আবিষ্কার করে নিজের এবং পৃথিবীর জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে তুলতে চান। এ কেবল দিগ্বিজয়ীর নয়, বৈজ্ঞানিকের মন।

আলেকজেন্ডার প্রায় দুই হাজার জাহাজ সংগ্রহ করলেন। খ্রি. পূ. ৩২৬ অব্দের অক্টোবর মাসের শেষাশেষি সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হল। যাবার সময়ে তিনি মহারাজা পুরুর রাজ্যসীমা বাড়িয়ে তাকে উত্তর ভারতের সর্বপ্রধান রাজ্যে পরিণত করে গেলেন। এইতেই বোঝা যায়, পুরুকে তাঁর ভালো লেগেছিল কতখানি! শত্রু আলেকজেন্ডার যেমন ভয়াবহ, মিত্র আলেকজেন্ডার তেমনি মিষ্টচরিত্র!

ভারতের জলপথ গ্রিক নৌবাহিনী নিয়ে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হল। মাঝে মাঝে আলেকজেন্ডারকে ডাঙায় নেমে যুদ্ধ করতে হয়। ফেরবার পথেও তিনি ছোটো বড়ো কয়েকটি যুদ্ধজয় করেছিলেন। এ পথে তাঁর সবচেয়ে বড়ো ও বিখ্যাত যুদ্ধ হয়, মালবদেশে। এখানে আলেকজেন্ডারের বিরুদ্ধে কয়েকটি জাতি একসঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল। এবং অস্ত্র ধরে দাঁড়িয়েছিল নাকি প্রায় এক লক্ষ লোক। শত্রুদের সংখ্যা দেখে গ্রিকরা প্রথমে ভয়ে পালাতে চেয়েছিল, পরে আলেকজেন্ডারের উৎসাহ বাণী শুনে ফিরে দাঁড়ায় ও যুদ্ধে জয়লাভ করে।

এই অঞ্চলেই মুলতান নগর আক্রমণ করতে গিয়ে আলেকজেন্ডার এমন আহত হয়েছিলেন যে, তাঁর বাঁচবার আশা ছিল না। মালবদেশে গ্রিক সৈন্যরা একাধিকবার বিষম হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিল। —এমনকি, আত্মরক্ষায় অক্ষম নারী ও শিশুদেরও ক্ষমা করেনি।

আলেকজেন্ডার তাঁর নৌসেনাপতিকে বললেন, সিন্ধুনদের মুখ থেকে বেরিয়ে নৌবহর নিয়ে পারস্য উপসাগর দিয়ে দেশের দিকে অগ্রসর হতে। এবং তিনি নিজে যাত্রা করলেন বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়ে। ভীষণ সে যাত্রা! মরুপ্রদেশের মধ্যে গ্রীষ্মাধিক্যে, অনাহারে ও জলাভাবে দলে দলে লোক প্রত্যহ মারা পড়তে লাগল। তিন মাস কালব্যাপী নরক যন্ত্রণা ভোগ করে আলেকজেন্ডার যখন পারস্যের সুসা শহরে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তাঁর ফৌজের অর্ধেক সৈন্য মৃত! (খ্রিস্টপূর্ব ২২৪) ঘটনা অনেকটা নেপোলিয়ানের মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনের মতো।

আলেকজেন্ডারের জীবনের আর এক বৎসর মাত্র বাকি আছে।

একাদশ অধ্যায়

যবনিকা

পারস্যে উপস্থিত হয়েই আলেকজেন্ডার খবর পেলেন, ভারতে গ্রিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে এবং তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তা ফিলিপস নিহত! কিন্তু যে সাংঘাতিক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁকে ভারত ত্যাগ করতে হয়েছে, তার ফলে তিনি এখন শক্তিহীন, সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করবার কোনওই উপায় নাই। এর পরেও আর তিনি ভারতের দিকে দৃষ্টি করবার অবসর পাননি। এর অল্পদিন পরেই চন্দ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্যের মহিমায় ভারত আবার গ্রিকদের হাতছাড়া হয়। আলেকজেন্ডার জীবিত থাকলে খুব সম্ভব চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর একবার শক্তি পরীক্ষা হত এবং পৃথিবীর ইতিহাসে সেটা হত একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা! দুই প্রতিভার সংঘর্ষ!

পারস্যে ফিরে আলেকজেন্ডার আবার তাঁর পরিকল্পনাকে মূর্তি দেবার চেষ্টা করলেন। কতক কথা আগে বলা হয়েছে।

ভারতে তিনি যেমন মহারাজা পুরুর হস্তে নিজের জয় করা রাজ্যগুলি সমর্পণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি, পারস্যের অভিজাত ব্যক্তিগণকেও তেমনি নানা দেশের কর্তৃত্বভার দান করলেন—এমনকি, গ্রিক শাসনকর্তাদেরও পদচ্যুত করে!

এবং যে নূতন ও উন্নত যুদ্ধবিদ্যার জন্যে আজ তিনি পৃথিবীতে অজেয়, প্রায় ত্রিশ হাজার পারসি যুবককে নির্বাচন করে অসঙ্কোচে নিয়মিত ভাবে সেই সামরিক শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন। নিজের দেহরক্ষী অশ্বারোহী সৈন্যদলের মধ্যেও তিনি পারসি রাজকুমারদের গ্রহণ করতে ভীত হলেন না।

চিরশত্রু পারসিদের সম্বন্ধে আলেকজেন্ডারের এই আশ্চর্য মত পরিবর্তন দেখে গ্রিক সেনাপতি ও তাঁর পুরাতন বন্ধুগণ বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা খুশিও হলেন না। এমনকি, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত হল।

গ্রিকরা আলেকজেন্ডারের উদার আদর্শের মর্মগ্রহণ করতে পারলে না। তিনি সেই প্রাচীন যুগেই চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিতে—আজকের এই মৌখিক সাম্যবাদের যুগেও ইউরোপ যা করতে পারছে না। তাঁর এই চেষ্টার জন্ম নিশ্চয়ই বহু চিন্তার ফলে। তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবন শেষের দিকে যত এগিয়ে গিয়েছিল, এদিকে তাঁর ঝোঁক উঠেছিল ততই স্পষ্টতর হয়ে। তিনি আরও কিছুকাল বেঁচে থাকলে তাঁর চেষ্টার শেষ ফল কোন আকার ধারণ করত, আজও আমরা তা অনুমান করতে পারি না। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি যেখানে পঙ্গু, প্রতিভা সেখানে কী না করতে পারে!

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের বসন্তকালে আলেকজেন্ডার পারস্য থেকে গেলেন বাবিলনে। সেখানে

বসেও তাঁর চিত্ত ব্যস্ত হয়ে রইল আবার স্থলপথে ও জলপথে নব নব অভিযানের স্বপ্ন নিয়ে। তখনকার অন্যতম প্রধান সভ্যদেশ ছিল কার্থেজ, হয়তো সেখানে যাবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। আপাতত—অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে—তাঁর দৃষ্টি পড়ল আরব দেশের উপরে।

কিন্তু পৃথিবীর কোনও দিগ্বিজয়ীই যাকে জয় করতে পারেনি, সেই মৃত্যুর দৃষ্টি পড়ল তাঁর উপরে। আরব-অভিযানের আয়োজন যখন প্রায় শেষ হয়েছে, আলেকজেন্ডার হঠাৎ জ্বরে শয্যাগ্রহণ করলেন। এই শয্যাই তাঁর শেষ শয্যা।

একটি ভোজসভায় যোগ দেবার পরই তিনি শয্যাশায়ী হন। সেকালে এমন আচম্বিতে কেউ পীড়িত হয়ে পড়লেই লোকে সন্দেহ করত, বিষপানের ফল। তাই আলেকজেন্ডারের মৃত্যুর পরেও গুজব রটেছিল, বিষের দ্বারা তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি, পুত্রভক্ত জননী ওলিম্পিয়াসও শোকে পাগলের মতো হয়ে কল্পিত হত্যাকারীদের উপরে নিয়েছিলেন ভীষণ প্রতিশোধ। কিন্তু আসলে তাঁর মৃত্যু হয় ম্যালেরিয়া বা ওই জাতীয় কোনও জ্বরে।

মৃত্যুর আগেকার একটি দৃশ্যে দেখি, আলেকজেন্ডার জ্বরের ঘোরে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন। নৌ সেনাপতি নিয়ার্চাস শয্যার পাশে বসে প্রভুর মনকে প্রফুল্ল করবার জন্যে নানা সমুদ্রের ও দেশ-বিদেশের গল্প শোনাচ্ছেন—কিন্তু বৃথা! আলেকজেন্ডার প্রলাপ বকতে আরম্ভ করলেন।

মাঝে মাঝে প্রলাপ থামে। রোগীর জ্ঞান হয়।

এমনি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার সন্তান নেই। সাম্রাজ্যের ভার কাকে দিয়ে যাবেন?'

আলেকজেন্ডার উত্তর দিলেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে।'

তারপর দেখি, দিগ্বিজয়ী বীর শয্যায় স্তব্ধ হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর বাঁচবার আশা নেই, কথা কইবারও শক্তি নেই। তাঁর বহু অভিযানের সেনাপতিরা ঘরের ভিতরে ঢুকছেন একে একে। আবেগ ভরে একবার করে তাঁর হাত চেপে ধরছেন, একবার তাঁর চোখে চোখ রেখে দৃষ্টি বিনিময় করছেন, তারপর আবার যাচ্ছেন বিষণ্ণ মুখে বাইরে বেরিয়ে।

...প্রাচীন বাবিলনের প্রান্তরে সূর্য নামল অস্তাচলে—সঙ্গে সঙ্গে আলেকজেন্ডারেরও জীবন-সূর্য হল অস্তমিত। (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের ১৩ই জুন তারিখে)। তেরো বৎসর আগে তিনি মাসিডন ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন পৃথিবী জয়ের অভিযানে। তারপর তিনি আর স্বদেশে ফেরেননি এবং দেশে ফেরবার জন্যে কখনও যে কাতর হয়েছিলেন এমন কোনও প্রমাণও নেই। হয়তো তাঁর মতন মহামানুষের পক্ষে সমস্ত পৃথিবীই ছিল স্বদেশ।

মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে আলেকজেন্ডারের মৃত্যু হয়।

অনেক দিন পরেকার কথা। গ্রিস তখন পতিত; রোম তখন উন্নতির উচ্চশিখরে। রোমের জুলিয়াস সিজারের বয়স তখন তেত্রিশ!

একদিন সিজার বসে বসে একখানি বই পড়ছেন। বইখানি হচ্ছে দিগ্বিজয়ী আলেকজেন্ডারের জীবনচরিত।

হঠাৎ দেখা গেল, সিজার বইখানি মুড়ে রেখে কাতর ভাবে কেঁদে ফেললেন।

জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কাঁদছেন কেন?'

সিজার বললেন, 'তেত্রিশ বৎসর বয়সে আলেকজেন্ডার যা কিছু করবার, সব করে ফেলেছেন। আমি কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই করতে পারিনি।' তেত্রিশ বৎসর নয়, তেরো বৎসর। আলেকজেন্ডার যা কিছু করবার, তেরো বছরের ভিতরেই করেছিলেন।

আমরা মাঝে মাঝে আলেকজেন্ডারের চরিত্রের রহস্য ব্যাখ্যা করে বোঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাখ্যার দ্বারা এমন মানুষকে ঠিক ভাবে বোঝানো অসম্ভব।

অমর দার্শনিক আরিস্টটল, শিষ্য আলেকজেন্ডারকে দিয়েছিলেন দর্শন-শাস্ত্রের শিক্ষা। কিন্তু দার্শনিক শিক্ষার পরিণাম কি যুদ্ধক্ষেত্রে দিগ্বিজয়? আলেকজেন্ডারের কীর্তির কথা শুনে সে যুগে আরিস্টটলের চেয়ে অবাক বোধহয় আর কেউ হননি। তিনি বুঝতে পারেননি নিজের শিষ্যকেও।

আলেকজেন্ডার যখন বালক, তখন ফিলিপের রাজসভায় এসেছিলেন এক পারসি রাজদূত।

কী দেখে জানি না, সেই সময়ে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, 'রাজা ফিলিপের চাতুর্যের কথা সকলেই জানে। কিন্তু আলেকজেন্ডারের প্রতিভা তাঁর পিতার চাতুর্যকেও নিষ্প্রভ করে দেবে।'

কিন্তু ওই পারসি রাজদূতও কি আলেকজেন্ডারকে বুঝতে পেরেছিলেন?

এবং আলেকজেন্ডার নিজেও কি নিজেকে বুঝতে পেরেছিলেন?

এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন!

বাঘরাজের অভিযান

প্রথম

সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে

সমুদ্রের সঙ্গে বাংলা দেশের সম্পর্কের কথা সহজে কারুর মনে জাগে না। অথচ বাংলা দেশের অনেক জায়গাতেই সমুদ্রের ধারে আছে কয়েকটি ছোটো-বড়ো গ্রাম, এমনকি শহর পর্যন্ত। আমাদের কাহিনি শুরু হবে সমুদ্রতীরবর্তী এই রকম কোনও একটা জায়গা থেকেই।

ধরুন, জায়গাটির নাম কমলপুর। সেটি ঠিক গ্রামও নয়, ঠিক শহরও নয়। অথচ কয়েকজন সম্পন্ন গৃহস্থ ও ধনী ব্যক্তি শখ করে সেখানে কয়েকখানি মাঝারি ও বড়ো আকারের বাড়ি তৈরি করেছেন।

কমলপুর থেকে খানিক তফাত দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্রের তরলিত নীলিমা। দূরে দূরে এধারে ওধারে তাকালে নজরে পড়ে, পাহাড়ের মতো বালিয়াড়ির স্তূপ। কমলপুরে বাসিন্দার সংখ্যা খুব অল্প বলে এখানে সর্বদাই বিরাজ করে বেশ একটি নিরালা শান্তিময় ভাব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন জাপানিদের আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন সমুদ্রের উপরে পাহারা দেবার জন্যে সৈন্যবিভাগ থেকে এখানে একখানা বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বাস করত কয়েকজন সেপাই। কিন্তু সমুদ্রপথে জাপানিদের দৌড় থেমে যায় আন্দামানে এসেই। তার কিছুকাল পরেই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং বাড়িখানা ছেড়ে চলে যায় সৈনিকরাও। বাড়িখানা কিছুকাল খালি পড়ে থাকে। সাধারণ গৃহস্থদের বাসোপযোগী নয় বলে বাড়িখানা ভাড়া নেবার জন্যে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

তারপর হঠাৎ একদিন কমলপুরের সকলে বেশ বিস্মিত ভাবেই শ্রবণ করলে, কে একজন বাইরেকার লোক সেই পোড়ো বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে বাস করতে এসেছে। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এমন একটা অজানা জায়গায় একজন বাইরেকার লোক বাস করতে এল কেন, এটা জানবার জন্যে সকলের মনেই জাগল বিশেষ কৌতূহল। লোকটির নাম অরিন্দম মজুমদার। কানাঘুষায় তার সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা শোনা গেল। কোনও কোনও কথা রীতিমতো রহস্যময়।

অরিন্দম বয়সে যুবক। সুন্দর তার আকৃতি ও সুগঠিত তার দেহ। তার সঙ্গে বাস করত আর একজন মধ্যবয়সি লোক, সে-ই ছিল তার একাধারে ভৃত্য, পাচক ও বন্ধু। জাতে সে বিহারি এবং অনেক বিহারির মতো সে-ও বাংলায় বেশ কথা কইতে পারত। যুদ্ধের সময় সে ফৌজে ছিল, কিন্তু গুলিতে আহত হয়ে ফৌজ থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। দেহ তার প্রকাণ্ড ও বলিষ্ঠ হলেও তাকে অল্প অল্প খুঁড়িয়ে হাঁটতে হত, তার নাম রামফল।

কমলপুর আসবার হপ্তাখানেক পরে একদিন সকাল নয়টার সময় অরিন্দমের নিদ্রা ভঙ্গ হল। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ খুলে দেখল, ভেন্টিলেটরের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে সূর্যকরের উজ্জ্বল রেখা। একটা হাই তুলে বিছানা ছেড়ে নেমে পাশের ঘরের ভিতরে গেল। তারপর খানিকক্ষণ মুগুর ভেঁজে, অনেকগুলো ডনবৈঠক দিলে। একা-একাই কিছুক্ষণ ধরে কল্পিত শত্রুকে লক্ষ্য করে মুষ্টিযুদ্ধের কতকগুলো কৌশল অভ্যাস করলে। তারপর ঘরের দরজা খুলে একেবারে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনেই তরঙ্গায়িত অনন্ত সাগর, তার উপরে ঝলমল করে উঠছে সূর্যের স্বর্ণকিরণ। অরিন্দম বালকের মতন উচ্ছল আনন্দে দৌড়োতে দৌড়োতে ও লাফাতে লাফাতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াল এবং তারপর জলের ভিতরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই বলিষ্ঠ হাতে জল কেটে সাঁতার দিতে দিতে চলে গেল প্রায় আধ মাইল দূর পর্যন্ত। আবার ফিরে এসে ডাঙায় উঠে রৌদ্রতপ্ত বালুকার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

দম নিতে নিতে মিনিটখানেক কাটল, এবং তার পরেই ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। তার মাথা ঘেঁষে সোঁ করে বাতাস কেটে কী একটা জিনিস খানিক তফাতে সমুদ্রতীরের উপরে গিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরে উঠে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল একরাশি বালি।

অরিন্দম নিজের মনেই বললে, 'বৎস, তোমার টিপ ঠিক হয়নি। বুলেটটা আমার মাথার ইঞ্চি দুয়েক উপর দিয়ে চলে গেছে।'

অরিন্দম তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং এদিকে ওদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু সমুদ্রতীর একেবারে জনশূন্য। খানিক তফাতে রয়েছে একটা ছোটো বালিয়াড়ির স্তূপ। তার বিশ্বাস হল ওরই উপর থেকে কেউ তার দিকে গুলি নিক্ষেপ করেছে। সে তখনই দ্রুত পদচালনা করলে বালিয়াড়ির দিকে। তারপর তাড়াতাড়ি বালিয়াড়ির উপরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সেখানেও দেখতে পেলে না জনপ্রাণীকে।

সে অবাক হয়ে ভাবছে, এমন সময় তার কাছে এসে দাঁড়াল রামফল। বললে, 'বন্দুকের শব্দ শুনে আমি ছুটে আসছি কর্তা! আপনার কিছু হয়নি তো?'

অরিন্দম বললে, 'না রামফল, আমার কিছু হয়নি বটে, কিন্তু কেবল দু-ইঞ্চির জন্যে এ যাত্রা আর পরলোকের পথে পা বাড়াতে হল না। আর কেউ নয়, এ হচ্ছে বাঘরাজের কীর্তি!'

রামফল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'কর্তা, তুমি বড়োই অসাবধান। এত করে বলি, তবু আমার কথায় কান পাতবার নামই নেই! দ্যাখো দেখি, আজই গুলি খেয়ে তোমাকে পটল তুলতে হত!'

অরিন্দম বললে, 'প্রিয় রামফল, স্তব্ধ হও। আমি গুলিখোর নই, সুতরাং গুলি খেয়ে মরবও না। এখন চলো আমাদের প্রাসাদের দিকে।'

'প্রাসাদ' হচ্ছে একখানা একতলা বাড়ি, তার মধ্যে ছোটো ছোটো ঘর আছে খানকয়েক। বসবার ঘরে গিয়ে একখানা ইজিচেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে অরিন্দম বললে, 'রামফল হে, নিদ্রাভঙ্গের পরেই উত্তেজনার সৃষ্টি! কাপড় ছাড়বার আগেই চাই অন্তত দু-পেয়ালা চা।'

—'আর তার সঙ্গে আসবে চারখানা গরম টোস্ট, দুটো এগপোচ আর চারখানা চিকেন স্যান্ডউইচ। কর্তা, তাইতেই তোমার পেটের আগুন নিববে তো? না আরও কিছু দরকার?' রামফলকে কেউ কখনও হাসতে দেখেনি! সে হাসির কথাও বলত একান্ত গম্ভীর বদনে।

অরিন্দম বললে, 'রামফল, একজন গুলি ছুড়ে আমার প্রাণ বধ করতে চায়। আর তুমি চাও খাবার খাইয়ে আমাকে খাবি খাওয়াতে, না? আমার অত কিছুর দরকার নেই। আমার জন্যে নিয়ে এসো কেবল দু-পেয়ালা চা, আর পুরু করে মাখন দেওয়া দু-খানা গরম গরম টোস্ট।'

—'কিন্তু কর্তা—'

—'বাস, আর কোনও কথা নয়। যা বললুম, তাই করো।'

অরিন্দম চা পান করতে করতে খবরের কাগজের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর

একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে কী ভাবতে লাগল! তারপর উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং যখন আবার বাইরে বেরিয়ে এল, তখন তার পরনে কোট ও পেন্টুলুন। ঘরের কোণ থেকে একগাছা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে সে ডাকলে, 'রামফল!'

রামফল তার সামনে এসে বললে, 'বলুন কর্তা!'

—'আমি একবার চারিদিকটা ঘুরে আসতে চললুম। ঠিক দুপুরবেলা খাবারের সময় ফিরে আসব।'

রামফল একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বার করলে মস্ত বড়ো একটা সেকেলে রিভলভার। তারপর বললে, 'এটা দেখতে সেকেলে বটে, কিন্তু ভারী কাজের জিনিস। এর কাছে একেলে 'অটোমেটিক'গুলো খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা নিয়ে যান কর্তা!'

—'ধন্যবাদ। কিন্তু ওটা বেজায় আওয়াজ করে। আমার পক্ষে শ্রীমতীই ভালো। শ্রীমতী আমার লজ্জাবতী, এত চুপিচুপি কাজ সারে, কাকপক্ষীও টের পায় না।' সে বাঁ হাতের আস্তিন গুটিয়ে ফেললে। দেখা গেল, হাতের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একখানা ছোরার খাপ! অরিন্দম ছোরাখানা টেনে বার করলে। হাতির দাঁতের তিন ইঞ্চি লম্বা হাতলের উপরে রয়েছে প্রায় ছ-ইঞ্চি লম্বা চকচকে ফলা। চমৎকার অস্ত্র, নিখুঁত তার গড়ন। আর তার ধার এত সূক্ষ্ম যে, অনায়াসেই গোঁফ-দাড়ি কামানো যায়। সে খেলাচ্ছলে ছোরাখানা ছাদের দিকে ছুড়ে দিলে এবং তা মাটি স্পর্শ করবার আগেই তার বাঁটখানা খপ করে ধরে ফেললে। তারপর এমন চোখের নিমেষে ছোরাখানা আবার খাপের ভিতর গুঁজে দিলে যে, মনে হল যেন তা শূন্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ছোরারই নাম হচ্ছে শ্রীমতী।

অরিন্দম বললে, 'আমার শ্রীমতীকে তুমি হেনস্থা কোরো না রামফল। পকেটের ভিতর থেকে কেউ রিভলভারের আধখানা বার করবার আগেই শ্রীমতী তার হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দু-খানা করে দেবে।'

রামফল বিরক্তমুখে দাঁড়িয়ে রইল এবং অরিন্দম হাসতে হাসতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে বসন্তের আমেজ। শীতের প্রকোপে অনেক গাছ ন্যাড়া হয়ে পড়েছিল, এখন তাদের ডালে ডালে কাঁচা সবুজ রঙের ছোটো ছোটো পাতা দেখা দিয়েছে। দু-তিনটে কোকিলেরও সাড়া পাওয়া গেল।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অরিন্দম সামনের সেই বালিয়াড়ির দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হল। কেউ যে ওইখান থেকেই তার উপরে একটু আগে গুলিবৃষ্টি করেছে সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। বালিয়াড়ির ওধারটা ভালো করে পরীক্ষা করা হয়নি বলে সেই- দিকটাই এখন সে দেখতে চায়। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে নীচের দিকটা সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল। দেখা গেল বালির উপর সারি সারি জুতো পরা পায়ের ছাপ। সেই ছাপ ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে সে কুড়িয়ে পেলে একটা গুলিশূন্য কার্তুজ।

নিজের মনেই বললে, 'যা ভেবেছি তাই! বাঘরাজের আবির্ভাব হয়েছিল এইখানেই।'

পায়ের ছাপগুলো চলে গিয়েছে বাঁধা রাস্তা পর্যন্ত। অরিন্দম রাস্তার উপরে উঠে আর কোনও পায়ের দাগ দেখতে পেলে না। কিন্তু সহজেই অনুমান করতে পারলে যে, এই পদচিহ্নের অধিকারী গিয়েছে কমলপুরের দিকেই। সে-ও সেইদিকে অগ্রসর হতে লাগল এবং মাইলখানেক পার হয়েই গন্তব্যস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল।

সেটা হচ্ছে একটা চায়ের দোকান। কী শহর আর কী মফস্‌সল সর্বত্রই চায়ের দোকানই হচ্ছে যত কিছু খবরাখবর আদান প্রদানের কেন্দ্র। এইজন্যেই প্রতিদিনই সে একবার না একবার এই চায়ের দোকানে এসে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিত। এর মধ্যেই এসে সে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে, মোটামুটি তা হচ্ছে এই :

এখানকার সবচেয়ে ধনী বাসিন্দা হচ্ছেন মদনলালবাবু। তিনি এখন পুরোপুরি বাঙালি হয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিলেন পশ্চিম থেকে। টাকা তাঁর অনেক, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির। সকলেই তাঁকে ঘৃণা করে। মদনলালের কাছে মাঝে মাঝে এসে বাস করে মোহনলাল, সে তাঁর খুড়তুতো ভাই। মোহনলাল খুব আমুদে মানুষ, যদিও তেমন চালাক-চতুর নয়। সবাই তাকে ভালোবাসে। তাদের বাড়ি কলকাতায়।

কমলপুরের আর একজন বাসিন্দা হচ্ছেন স্যার বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরি। আগে তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, এখন অবসর নিয়ে এখানে বাস করেন।

আর একজনও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। তাঁর নাম রায়বাহাদুর বিজনকুমার রায়। কলকাতার নানা রাস্তায় তাঁর অনেকগুলো বড়ো বড়ো বাড়ি আছে। সেগুলো থেকে মাসিক ভাড়া আদায় হয় কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু কলকাতার জলহাওয়া নাকি তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় বলে তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়ে দেন কমলপুরে। এখানে প্রাসাদের মতন তাঁর একখানা মস্ত বড়ো বাড়ি আছে।

এখানকার জমিদারবাড়ি আছে বটে, কিন্তু জমিদার নেই। মহেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বর্গীয় হয়েছেন অনেকদিন আগেই এবং তাঁর সহধর্মিণীও পরলোকে। তাঁরা রেখে গিয়েছেন একমাত্র কন্যা, নাম তাঁর সন্ধ্যা। মহেন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তির অছি হচ্ছেন তাঁর সন্তানহীনা বিধবা সহোদরা দেবিকাদেবী। তাঁরও যথেষ্ট দুর্নাম। তাঁর চেহারা ও কথাবার্তার মধ্যে পাওয়া যায় অশোভন পুরুষালি ভাব এবং তাঁর প্রকৃতিও রীতিমতো কর্কশ বলে কারুর সঙ্গেই তিনি মিষ্ট ব্যবহার করতে পারতেন না। কিন্তু জমিদারকন্যা সন্ধ্যাকে সকলেই এখানে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে।

সন্ধ্যার প্রথম জীবনটা—অর্থাৎ প্রায় ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত কেটে গিয়েছে কলকাতায়। সেখানে থেকে সে কেবল লেখাপড়াই করত না, আরও নানাদিকেই ছিল তার আকর্ষণ। তার বাবা ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর মতামতও ছিল দস্তুরমতো আধুনিক। বাড়িতে মেম গভর্নেস রেখে মেয়েকে তিনি মানুষ করে তুলেছিলেন অতি আধুনিক যুগের উপযোগী করে। সন্ধ্যা খুব ভালো টেনিস খেলতে পারে এবং 'স্পোর্টস' এর নানা বিভাগে ও সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কয়েকবার অর্জন করেছে প্রথম পুরস্কার। কিন্তু মহেন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনের পর তার পক্ষে একা আর কলকাতায় থাকা সম্ভবপর হয়নি। তাই সে এখন কমলপুরেই স্থায়ীভাবে বাস করে।

জমিদারবাড়ির কাছেই একখানা বাংলো ভাড়া নিয়ে বাস করেন ডক্টর সেন। সকলেই জানে, তিনি একজন পণ্ডিত লোক।

আপাতত কমলপুরের আর কোনও বাসিন্দার পরিচয় দেবার দরকার নেই।

এক পেয়ালা চায়ের সামনে বসে অরিন্দম ভাবছিল কমলপুরের ওই বাসিন্দাদেরই কথা। তারপর পেয়ালায় গোটা দুয়েক চুমুক দিয়ে উঠে পড়ে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। মনে মনে বললে, 'এখানকার কারুকেই তো চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে না—কেবল ওই সন্ধ্যাদেবী ছাড়া। তাঁকে দেখতে কেমন

ধারা? উপন্যাসের নায়িকার মতন কি? একবার জমিদারবাড়ির দিকেই পা চালিয়ে দেওয়া যাক।'

হন হন করে সে এগিয়ে চলল—কোনওদিকে না তাকিয়ে। যখন সে ডাকঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ডাকঘরের দরজার ভিতর দিয়ে একটি মূর্তি একেবারে তার গায়ের উপর এসে পড়ল। টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে যাচ্ছিল, অরিন্দম তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললে। তারপর তার দিকে ভালো করে তাকিয়েই তার চক্ষু হয়ে গেল চমৎকৃত! অপূর্বসুন্দরী এক তরুণী!

অরিন্দম অনুতপ্ত স্বরে বললে, 'দয়া করে আমাকে মাপ করবেন।'

তরুণী মধুর স্বরে বললে, 'মাপ চাইছেন কেন? দোষ তো আপনার নয়। আমিই বোকার মতন হুড়মুড় করে আপনার গায়ের উপর এসে পড়েছিলুম।'

অরিন্দম দুই-তিন মুহূর্তের মধ্যেই তরুণীকে খুঁটিয়ে দেখে নিলে। ভুরু, চোখ, নাক, ঠোঁট আঁকা যেন শিল্পীর তুলিতে। ছিপছিপে অথচ নিটোল দেহের গঠন, যে-কোনও ভাস্করের আদর্শ হতে পারে। অনন্যসাধারণ! কমলপুরে এমন কারুকে দেখবে বলে অরিন্দম একেবারেই প্রত্যাশা করেনি। সে ধীরে ধীরে বলল, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার নাম সন্ধ্যাদেবী।'

তরুণী সকৌতুকে হেসে উঠল। সে তরল হাস্যধ্বনিও সংগীতময়। হাসতে-হাসতেই সে বললে, 'হ্যাঁ, আমার নাম সন্ধ্যাই বটে! আপনাকে দেখেও আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আপনিই হচ্ছেন কমলপুরের রহস্যময় আগন্তুক।'

অরিন্দম উপর দিকে দুই ভুরু তুলে বললে, 'বলেন কী, এর মধ্যেই রহস্যময় হয়ে উঠেছি নাকি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে সবাই আপনাকে করে তুলেছে একটি রোমান্সের নায়ক। আপনার সম্বন্ধে কত-না বিচিত্র কথা শুনতে পাই।'

দু-জনেই তখন আবার পথ দিয়ে চলতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে অরিন্দম শুধোলে, 'আমার সম্বন্ধে আপনারা কী শুনতে পান, তা কি আমাকে বলবেন না?'

সন্ধ্যা বললে, 'ক্রমে বলব বই কি, কিন্তু আজকে নয়। তবে এখানকার সবাই এই কথা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে যে, আপনি সামাজিক কি অসামাজিক জীব। যদিও কমলপুরের আমরা নিজেরা মোটেই সামাজিক জীব নই।'

অরিন্দম বললে, 'আপনাদের কৌতূহল জাগ্রত করতে পেরেছি বলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করছি। আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, আমিও আজ নিজের বাসায় গিয়ে ভাবব, কমলপুরের আপনারা আমার চেয়েও অসামাজিক কি না?'

সন্ধ্যা বললে, 'তাই ভাববেন, সারা রাত ধরে ভাববেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হঠাৎ আপনি এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এলেন কেন?'

—'উত্তেজনার আর অ্যাডভেঞ্চারের আর ধনকুবের হবার জন্যে।'

সন্ধ্যা সচকিত চক্ষে তাকালে অরিন্দমের মুখের দিকে। কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল না যে, সে ঠাট্টা করে এই কথাগুলো বললে কি না। তিন-চার মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বললে, 'পৃথিবীর কেউ যে ওই-সব কারণের জন্যে কমলপুরে আসতে পারে, এটা আমি কল্পনাতেই আনতে পারি না।'

অরিন্দম সহাস্যে বললে, 'আমি বলতে চাই ঠিক উলটো কথাই। দু-দিন পরেই দেখতে পাবেন, সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে এইখানেই হবে এমন রোমাঞ্চকর ঘটনার পর ঘটনা, যুদ্ধ আর হত্যাকাণ্ড, স্বপ্নেও যা কল্পনা করা যায় না।'

—'আমার বয়স হল প্রায় আঠারো বৎসর। এই আঠারো বৎসরের মধ্যে আমি কমলপুরে একটা অগ্নিকাণ্ড ছাড়া আর কোনওই রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা শুনিনি।'

অরিন্দম বললে, 'তাহলে ঘটনাগুলো যখন ঘটতে আরম্ভ করবে, আপনি নিশ্চয়ই তা উপভোগ করতে পারবেন।'

কথাবার্তা কইতে কইতে তারা জমিদারবাড়ির সামনে এসে পড়ল। বাড়িখানা বড়ো হলেও তার মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।

ফটকের সামনে এসে সন্ধ্যা বললে, 'আপনি কি দয়া করে একবার বাড়ির ভিতরে আসবেন না?'

—'সে তো আমার সৌভাগ্য। চলুন।'

অরিন্দমকে নিয়ে সন্ধ্যা নিজেদের বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। প্রকাণ্ড ঘর, সোনালি ফ্রেমওয়ালা বড়ো বড়ো তৈলচিত্র, দামি দামি আয়না ও আসবাবপত্র এবং মার্বেলের টেবিল, কৌচ, সোফা ও নানা আকারের চেয়ার। কিন্তু অরিন্দম সে-সবের দিকে ফিরেও তাকালে না, নিজের মনে একখানা গদিমোড়া চেয়ারের উপর গিয়ে বসে পড়ল।

সন্ধ্যা বললে, 'আমার পিসিমাকে ডেকে আনব কি? আপনাকে দেখলে তিনি খুশি হবেন।'

—'নিশ্চয়।'

অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে দেবিকাদেবীর প্রবেশ। একবার তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করেই অরিন্দম বুঝতে পারলে, লোকের মুখে তাঁর যে বর্ণনা শুনেছে তার মধ্যে নেই একটুও অত্যুক্তি। দেবিকাদেবীর দেহ পুরুষেরই মতন চওড়া এবং তাঁকে দেখলেই নপুংসক বলেই মনে হয়। গলার আওয়াজও কর্কশ ও অস্বাভাবিক। বয়স তাঁর চল্লিশ পার হয়েছে বলেই মনে হয়, কিন্তু এই বয়সেও তাঁর মাথায় রয়েছে 'বব' করা চুল। এরকম অভাবিত ও অদ্ভুতদর্শন আধুনিক মহিলা অরিন্দমের চক্ষে আর কখনও পড়েনি।

নমস্কারের আদান-প্রদানের পর দেবিকা বললেন, 'আপনি কমলপুরে এসেছেন শুনেই আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলুম যে, একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আজ রাত্রে এখানে আপনাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আরও কারুর কারুর সঙ্গে আপনার দেখা হবে, যদিও আমরা বেশি লোকের সঙ্গে মিশি না।'

—'ক্ষমা করবেন, দেবিকাদেবী, আজ রাত্রে এখানে 'ডিনারে'র আমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না।'

—'তাহলে আজকেই এখানে 'লাঞ্চ' খেয়ে যেতে আপনার আপত্তি আছে কি? আরও কিছুক্ষণ থেকে যান না!'

—'আর-একবার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। মনে করবেন না, আমি অভব্য বা অসভ্য। আমার লোককে বলে এসেছি, আজ বাড়িতেই আমি দুপুরবেলায় আহার করব। আমার লোকটি কিছু অদ্ভুত প্রকৃতির। আমি যদি ঠিক সময়ে বাড়িতে গিয়ে হাজির না হই, তাহলে সে মনে করবে নিশ্চয়ই আমি কোনও বিপদে পড়েছি। ফল হবে কী জানেন? তার কাছে প্রকাণ্ড একটা রিভলভার আছে। সেইটে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে আমাকে খুঁজতে। তারপর কারুর না কারুর আহত হবার সম্ভাবনা।'

চমকে উঠলেন দেবিকা ও সন্ধ্যা দু-জনেই। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই অরিন্দমের, সে একদৃষ্টিতে একটি ছোটো টেবিলের উপরে আধারে রক্ষিত একটি জাপানি বামন গাছের দিকে চুপ

করে তাকিয়ে রইল। তার ভাব দেখলে মনে হয় না, সে বলেছে কোনও অসাধারণ কথা।

তারপর সন্ধ্যা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, 'পিসিমা, অরিন্দমবাবু কমলপুরে এসেছেন অ্যাডভেঞ্চারের লোভে!'

দেবিকার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তিনি থেমে থেমে বললেন, 'উত্তম, ওঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে আমি খুব খুশি হব। কিন্তু অরিন্দমবাবু, আজকের জন্যে আপনাকে মুক্তি দিলুম। তবে শুক্রবারে আসতে পারবেন তো? আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে সেদিন আমি আরও কোনও কোনও লোককে নিমন্ত্রণ করব।'

—'বেশ কথা, সেদিন আমি নিশ্চয়ই আপনার দরবারে এসে হাজিরা দেব।'

তারপর দেবিকাদেবীর প্রস্থান। অরিন্দম এবং সন্ধ্যা আরও কিছুক্ষণ বসে বসে গল্প করলে। অরিন্দম একজন সংলাপী লোক, আসর জমিয়ে তুলতে পারে অল্পক্ষণের মধ্যেই। কথা কইতে কইতে সে এটাও উপলব্ধি করতে পারলে, সন্ধ্যা তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তার মুখে চোখে বারংবার ফুটে উঠছে কেমন একটা দ্বিধার ভাব। তবে সন্ধ্যা যে তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এটা বুঝতে পেরে সে মনে মনে হল অত্যন্ত আনন্দিত।

অবশেষে অরিন্দম উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, এবার আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে।'

সন্ধ্যা তার সঙ্গে বাড়ির ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এল। তারপর সে বললে, 'অরিন্দমবাবু, আপনাকে দেখলে তো পাগল বলে মনে হয় না। তবে ওইসব বাজে আবোল-তাবোল বকে আমাদের সঙ্গে মজা করছিলেন কেন?'

অরিন্দম হেঁট হয়ে সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার দুই চক্ষু তখন নৃত্যশীল। বললে, 'সারা জীবন ধরে আমি সত্য কথাই বলে আসছি। সত্য কথা বলার মধ্যে একটা কী মস্ত মজা আছে জানেন? কেউ আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না।'

—'কিন্তু ওইসব খুন-খারাপি আর রিভলভার—'

বিদ্রূপ ভরা হাসি হেসে অরিন্দম বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, এখন থেকে আপনার চিন্তা-জগতে আমি যে-ভূমিকায় অভিনয় করব, তা হবে সত্য-সত্যই অনন্যসাধারণ। জেনে রাখুন, আজ থেকে আমাকে হত্যা করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টার অভাব হবে না। কিন্তু এটাও জেনে রাখুন, কেউ হত্যা করতে পারবে না আমাকে। সুতরাং আপনি বিচলিত হবেন না, কিংবা সারারাত্রি আমার কথা ভেবে বিনিদ্র হয়েও থাকবেন না।'

সন্ধ্যা হালকা হাসি হেসে বললে, 'বেশ, আমি সেই চেষ্টাই করব।'

অরিন্দম গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'বুঝতে পারছি, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না।'

সন্ধ্যা বাধো বাধো গলায় বললে, 'কিন্তু কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন?'

কঠিন হয়ে উঠল অরিন্দমের কণ্ঠস্বর। সে বললে, 'জেনে রাখুন এই অবিশ্বাসের জন্যে আপনি একদিন অনুতপ্ত হবেন।' তারপরেই তাকে নমস্কার করে অরিন্দম এত তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যে, সন্ধ্যা সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মতো।

বাসায় ফিরে এসে অরিন্দম দেখলে, মুখের উপরে বিরক্তিকর বোঝা চাপিয়ে রামফল দাঁড়িয়ে রয়েছে সদর দরজার সামনে। তার বিরক্তিকে একটুও আমল না দিয়ে অরিন্দম তরলকণ্ঠে বলে উঠল, 'ওহে রামফল, আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে এলুম। এখন থেকে

শুরু হবে অ্যাডভেঞ্চারের পর অ্যাডভেঞ্চার! আর অ্যাডভেঞ্চারের নিয়ম কী জানো তো? দুবার কি তিনবার ওই তরুণীর জীবন রক্ষা করতে হবে আমাকেই। তারপর শেষ দৃশ্যে দেখা যাবে, আমি তাকে আবেগভরে চুম্বন করছি। তারপর তার সঙ্গে হবে আমার শুভ বিবাহ! বুঝতে পারলে?'

রামফল কিছু বুঝতে পারলে কি না তা কিছুমাত্র বোঝা গেল না। 'খাবার তৈরি আছে, খাবেন চলুন।' এই বলেই সে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হল।

দ্বিতীয়

প্রজাপতি শিকারি

শুক্রবার দিন জমিদারবাড়ির মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ হয়েছিল মোহনলালেরও। সে বয়সে যুবক। তার রং ফরসা ও মুখশ্রী সুন্দর। সে সর্বদাই সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে থাকে এবং বাঁ চোখে পরে একখানা 'মোনোক্‌ল'। তার হাব ভাব যেন প্রকাশ করতে চায়, তার মতো আধুনিক কেতাদুরস্ত লোক বাজারে দুর্লভ।

সন্ধ্যার মুখে মোহনলাল যখন শুনলে, আজ এখানে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে কমলপুরের সেই নবাগত রহস্যময় মানুষটি, তখন সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'বলো কী, বলো কী! তাই নাকি?'

সন্ধ্যা বললে, 'হ্যাঁ মোহনবাবু। অরিন্দমবাবুকে দেখে তো মনে হল, সহজেই তিনি পোষ মানতে পারেন। আর সত্যি বলতে কী, আমার সঙ্গে তিনি খুব অমায়িক ব্যবহারই করেছেন। কিন্তু তাঁর একটি বদ অভ্যাস আছে বলে মনে হল। শীঘ্রই এখানে কী কী ঘটবে তাই নিয়ে সব ভয়াবহ ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে ভালোবাসেন। তাঁর ধারণা, এখানে কেউ নাকি তাঁকে হত্যা করতে চায়।'

—'বলো কী বলো কী? মাথা খারাপ নাকি?'

—'তাঁর মাথা খারাপ বলে তো মনে হল না!'

—'তাহলে তোমাকে নিয়ে তিনি একটু মজা করতে চেয়েছেন। হা হা হা হা—কী মজা!'

—'কিন্তু কেন জানি না, তাঁর কথায় আমি না-বিশ্বাস করেও পারিনি।'

—'কমলপুর হচ্ছে বদ্ধ জলাশয়ের মতো। মাসের তিরিশ দিনই কেটে যায় একই ভাবে। অরিন্দমবাবু যদি এই বদ্ধ জলের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেব।'

খানিক পরেই দেখা গেল, ফটকের কাছে অরিন্দমকে। সন্ধ্যা তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

অরিন্দম মুখ টিপে একটুখানি হেসে বললে, 'দেখতে পাচ্ছেন সন্ধ্যাদেবী, এখনও আমি সশরীরে বর্তমান। কোনও দুরাত্মা কাল রাত্রে আমার বাড়ির কাছে হাওয়া খেতে গিয়েছিল, কিন্তু আমি উপর থেকে তার মাথায় এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছি। ব্যস, সে বাড়ি ফিরে গেল বিনাবাক্যব্যয়ে। এত সহজে হত্যাকারীর উৎসাহ যে ঠান্ডা করে দেওয়া যায়, এটা কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়?'

সন্ধ্যা বললে, 'কিন্তু একই গল্প বারবার বললে কি একঘেয়ে হয়ে যায় না?'

অরিন্দম কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সেখানে হল মোহনলালের আবির্ভাব। এসেই সে বলে উঠল, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই আমি আপনাকে নমস্কার করছি অরিন্দমবাবু! বড়োই আনন্দ—বড়োই আনন্দ—দীর্ঘকাল ধরে এই আনন্দের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।'

অরিন্দম বললে, 'সত্য নাকি?'

মোহনলাল তার বাঁ চোখে 'মোনোক্‌ল'খানা লাগিয়ে সভয়ে অরিন্দমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে, 'বটে, বটে! তাহলে আপনি হচ্ছেন তথাকথিত রহস্যময় মানুষ?'

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনবাবু, অভদ্র হবেন না।'

—'তাই নাকি, তাই নাকি? বটে, বটে, বটে? অরিন্দমবাবু, আশা করি আপনি কোনও অপরাধ নেবেন না।'

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে বকবক না করে, লক্ষ্মীছেলের মতন পিসিমার কাছে যান। তাঁকে গিয়ে জানান যে, অতিথি উপস্থিত।'

মোহনলাল প্রস্থান করলে। অরিন্দম ধীরে ধীরে বললে, 'উনি হচ্ছেন মদনলালবাবুর খুড়তুতো ভাই মোহনলালবাবু। ওঁর বয়স চৌত্রিশ বৎসর। কিছুদিনের জন্যে বিলাতে গিয়েছিলেন। হাজারিবাগের কয়লার খনির মালিক।'

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, 'দেখছি ওঁর সম্বন্ধে আমার চেয়েও আপনি বেশি কথা জানেন!'

অরিন্দম সহজ স্বরেই বললে, 'যেখানে বাস করব, আমি সেখানকার প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে খবরাখবর রাখতে চাই।'

সন্ধ্যা বললে, 'তাহলে আমার সম্বন্ধেও সব খোঁজ আপনি নিয়েছেন বোধহয়?'

—'নিয়েছি, কিন্তু খবরগুলো বিশেষ দরকারি নয়। আপনার প্রথম জীবনটা কেটেছে কলকাতায়! আপনি বাড়িতে বসে লেখাপড়া শিখেছেন। দেবিকাদেবী আপনার পিতার সহোদরা নন—দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী। আপনি কখনও বাংলা দেশের বাইরে যাননি। এতদিন আপনাকে দেবিকাদেবীর উপরই নির্ভর করে থাকতে হয়েছে; কারণ, তিনিই আপনার সম্পত্তির অছি। সাবালিকা হলেই সমস্ত সম্পত্তি আপনারই হাতে আসবে। কিন্তু সেজন্যে আপনাকে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে; কারণ, আপনার বয়স এখন সতেরো বৎসর।'

সন্ধ্যা বললে, 'না, আমার বয়স এখন আঠারো।'

—'আপনি সবে আঠারোয় পা দিয়েছেন।'

সন্ধ্যা ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'আমার খবর রাখবার জন্যে আপনার এত মাথাব্যথা কেন?'

—'ঠিক ধরেছেন সন্ধ্যাদেবী! তবে কী জানেন মাথার উপরে যার খাঁড়া ঝোলে, মস্তককে ব্যথিত করতে সে বাধ্য হয়।'

সন্ধ্যা আর কিছু বললে না। অরিন্দমকে নিয়ে সে তাদের বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করলে। এবং ঠিক সেই সময়ই আর একটা দরজা দিয়ে সেইখানে এসে দাঁড়ালেন দেবিকাদেবী এবং এক শীর্ণ কিন্তু দীর্ঘদেহ শুকনো চেহারার ভদ্রলোক, যাঁর নাম শোনা গেল মদনলালবাবু।

অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে বললে, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড়োই খুশি হলুম মদনলালবাবু। কিন্তু বড়োই দুঃখের কথা, কলকাতার 'শেয়ার মার্কেট' নিয়ে আপনি এখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছেন। তাই নয় কি?'

মদনলাল সচমকে অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। দুই-তিন মুহূর্ত নীরব থেকে সে বললে, 'অরিন্দমবাবু, দেখছি কলকাতার 'শেয়ার মার্কেটে'র খবর আপনার নখদর্পণে!'

অত্যন্ত সরল ভাবে হাসতে হাসতে অরিন্দম বললে, 'বড়োই আশ্চর্য কথা, কী বলেন?'

তারপরই সেখানে আবার আর-একজনের আবির্ভাব। সন্ধ্যা তাঁর সঙ্গে অরিন্দমের পরিচয় করিয়ে দিলে। তিনি হচ্ছেন প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট স্যার বীরেন্দ্রনাথ।

স্যার বীরেন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরিন্দমের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি অরিন্দমবাবু? আমি মানুষের মুখ ভুলি না। আমার বেশ মনে হচ্ছে যে, কোনও একটা মামলায় আমি আপনাকে কয়েকদিন আদালতে দেখেছিলুম।'

অরিন্দম বললে, 'ঠিক। বটব্যালের মামলা আপনি ভোলেননি দেখছি, সবাই তাকে 'রাজা' বলে ডাকত। তাকে আপনি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কিছুকাল পরে জেল ভেঙে পালিয়ে যায়, তারপর আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। শুনেছি, সে এই বাংলা দেশের ভিতরেই আছে। সুতরাং সাবধান, অন্ধকার হলে বাড়ির বাইরে আর পা বাড়াবেন না।'

সন্ধ্যা দূর থেকে অরিন্দমকে ডাকলে চোখের ইশারায়। তারপর চুপি চুপি বললে, 'অরিন্দমবাবু, সবাইকে চমকে দেবার প্রলোভন আপনি ত্যাগ করুন। অনেকেরই এটা ভালো না লাগতে পারে।'

অরিন্দম হাসিমুখে বললে, 'আমি নিজের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমার সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব আর কারুকে চমকে দেবার চেষ্টা করব না।'

আহারের আগে শুরু হল গল্পের পালা। এবং তার মধ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করলে অরিন্দমই। সে সকলকে নিজের ভ্রমণ কাহিনি বলতে লাগল। সে-কাহিনি সত্যই বিচিত্র। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই সে ঘুরে এসেছে এবং নানা দেশেই নরচরিত্র সম্বন্ধে সঞ্চয় করেছে প্রভূত অভিজ্ঞতা। সে নিজের দুঃসাহসিকতার এমন সব দৃষ্টান্ত দিতে লাগল, যা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর।

দেবিকা বললেন, 'এত দেখেশুনেও আপনি কমলপুরে এসেছেন কীসের লোভে? এখানে কোনও উত্তেজনাই নেই!'

—'উত্তেজনা না থাকতে পারে, কিন্তু এখানকার হাওয়া আমার ভালো লাগছে।'

মদনলাল শুধোলে, 'কিন্তু এই নির্জন জায়গায় কী নিয়ে আপনি সময় কাটাবেন?'

—'লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে! আমি আশা করছি, এখানেই আমার সে স্বপ্ন সফল হবে।'

সকৌতুকে অট্টহাস্য করে মোহনলাল বলে উঠল, 'হা হা হা হা! তাই নাকি, তাই নাকি? বটে?'

স্যার বীরেন্দ্রনাথ বললেন, 'কমলপুরে বসে কোনও পাগলেরও লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার সাধ হয় না।'

অরিন্দম বললে, 'আমাকে হতাশ করবেন না স্যার। একজন লোক অন্তিমকালে আমাকে বলে গিয়েছে, কমলপুরে এলে লক্ষ লক্ষ টাকার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। নানা কারণে তার কথায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু থাক, এ-প্রসঙ্গ যখন আপনাদের ভালো লাগছে না, তখন অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আসুন।'

মোহনলাল সাগ্রহে বললে, 'সে কী কথা, সে কী কথা? এ-প্রসঙ্গ আমার ভারী ভালো লাগছে! বলো কী, বলো কী—কমলপুরে লাখো লাখো টাকার স্বপ্ন?'

অন্যান্য সকলেও ব্যাপারটা ভালো করে শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল।

কিন্তু অরিন্দম মাথা নেড়ে বললে, 'আজ্ঞে না, আর একদিন সব শুনবেন, আজ এই পর্যন্ত।'

তারপরই আহারের জন্যে ডাক এল এবং সবাই গাত্রোত্থান করলে।

সকলের পিছনে যেতে যেতে সন্ধ্যা বললে, 'অরিন্দমবাবু আবার?'

—'সন্ধ্যাদেবী, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় যখন আরও ঘনিষ্ঠ হবে, তখন আমার দুর্বলতা নিশ্চয়ই আপনি মার্জনা করতে পারবেন।'

—'আপনার ওই প্রলাপগুলো কেবল লোকের চমক লাগাবার জন্যে তো?'

—'মোটেই নয়। যথাসময়েই সব কথা জানতে পারবেন।'

* * *

সেইদিন বৈকালে রামফলের আপত্তিতে কর্ণপাত না করেই অরিন্দম বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর মাঠে মাঠে অপথে-বিপথে আপন মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাকে দেখলে লক্ষ্যহীন বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে সে কমলপুরের চারিদিকটা রাখতে চায় নখদর্পণে।

ঘণ্টাদেড়েক এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করে ফেরবার পথে একজন লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। লোকটির দেহ বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট। বয়স তার চল্লিশের কম হবে না এবং পরনে তার খাকি কোট ও হাফপ্যান্ট। তার কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাগ এবং হাতে রয়েছে লাঠির ডগায় প্রজাপতি ধরবার একটা জাল। কখনও সে এ-ঝোপ থেকে যাচ্ছে ও-ঝোপে, কখনও দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছে, আবার কখনও মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

আচম্বিতে সামনের দিকে লাফ মেরে এক জায়গায় সে বসে পড়ল এবং হাতের প্রজাপতি ধরার জালটা মাটির উপরে চেপে ধরে সানন্দে চিৎকার করে উঠল।

অরিন্দম তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'ব্যাপার কী?'

লোকটি বললে, 'পেয়েছি মশাই, পেয়েছি। একটা দুর্লভ প্রজাপতি ধরতে পেরেছি।'

—'তাই তো দেখছি।'

—'এইভাবেই আমি অবসর যাপন করতে ভালোবাসি। সমুদ্রের তাজা হাওয়া, আর মাঠে মাঠে ভ্রমণ করে বেড়ানো, স্বাস্থ্যলাভের এমন চমৎকার উপায় আর নেই।'

—'আপনিই তো হচ্ছেন ডক্টর সেন?'

লোকটি চকিত স্বরে বললে, 'কেমন করে আপনি জানলেন?'

—'আমার প্রশ্ন শুনে আপনি বিস্মিত হচ্ছেন? দেখছি আমার কথা শুনে এখানকার সকলেরই মনে জাগে বিস্ময়। আপনাকে দেখলেই ডাক্তার বলে মনে হয়, আর কমলপুরে আছেন একজন মাত্র ডাক্তার—মিস্টার সেন। যাক সে কথা। ব্যাবসার খবর কী?'

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে ডাঃ সেন বললেন, 'আমার ব্যাবসা? আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না।'

—'আমার কথা এখানকার সকলেরই কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। ডাঃ সেন, আমি আপনার এই নতুন নেশার কথা জানতে চাই না, আমি শুনতে চাই আপনার পুরাতন পেশার কথা।'

ডাঃ সেন খুব মনোযোগের সঙ্গে অরিন্দমের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু সে তখন নির্বিকারভাবে তাকিয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। মুখের ভাব দেখে তার মনের কথা কিছুই বোঝা যায় না।

ডাঃ সেন অবশেষে ধীরে ধীরে বললেন, 'অরিন্দমবাবু, আপনি যে সুচতুর ব্যক্তি একথা আমি স্বীকার করছি।'

অরিন্দম বললে, 'আমি সুচতুর বলেই এখনও বেঁচে আছি। কোনও মুখ একবার দেখলে জীবনে আর আমি ভুলি না। আপনার মুখ আগে আমি দেখেছি।'

—'অরিন্দমবাবু, আপনি সুচতুর বটে, কিন্তু এবারে সত্যসত্যই আপনি ভুল করেছেন।'

অরিন্দম মুখ টিপে একটু হাসলে, তারপর বললে, 'আপনার কথা আমি মানি। মানুষ মাত্রই ভুল

করে। কিন্তু ডাঃ সেন, বাইরে থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে, আপনার কোর্টের পকেটে রয়েছে বেশ একটা ভারী জিনিস। কী ওটা? অটোমেটিক? কিন্তু অটোমেটিক রিভলভার নিয়ে কেউ কি বায়ুসেবন করতে বাইরে বেরোয়?'

ডাঃ সেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'মশাই, আপনাকে আমি একটা—'

অরিন্দম বাধা দিয়ে বললে, 'ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। দেখা যখন হল, আপনাকে আমি স্বাগত সম্ভাষণ করছি। আমার সঙ্গে চলুন আমার বাসায়। সেখানে তৈরি আছে 'চিকেন স্যান্ডউইচ' আর—ইচ্ছা যদি করেন তো 'জনি ওয়াকারে'র ব্ল্যাক লেবেল মার্কা হুইস্কি। আপত্তি করলে শুনব না, চলুন।' সে এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করলে ডাঃ সেনের হাত। অরিন্দম যা ধরে, আর ছাড়ে না। ডাঃ সেনের কোনও আপত্তিই গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তাঁকে টেনে নিয়ে চলল নিজের বাসার দিকে।

সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছে আকাশ ও সাগরের মিলন রেখায়।

রামফল এসে তাদের টেবিলের সামনে সাজিয়ে দিয়ে গেল দুই প্লেট স্যান্ডউইচ।

অরিন্দম শুধোলে, 'কিছু পানীয় গ্রহণ করবেন তো?'

—'হ্যাঁ। এক পেয়ালা চা।' তারপর একখণ্ড স্যান্ডউইচে একটা কামড় দিয়ে ডাঃ সেন বললেন, 'তারপর অরিন্দমবাবু, এইবারে কাজের কথা আরম্ভ করা যাক, কী বলেন?'

—'অনায়াসেই।'

—'কমলপুরে আপনি যে হাওয়া খেতে আসেননি, এটা আমার পক্ষে অনুমান করা কঠিন নয়। আপনি যে গোয়েন্দা নন, সেটাও আমি জানি। আপনার সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু কথাও আমার অজানা নেই।'

অরিন্দম সিগারেটে একটা টান মেরে অন্যমনস্কের মতন বললে, 'তারপর?'

ডাঃ সেন বললেন, 'শুনেছি, আপনি হচ্ছেন চতুর ব্যক্তি। কিন্তু আপনি যেন আন্দাজে ধরে নেবেন না আমি হচ্ছি নির্বোধ ব্যক্তি। আপনি যে কেন এখানে এসেছেন, সে-সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট। আপনি যদি আমার সপক্ষে থেকে কাজ করেন, তাহলে আমার কোনও আপত্তি নেই। নইলে আমি আপনাকে প্রাণপণে বাধা দেবারই চেষ্টা করব। তবে এটাও বলে রাখি, আপনাকে আমার বিপক্ষে নয়, সপক্ষে যদি পাই, তাহলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। অরিন্দমবাবু, এখন আমি আপনার মত জানতে চাই।'

অরিন্দম সামনের দিকে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারের আরও ভিতরে ঢুকে বসে বললে, 'আপনার পথ আর আমার পথ এক হতে পারে না ডাঃ সেন। বোম্বাইয়ের এক ব্যাংক থেকে বহু লক্ষ টাকা উধাও হয়েছে। তার উপরে আমি লোভ করব না; কারণ, সেটা হবে বেআইনি। কিন্তু যারা ব্যাংক লুট করেছিল, তাদেরই কাছে আছে দেশান্তর থেকে বিনা মাশুলে লুকিয়ে আনা বহু লক্ষ টাকার সোনার থান। তার মালিক নিরুদ্দেশ। আমি সেই বেওয়ারিস সম্পত্তির মালিক হতে চাই।'

—'সেসব সোনার থান নিয়ে যে নিরাপদে সরে পড়তে পারবেন, আপনি কি মনে মনে তা বিশ্বাস করেন?'

—'নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি।' অরিন্দম হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে সাঁৎ করে দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বললে, 'আপনার সঙ্গে আমি হাত মেলাব কি না, এ আলোচনা এখন বন্ধ করুন। কোনও বাঘের বাচ্চাকে আমি এই আলোচনা শুনতে দিতে প্রস্তুত নই।'

ডাঃ সেন বললেন, 'তার মানে?'

অরিন্দম উচ্চকণ্ঠে বললে, 'তার মানে কী জানেন? কোনও এক অতি কৌতূহলী লোক জানলার বাইরে ওই ঝোপটার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে। সন্ধ্যার আবছায়াতেও আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। আমার রিভলভার প্রস্তুত, সে একচুল নড়লেই আমি গুলি করব।'

তৃতীয়

একটুখানি মেলোড্রামা

ডাঃ সেন এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান হাত ঢুকল ডান পকেটের ভিতর।

অরিন্দম বললে, 'আপনাকে আর রিভলভার বার করতে হবে না। আমি দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই অতি কৌতূহলী লোকটা বিদ্যুতের মতো সরে পড়েছে। হয়তো সে আমাকে হত্যা করতে এসেছিল। অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে নরহত্যা করা খুবই সহজ বটে, কিন্তু আমাকে হত্যা করতে গেলে পোড়াতে হবে আরও বেশি কাঠ-খড়। অরিন্দম সহজলভ্য জীব নয়। একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাইরেটা একবার ভালো করে দেখে আসি।'

অরিন্দম তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল রামফল—তার হাতে একটা প্রকাণ্ড রিভলভার।

ডাঃ সেন হেসে উঠে বললেন, 'দেখছি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! কিন্তু রিভলভারটা কি এখানে না আনলে হত না?'

রামফল মুখে কিছু বললে না, কেবল রিভলভারের নলটা ঘুরিয়ে রাখলে ডাঃ সেনের দেহের দিকে।

মিনিট-দশেক পরে ফিরে এল অরিন্দম। বললে, 'শিকার সফল হল না। বাইরে ঘনিয়ে উঠেছে কয়লার মতো কালো অন্ধকার। আর বাঘের বাচ্চা নিশ্চয়ই ছুটে পালিয়েছে খরগোশের মতো দ্রুতবেগে। আরে আরে রামফল, এখানে তোমার রিভলভারটা হচ্ছে 'অধিকন্তু'! চটপট দু-গ্লাস বিয়ার নিয়ে এসো।'

—'হ্যাঁ কর্তা', বলতে বলতে রামফল বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

ডাঃ সেন বললেন, 'বিশ্বাস করুন অরিন্দমবাবু, আমি আপনাকে আমার সপক্ষেই পেতে চাই।'

'আপনার উপরওয়ালাদের মত নিয়েই কি এই কথা আমাকে বলছেন?'

—'নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সেদিক দিয়েও একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না।'

—'ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাবে আমি আশান্বিত হলুম না। তার চেয়ে আমার একটা কথা শুনুন। আপনি আমার সপক্ষে আসুন, তারপর আমি যা লাভ করব তার তিনভাগের একভাগ আপনার হাতেই তুলে দেব। আমার এই প্রস্তাবটা আপনার কাছে কি লোভনীয় বলে মনে হচ্ছে না? ভেবে দেখুন, ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার মিঃ সেন!'

—'আমার নাম ডাঃ সেন!'

মুখ টিপে একটু হেসে অরিন্দম বললে, 'ডাঃ সেন, আমরা কি এখনও পরস্পরের চোখে ধুলো ছুড়ব?'

ডাঃ সেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি হচ্ছেন বিচিত্র মানুষ। কিন্তু আজ আমি বিদায় হলুম, নমস্কার!'

অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে ডাঃ সেনের একখানা হাত ধরে বললে, 'চলুন, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি। নইলে আমার দুশ্চিন্তা হবে।'

ডাঃ সেন কিঞ্চিৎ উত্তপ্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি আমাকে নাবালক বলে মনে করেন?'

—'মোটেই নয়। এটা আমার ওজর মাত্র। নৈশবায়ু সেবন করতে আমার ভালো লাগে।'

পথ দিয়ে চলতে চলতে ডাঃ সেন বললেন, 'আপনি একদিকে, আর আমি একদিকে। এই দ্বৈতযুদ্ধ বোধহয় চিত্তাকর্ষক হবে, কী বলেন?'

অরিন্দম বিনীতভাবে বললে, 'আশা করি তাই।'

—'সত্যি বলছি, আপনার মতন প্রথম শ্রেণির অপরাধীর সঙ্গে এর আগে আমার দেখা হয়নি।'

অরিন্দম গম্ভীর স্বরে বললে, 'আপনি আগে থাকতে অনেক কিছুই কল্পনা করছেন। আমি অপরাধী? আমি আজ পর্যন্ত এমন কিছু করিনি, আইনে যা অপরাধ বলে প্রমাণিত হয়।'

বাসার কাছে পৌঁছে ডাঃ সেন বললেন, 'আসুন অরিন্দমবাবু, একটা স্যাম্পেনের বোতল খুলে দুজনে আরও কিছু কথা-কাটাকাটি করি।'

অরিন্দম বললে, 'সে চেষ্টা আর একদিন করা যাবে। আজকে আমায় মাপ করুন, নমস্কার।'

অরিন্দম নিজের বাসার দিকে অগ্রসর হল। রাত তখন দশটার কাছাকাছি। আকাশে চাঁদ নেই। দিকে দিকে অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝির চিৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দই কানে আসে না। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই কমলপুরের বাসিন্দাদের কলরব নীরব হয়ে যায়। সামনেই অন্ধকারের মধ্যে আরও জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রায়বাহাদুর বিজনকুমারের প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানা। বাড়িখানার উপর তলায় কোনও জানলা দিয়েই আলো দেখা যাচ্ছিল না। তার নীচের তলাটা দেখবার উপায় নেই; কারণ বাড়িখানার চতুর্দিকেই দাঁড়িয়ে আছে খুব উঁচু প্রাচীর।

অরিন্দম মনে মনে বললে, 'বাড়ি তো নয়, যেন জেলখানা। এ-বাড়ির মালিক বোধহয় বাইরেকার লোকদের দৃষ্টিকে ভয় করে।' সে স্থির করলে, আজকে চুপিচুপি এই বাড়ির ভিতর ঢুকে কিছু কিছু তদারক করে আসবে।

সে বাড়ির চারিদিকে একবার পদচালনা করে এল। বাড়ির ফটকটাও মস্ত কাঠের দরজা দিয়ে ঢাকা। পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে এক জায়গায় রয়েছে একটা পেয়ারাগাছ। তারই একটা ডাল দেওয়ালের উপরদিক দিয়ে চলে গিয়েছে। অরিন্দম আস্তে আস্তে সেই ডাল ধরে বাড়ির পাঁচিলের কাছে গিয়ে পড়ল। পাঁচিলের উপরে যে বোতল ভাঙা কাচ আছে, এটা সে আগে থাকতেই জানত। নিজের কোটটা গা থেকে খুলে পাট করে দেওয়ালের কাচের উপরে রাখলে। তারপর নিজের সেই জামার উপরে গিয়ে বসে দেওয়ালের ভিতরদিকে ঝুলে পড়ল। তারপর নিঃশব্দে অবতীর্ণ হল ভূমিতলে।

অরিন্দম মাটির উপরে বিড়ালের মতো আলতো ভাবে পা ফেলে অগ্রসর হল। বাড়ির এদিকে নীচের তলাতেও সব জানলা অন্ধকার। সে ঘুরে বাড়ির অন্যদিকে গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে তার দৃষ্টি হল আকৃষ্ট। একটা জানলা দিয়ে ভিতরের আলো বাইরের ঘাস-জমির উপরে এসে পড়েছে। উঁচু প্লোরের উপর রয়েছে বাড়িখানা। অরিন্দম খুব সাবধানে প্লোরের উপর উঠে

বসল। জানলার গরাদে নেই দেখে আশ্বস্ত হয়ে একবার পর্দা ফাঁক করে সে ঘরের ভিতর দিকে উঁকি মেরে দেখলে।

এক দৃষ্টিতেই সে দেখে নিলে, দামি দামি আসবাবপত্র, তৈলচিত্র ও পাথরের মূর্তি প্রভৃতি দিয়ে ভালো করে সাজানো একখানা হল্‌ঘর এবং একটা টেবিলের ধারে বসে দুই মূর্তি—একজন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের একজন হচ্ছেন রায়বাহাদুর এবং আর একজন সন্ধ্যাদেবী ছাড়া আর কেউ নয়।

বিজন বলছিল, 'প্রিয় সন্ধ্যা, এখন আসল অবস্থাটা বুঝতে পারলে তো?'

সন্ধ্যা বললে, 'আমি এসব কথা বিশ্বাস করি না।'

বিজন কর্কশকণ্ঠে হেসে উঠল। তারপর বললে, 'এইসব দলিল আর কাগজপত্র দেখেও, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?' নিজের পকেটের ভিতর থেকে আরও কতকগুলো কাগজ বার করে সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'ধৈর্য ধরে এতক্ষণ তোমার কথা শুনছিলুম বটে, কিন্তু আর পারলুম না। তোমাকে দেখলেই আমার মনে জাগে মিষ্ট ভাব, কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই জেনো, কোনও রকম ভাবের আবেগেই আমি নিজের কর্তব্য ভুলি না। আমি নির্বোধ নই। তোমাদের বাড়ি আবার বন্ধক রেখে আমি আর এক পয়সাও দিতে পারব না। এর মধ্যেই তোমার পিসিকে আমি যত টাকা ধার দিয়েছি, তোমাদের বাড়িখানা বিক্রি করলেও তার অর্ধেক উসুল হবে না। আবার আমি টাকা দেব? অসম্ভব!'

সন্ধ্যা আর্তকণ্ঠে বললে, 'তাহলে আমার পিসিমা একেবারেই ভেঙে পড়বেন।'

—'তোমার পিসিকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি কি আমার ঘাড় ভাঙতে চাও?'

কাগজগুলো তুলে নিয়ে সন্ধ্যা উত্তপ্তস্বরে বললে, 'আপনি দুরাত্মার মতন কথা বলছেন! আপনার মতন লোকের কাছে হাজার কয়েক টাকার মূল্য কতটুকু?'

বিজন শান্তভাবে বললে, 'মূল্য আছে সন্ধ্যা, মূল্য আছে বই কি! টাকা আমি দিতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।'

—'শর্ত? কী শর্ত?'

—'আসল কথা কী জানো সন্ধ্যা? আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই।'

সন্ধ্যা স্তম্ভিতের মতন বসে রইল দুই-তিন মুহূর্ত। তারপরই সে হঠাৎ দুই হাতে সেই কাগজগুলো মাথার উপর তুলে ধরে সশব্দে ছিঁড়ে ফেলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'শয়তান, এই হচ্ছে আমার জবাব!'

অরিন্দম মনে মনে বললে, 'চমৎকার সন্ধ্যাদেবী! আপনার বন্দনা-গান গাইছে আমার মন।'

বিজন একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে না। হাসতে হাসতে বললে, 'সন্ধ্যা, ওগুলো হচ্ছে নকল। আসল দলিল আছে আমার লোহার সিন্দুকে। নির্বোধ মেয়ে (বলতে বলতে তার স্বর হয়ে উঠল উগ্র), যে-বুদ্ধির জোরে নিজের চেষ্টায় আমি অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছি, ঢের ঢের ধড়িবাজ সেয়ানা লোককে আমি যে টিট করতে পেরেছি, সেই বুদ্ধিকে কি তোমার মতন একটা গেঁয়ো মেয়ে ব্যর্থ করে দিতে পারে? রাবিশ! আমার ধৈর্যের বাঁধ তুমি এইবারে ভেঙে দিলে। আমার কাছে আর কোনও বাজে আবদার চলবে না। আমার স্পষ্ট কথা হচ্ছে এই: তুমি যদি আমাকে বিবাহ না করো, তাহলে আমি আমার পাওনা টাকার জন্যে তোমার পিসির নামে নিশ্চয়ই নালিশ করব। হয় রাজি হও, নয় চলে যাও। আর কোনও হিস্টিরিয়ার অভিনয় আমি দেখতে চাই না।'

অরিন্দম একলাফে একেবারে ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ে বললে, 'ঠিক! আর হিস্টিরিয়া নয়!'

সন্ধ্যা চমকে উঠে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে রইল বিস্ফারিত নেত্রে। বিজনও লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'কে রে?' তার মোটা মুখখানার দুটো কুচকুচে চোখের উপরে বিভ্রান্ত দৃষ্টি! অরিন্দম বক্ষের উপরে দুই বাহু নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল হাস্যমুখে।

বিজন গর্জন করে বললে, 'কে তুমি?'

অরিন্দম প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'নমস্কার রায়বাহাদুর, নমস্কার! দয়া করে আমাকে একটা উপসর্গ বলে মনে করবেন না।'

তার সেই ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দেহের মধ্যে এতটুকু দ্বিধার ভাব নেই। সন্ধ্যা পায়ে পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অরিন্দম তার হাত ধরে তাকে নিজের পাশে টেনে নিলে।

কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রায় সহজ স্বরেই বিজন বললে, 'বোধ হচ্ছে আপনার নামই অরিন্দমবাবু। কিন্তু আমি যে আজ আপনাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি, আমার তো তা মনে হচ্ছে না?'

অরিন্দম সায় দিয়ে বললে, 'ঠিক বলেছেন। আমারও তা মনে হচ্ছে না।'

বিজনের দম যেন বন্ধ হয়ে এল রুদ্ধ ক্রোধে। তাদের কথাবার্তা অরিন্দম অন্তরালে থেকে কতখানি শুনেছে, সেটাও সে আন্দাজ করতে পারলে না। ক্রুদ্ধ হলেও তার মনে খানিকটা ভয় সঞ্চারও হল। অরিন্দমের দেহ চওড়ায় দোহারা না হলেও মাথায় সে ছয় ফুট দুই ইঞ্চি উঁচু এবং শরীরও তার রীতিমতো বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। তার উপরে তার মুখের বেপরোয়া হাসি দেখলে মন ভীত না হয়ে পারে না। অবশেষে বিজন ধীরে ধীরে বললে, 'অরিন্দমবাবু, স্পষ্ট কথাই বলা ভালো। আপনার এই আকস্মিক আবির্ভাবটা সন্তোষজনক কি?'

অরিন্দম হাসতে হাসতে বললে, 'আমি ওকথা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।'

পাশের একটা ছোটো টেবিলের উপরে সাজানো ছিল 'ডিকান্টার', সোডার বোতল ও কাচের গেলাস। সেইদিকে অগ্রসর হয়ে বিজন বললে, 'বেশ, যখন এসেছেনই, আমার অতিথি সৎকার করা উচিত। কিঞ্চিৎ হুইস্কি পান করবেন কি? আমি দেখাতে চাই, আপনাকে আমি শত্রু বলে মনে করি না।'

—'ধন্যবাদ। কিন্তু ও-হুইস্কির ভিতরে কী আছে, কে জানে? অপরিচিত জায়গায় কিছু পান করা আমি নিরাপদ বলে মনে করি না।'

—'বড়োই দুঃখের কথা অরিন্দমবাবু, আপনার এই সন্দেহ ভদ্রজনোচিত নয়।'

—'না। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি তথাকথিত ভদ্রলোক নই। তথাকথিত ভদ্রলোকরা হচ্ছেন অসহনীয় জীব। আমি শুনেছি, এখানে যে-কয়জন ভদ্রলোক থাকেন, তাঁরা আপনার মতো ভদ্রলোকের দিকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দেখেও আকৃষ্ট হতে চান না। কিন্তু আমি তাঁদের দলের লোক নই। আপনার সঙ্গে মেলামেলা করতে আমি একটুও আপত্তি করব না। আশা করি, ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হবে। আমরা দু-জনেই পরস্পরের সঙ্গ অত্যন্ত উপভোগ করব। ইতি—শ্রীঅরিন্দম।'

—'তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই।' এই বলেই বিজন টেবিলের উপরের ঘণ্টাটা টিপে দিলে।

অরিন্দম যেখানে ছিল সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিনিটখানেক পরেই দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর যে-লোকটা প্রবেশ করলে, তাকে দেখতে পেশাদার পালোয়ানের মতো।

বিজন বললে, 'অরিন্দমবাবুকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার দরজাটা দেখিয়ে দাও।'

অরিন্দম বললে, 'আপনার অতিথিসৎকারের পদ্ধতিটা চমৎকার বটে!' তারপর সকলের মনে বিস্ময় জাগিয়ে সে অত্যন্ত প্রশান্ত মুখেই সুড়সুড় করে আগন্তুকের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এত সহজে যে অরিন্দমের কবল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে, বিজন এটা ধারণাতেও আনতে পারেনি। অবহেলার হাসি হেসে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'এইসব ধাপ্পাবাজ কাপুরুষকে আমি খুব চিনি। নরম মাটি দেখলেই এদের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। হেঃ!'

সন্ধ্যা কিছু বললে না।

কিন্তু বিজনের আনন্দ স্থায়ী হল না। বাইরে থেকে এল যেন একটা ধস্তাধস্তির শব্দ। বিজন উৎকর্ণ হয়ে যখন দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, সেই সময়ে অরিন্দম আবার বাগানের জানলার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে। বললে, 'আবার আমি নিজের বাসাতেই ফিরে এলুম বিজনবাবু।'

বিজন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হতভম্বের মতো।

তারপরেই ঘরের ভিতর আবার প্রবেশ করলে সেই পালোয়ানের মতন লোকটা। তখন তার চেহারার অল্প বিস্তর রূপান্তর ঘটেছে। তার রক্তাক্ত মুখ দেখলে মনে হয়, নাক-মুখ থুবড়ে সে পড়ে গিয়েছে কোনও কঠিন জায়গার উপরে এবং তার চোখ দুটোকেও তখন মনে হচ্ছিল না প্রেমিকের চোখ।

অরিন্দমের দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিজনের দিকে ফিরে সে বললে, 'শুনুন হুজুর!'

অরিন্দম বললে, 'বিশেষ কোনও শ্রোতব্য কথা নেই বিজনবাবু! ওই লোকটা বাইরে গিয়ে আমাকে লাথি মারবার চেষ্টা করেছিল। সুখের বিষয়, না দুঃখের বিষয় বলব? সফল হয়নি তার চেষ্টা। পা তোলার সঙ্গে-সঙ্গেই নাকের উপর আমার একমাত্র ঘুসি খেয়ে তাকে হতে হয়েছে প্রপাত ধরণীতলে!'

অরিন্দমের শক্তি ও সাহস দেখে চমকিত হয়ে উঠল বিজনের মন। তার এই পালোয়ান-অনুচরের দেহ আয়তনে অরিন্দমের দ্বিগুণ। অথচ এত সহজে তাকে হার মানতে হয়েছে তার কাছে! সে ধীরে ধীরে বললে, 'তারপর অরিন্দমবাবু! আপনি এখানে আর কী কী কর্তব্যসাধন করতে এসেছেন?'

অরিন্দম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'কিছু না, কিছু না! আপনার অতিথিসৎকার উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। রাত ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আমি এইবারে সন্ধ্যাদেবীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাই।' সে সন্ধ্যাকে নিয়ে আবার বাগানের জানলার দিকে অগ্রসর হল! তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে বললে, 'বিজনবাবু, দেবিকাদেবী আপনার কাছ থেকে বাড়ি বাঁধা রেখে কিছু টাকা ধার করেছেন। কিন্তু কত টাকা!'

—'সে-কথায় আপনার দরকার কী?'

—'আপনি দলিল ফেরত দিন, আমি এখনই আপনাকে চেক লিখে দিচ্ছি।'

—'আমি নারাজ।'

—'উত্তম। আইন সম্বন্ধে আমার বেশি জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু সহজ জ্ঞানে বলে, টাকা ফেরত পেলে আপনি কিছুই করতে পারেন না। আচ্ছা, আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করে, আপনার কাছে একখানা চেক পাঠিয়ে দেব, তারপর কী হয় দেখা যাবে।'

অরিন্দম জানলার কাছে গিয়ে সন্ধ্যাকে ঠিক শিশুর মতো দুই বাহু ধরে তুলে নিয়ে বাগানের ভিতরে নামিয়ে দিলে। তারপর মুহূর্তে নিজেও লাফিয়ে পড়ল বাগানের ভিতরে—

—পরমুহূর্তেই শোনা গেল কয়েকটা প্রকাণ্ড কুকুরের বিকট চিৎকার!

সন্ধ্যা শিউরে উঠে বললে, 'সর্বনাশ! বিজনবাবুর কয়েকটা হিংস্র 'হাউন্ড' আছে! একবার তারা দু-জন চোরকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছিল! আজও আমাদের পেছনে তাদেরই লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে!'

চোখের পলক ফেলবার আগেই দুই হাতে সন্ধ্যাকে তুলে ধরে অরিন্দম আবার তাকে ঘরের ভিতরে স্থাপন করলে! তারপর নিজেও একলাফে ঘরের ভিতরে এসে জানলাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বললে, 'সন্ধ্যা, তুমি কি মেক্সিকোর ছোরা ছোড়ার খেলা দেখতে চাও? তাহলে আমার 'শ্রীমতী'কে বার করি!'

বিজনের হাতে তখন রয়েছে একটা ছোটো অটোমেটিক রিভলভার।

অরিন্দমের ডান হাত বিদ্যুৎবেগে স্পর্শ করলে বাম হাতকে। তারপরেই ঝকমক করে উঠল খাঁটি ইস্পাতে গড়া জ্বলন্ত 'শ্রীমতী'।

চতুর্থ

ঘটনার পর ঘটনা

বিজন তার রিভলভারটা তুলে ধরেনি। তার ডান হাতখানা ঝুলছিল জানুর পাশে এবং রিভলভারের মুখ ছিল কার্পেটের দিকে। অরিন্দমের মুখ দেখলে বোধ হয়, যেন সে একেবারেই অন্যমনস্ক। কিন্তু বিজন বেশ বুঝতে পারলে যে, এই অন্যমনস্কতা তার ভান ছাড়া আর কিছুই নয়। তার হাত এতটুকু নড়লেই ওই তীক্ষ্ণ ছোরাখানা তিরবেগে এসে পড়বে তার দেহের উপরে!

অরিন্দম বললে, 'রায়বাহাদুরের আর কি গল্প করবার সাধ নেই?'

বিজন নীরস কণ্ঠে বললে, 'আপনার হাতে ওই ছোরাখানা দেখবার পর কার গল্প করবার সাধ হয়?'

—'উত্তম, তাহলে একটা রফা করা যাক আসুন। ডান হাতের আঙুলগুলো আলগা করে আপনি যদি রিভলভারটাকে কার্পেটের উপরে ফেলে দেন, তাহলে আমার 'শ্রীমতী'ও যথাস্থানে প্রবেশ করতে বিলম্ব করবে না!'

বিজন রিভলভারটাকে ত্যাগ করলে কক্ষতলে। অরিন্দম হেঁট হয়ে পড়ে ক্ষিপ্রহাতে সেটাকে তুলে নিয়ে নিজের পায়ের তলায় রেখে তার উপরে একটা পদ স্থাপন করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারও ছোরাখানা যথাস্থানে খাপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

তারপর সে ফিরে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এখানকার দৃশ্যটা আপনার কাছে নিশ্চয়ই একঘেয়ে লাগছে? আপনি কি বাড়ি যেতে চান?'

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে সায় দিলে।

—'বিজনবাবু সন্ধ্যাদেবী বাড়িতে যেতে চান।'

বিজন টেবিলের উপর থেকে সিগারের বাক্সটা তুলে নিয়ে বেছে বেছে একটা সিগার্ বার করলে। তারপর বাক্সটা আবার টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বললে, 'সন্ধ্যার এখন যাওয়া হতে পারে না। ওর সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে।'

—'পরামর্শটা কালকের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে তো?'

—'না, তা পারে না।'

দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে বিজনের মুখের দিকে অরিন্দম তাকিয়ে রইল নীরবে কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বিজনের রিভলভারটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে গিয়ে জানলাটা একটুখানি খুলে বললে, 'তাহলে রায়বাহাদুর, কাল সকালটা আপনাকে কাটাতে হবে তিন-চারটে দামি কুকুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে করতে।'

বিজন অর্ধমুদ্রিত নেত্রে অল্পক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখ দেখলে মনে হয়, সে যেন কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। তারপর সে ধীরে ধীরে বললে, 'অরিন্দমবাবু, আপনি একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ করেননি। ওই টেবিলের উপরে আছে একটা ইলেকট্রিক ঘণ্টার বোতাম। সিগারের বাক্সটা তার উপরে রেখে আমি এমনভাবে চাপ দিয়েছি যে, বাইরে যথাস্থানে হয়েছে ঘণ্টাধ্বনি। ওটা হচ্ছে আমার একটা সাংকেতিক আদেশ। এতক্ষণে আমার তিনজন লোক চারটে 'ব্লাড হাউন্ড' নিয়ে ওই বাগানের ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করছে। আর আরও দুজন লোক অপেক্ষা করছে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পথে। কাল সকালে হয়তো আমাকে কোনও নির্বোধ অনাহুত অতিথির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।'

অরিন্দম বললে, 'উত্তম, উত্তম, উত্তম, উত্তম!'

রায়বাহাদুর বিজনকুমার এইবারে প্রফুল্লমুখে নিজের চেয়ারের উপরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসে পড়ল। তারপর আর কোনওদিকে না তাকিয়ে নিজের মনেই সিগারের ধূম্র উদ্‌গিরণ করতে লাগল।

অরিন্দম মনে মনে বুঝলে, সমস্যা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। কিন্তু মুখে সে সহজ স্বরেই বললে, 'ধরুন রায়বাহাদুর, আমি যদি ভ্রমক্রমে এই রিভলভারের ঘোড়াটা হঠাৎ টিপে দি, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার হৃৎপিণ্ড যদি বিদীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে অবস্থাটা আপনি কি অত্যন্ত উপভোগ করবেন?'

—'মোটেই নয়! কিন্তু আমার সে অবস্থা হলে আপনার কী দুরবস্থা হবে সেটা বুঝতে পারছেন কি? রিভলভারের আওয়াজ শুনলেই বাড়ির যত লোক কি হুড়মুড় করে এই ঘরে ঢুকে পড়বে না? তারপর?'

অরিন্দম মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে, 'ঠিক কথা, তারপর? হুঁ, তারপরের অবস্থাটা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হবে না?'

বিজন বললে, 'আরও একটা কথা জেনে রাখুন। আপনি যদি আমাকে খুন করে কোনওগতিকে এখান থেকে পালাতেও পারেন, তাহলেও আত্মরক্ষা করতে পারবেন না। আপনিই যে এখানে এসেছেন, সে-কথা বাড়ির আরও কোনও লোকও জানে। সুতরাং পুলিশকে আর ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দেবেন কেমন করে?'

—'রায়বাহাদুর, আপনার যুক্তি অকাট্য। অতএব আপাতত আমাকে নরহত্যার চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। তবে আমাকে একটা কিছু করতে হবে তো, জানেন তো কাজ না থাকলে লোকে করে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা। কিন্তু কী করি বলুন দেখি? আপনার এখানে রয়েছে অনেক ভালো ভালো ছবি, মূর্তি আর শিল্প নিদর্শন। আশা করি, কিছুক্ষণ ওইগুলোর উপরে দৃষ্টি চালনা করলে আপনি আমার উপরে ক্রুদ্ধ হবেন না?'

বিজন কোনও জবাব দিলে না, গুম হয়ে বসে সিগার টানতে লাগল।

অরিন্দম কিছুমাত্র ত্বরান্বিত না হয়ে ঘরের এদিকে-ওদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কখনও

দেওয়ালের গায়ে টাঙানো কোনও ছবি দেখে। কখনও টেবিলের উপর থেকে একখানা মিনে করা থালা তুলে নেয়। কখনও পরীক্ষা করে এটা-ওটা-সেটা। এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে বিজনের খুব কাছে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু বিজন তার দিকে ফিরেও তাকাল না। নিজের সম্বন্ধে সে এখন নিশ্চিন্ত। সে জানে, শত্রু এখন তার হাতের মুঠোর ভিতরে। শিকারি বিড়াল যখন ধৃত ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে, তার অবস্থা এখন তারই মতন। অরিন্দমকে সে হস্তগত করেছে, কিন্তু নিজে আছে তার নাগালের বাইরে। সে মাঝে মাঝে সিগার টানে এবং মাঝে মাঝে সিগারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।

বিজনের চেয়ারের উপরে হাত রেখে অরিন্দম বললে, 'বাঃ, এখানে এই ব্রোঞ্জের নারীমূর্তিটি তো খুব চমৎকার!' সে মুখে এই কথা বললে বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবছে কেবল মুক্তির উপায়! কেমন করে অভিমন্যুর মতন ধরা না পড়ে এই ব্যূহ ভেদ করে বাইরে চলে যাওয়া যায়? নানা পথের কথা তার মনে হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছে, সব পথই রুদ্ধ!

বিজন মুখ তুললে না। যেন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বাঁ হাতের নখগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'অরিন্দমবাবু, ভাববেন না আপনাকে আমি তাড়া দিচ্ছি। কিন্তু রাত কি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে না? আপনাকে এখন কিছুদিন আমারই অতিথি হয়ে থাকতে হবে। এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প। সুতরাং আজকের পালা আপাতত কি শেষ করে দেওয়াই উচিত নয়?'

অরিন্দম বললে, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কিন্তু এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটা আমার বড়ো পছন্দ হয়েছে। গরিব মানুষ, এমন-সব শিল্পের ঐশ্বর্য চোখেও দেখতে পাই না। এটিকে হাতে নিয়ে আমি যদি একটু পরীক্ষা করি, আপনার আপত্তি আছে কি?'

জামার হাতার উপরে খানিকটা সিগারের ছাই পড়ে গিয়েছিল, বিজন হেঁটমুখে ফুঁ দিয়ে ছাইগুলোকে উড়িয়ে দিতে দিতে বললে, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার এইবারে ঘুমোবার সময় হয়েছে।'

মূর্তিটা দেড় ফুটের বেশি নয়। সেটাকে এক হাতে দিয়ে তুলে নিয়ে অরিন্দম বললে, 'বেশ, আপনি ইচ্ছা করলে এখনই শুয়ে পড়তে পারেন!' সে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলে জানলার দিকে যাবার জন্যে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রোঞ্জের সেই মূর্তিটা তুলে—সজোরে নয়—মারলে বিজনের মাথার উপরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানা চেয়ার তুলে মাথার উপরকার বৈদ্যুতিক বাতির ঝাড়ের উপরে এমনভাবে আঘাত করলে যে, সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হয়ে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে।

অরিন্দম অন্ধকারে নিম্নস্বরে ডাকলে, 'সন্ধ্যা!'

সন্ধ্যা একেবারে তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর চোখের নিমেষে জানলাটা খুলে সন্ধ্যাকে সে শিশুর মতোই কোলে তুলে নিলে এবং পরমুহূর্তে সেই অবস্থাতেই এক লাফ মেরে উদ্যানের ভিতরে অবতীর্ণ হয়েই তিরবেগে দৌড়তে লাগল।

খুব কাছেই বাগানের ভিতরে অপেক্ষা করছিল দু-জন লোক। কিন্তু এত অকস্মাৎ এবং এমন অস্বাভাবিক ভাবেই ঘটল এই ঘটনাটা যে, অরিন্দমকে তারা কোনওই বাধা দিতে পারলে না। তারা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল চার-পাঁচ মুহূর্ত। তারপর বেগে ধাবমান হল অরিন্দমের পিছনে।

অরিন্দম প্রথমটা বাগানের পথ ধরেই ছুটছিল! তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ পথ ছেড়ে একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যাকে নামিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললে, 'একটুও নড়বেন না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

চারিদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, চোখে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। তারপর দ্রুত পদশব্দ শুনে বোঝা গেল, অনুসরণকারীরা ঝোপ ছাড়িয়ে পথের উপর দিয়ে ছুটে গেল অন্যদিকে।

অরিন্দম ফিসফিস করে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, যেখান দিয়ে আমি বাগানের ভিতরে ঢুকেছি, ঠিক সামনেই আছে ওই জায়গাটা। আমি এখনই আপনাকে পাঁচিলের উপরে তুলে দিচ্ছি।'

—'কিন্তু পাঁচিলের উপরে আছে যে ভাঙা কাচ!'

—'কোনও ভয় নেই। পাঁচিলের উপরে আমার পুরু কোটটা পাট করে পেতে রেখেছি। কিন্তু উপরে উঠে আপনাকে গাছের ডাল ধরে নীচের দিকে ঝুলে পড়তে হবে, তারপর ডাল ছেড়ে লাফিয়ে পড়তে হবে মাটির উপরে। পারবেন?'

—'খুব পারব! কিন্তু আপনিও আসছেন তো?'

—'না। এখনও আমার কিছু কাজ বাকি আছে!'

—'আপনাকে এই ভয়ানক জায়গায় একলা ফেলে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

—'এখন নির্বোধের মতন কথা কইবার সময় নয়। যে-কোনও মুহূর্তে ওরা এসে পড়তে পারে। আপনি এখানে থেকেও আমার কোনওই উপকার করতে পারবেন না। আর শুনুন। আপনার পিসিমাকে এসব কথা বলবার দরকার নেই। তবে এক ঘণ্টার মধ্যেও আমি যদি আপনার সঙ্গে দেখা না করি, তাহলে ডাঃ সেনের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ঠিক এক ঘণ্টা। চলুন।'

অরিন্দম যথাস্থানে গিয়ে সন্ধ্যাকে আবার পুতুলের মতোই উপর দিকে তুলে ধরলে, সন্ধ্যা পাঁচিলের উপরে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল।

ঠিক সেই সময়েই খানিক দূরে শোনা গেল আবার কাদের পায়ের শব্দ।

অরিন্দম বললে, 'ঝুলে পড়ুন, ডাল ধরে ঝুলে পড়ুন, ওই ওরা আবার আসছে।'

সন্ধ্যাকে নিরাপদে পালাবার অবসর দেবার জন্যে, নিজের দিকে শত্রুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে চিৎকার করে উঠল, 'চলে আয় বদমাইশরা, চলে আয়!'

প্রাচীরের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সন্ধ্যার ছায়ামূর্তি।

অরিন্দম প্রাণপণে আর একদিকে দৌড়তে আরম্ভ করলে। তারপর আবার আর একটা ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ে নিজের মনেই সে বললে, 'আজ আমার বন্ধু হচ্ছে এই অন্ধকার আর ঝোপগুলো।'

আবার একাধিক দ্রুত পদধ্বনি সেই ঝোপটা পার হয়ে গেল। অরিন্দম বাইরে বেরিয়ে বাগানের ফটকের দিকে ছুটতে লাগল। এখানে আর তার কোনও কাজ নেই, বিপদ এখন নিশ্চয়ই সন্ধ্যার নাগাল ধরতে পারবে না। সে নিরাপদ।

অতর্কিতে তার দেহের সঙ্গে হল বিপরীত দিক থেকে ধাবমান আর একটা মূর্তির সংঘর্ষ। ধাক্কা খেয়ে লোকটা হল ভূতলশায়ী। সে সামলে ওঠবার আগেই অরিন্দম তার নাক মুখ চোখের উপর করল প্রচণ্ড গোটাকয়েক মুষ্ট্যাঘাত। তারপর তাকে দুই হাতে তুলে ধরে পথ থেকে সরিয়ে নিক্ষেপ করলে আর একদিকে। সেখানে ছিল বিলাতি 'ক্যাকটাস' জাতীয় কাঁটাগাছের ঝোপ, লোকটা হুড়মুড় করে তার উপরে গিয়ে পড়ে বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর থেকে শোনা গেল রক্তপায়ী ভীষণ 'হাউন্ডে'র চিৎকার।

অরিন্দম বললে, 'জায়গাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, আর এখানে থাকা নয়!' সে দৌড় মারলে বাগানের ফটকের দিকে।

ফটকের কাছে গিয়ে একটানে খুলে ফেললে অর্গল।

ফটকের দরজা টেনে খুলে ফেলতেই একটা শক্তিশালী টর্চের আলোকে তার চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল। দুই পা পিছিয়ে এসে সে দেখলে, তার দিকে রিভলভারের লক্ষ্য স্থির করে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে আর এক মূর্তি!

সে হচ্ছে মদনলাল!

পঞ্চম

দেবিকা, মোহনলাল, ডাঃ সেন

প্রাচীরের উপর থেকে গাছের ডাল ধরে সন্ধ্যা খানিকটা নীচে ঝুলে পড়ল, তারপর নিজের 'হাই জাম্পে' অভ্যস্ত দেহ নিয়ে ভূমিতলে অবতীর্ণ হল অত্যন্ত অনায়াসেই। দ্রুতপদে দৌড়ে নিজের বাড়ির কাছাকাছি এসে আবার সে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজে নিরাপদ হয়ে আবার সে ভাবতে লাগল অরিন্দমের কথা। নির্বান্ধব শক্রপুরী। নির্দয়, হিংস্র দুরাত্মার দল। রক্তপায়ী 'হাউন্ড'। এদের মধ্যে পড়ে অরিন্দমবাবুর অবস্থা না জানি এখন কতখানি অসহায় হয়ে উঠেছে! শিউরে শিউরে উঠতে লাগল তার মন।

কিন্তু এই অরিন্দমবাবুর আসল পরিচয়টা কী? তাঁর সম্বন্ধে নানা লোক বলে নানা কথা। সেসব কথা শুনলে বিপজ্জনক লোক বলে মনে হয় অরিন্দমবাবুকেও। কিন্তু তিনি শান্তশিষ্ট লোক না হতে পারেন, তবে তার পক্ষে যে উপকারী-বন্ধুর মতো, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে তিনি কোনওই আপত্তিকর ব্যবহার করেননি, বরং সমূহ বিপদ থেকে আজ তাকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর কাছে তাকে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতেই হবে।

চলতে চলতে এবং এইসব কথা ভাবতে ভাবতে সে নিজের বাড়ির সামনে এসে দেখে, ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেবিকা।

দেবিকা শুধোলেন, 'কে?'

সন্ধ্যা বললে, 'আমি পিসিমা!'

—'এসব কীসের গোলমাল শুনছি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু জানো?'

—'কী একটা ব্যাপার হয়েছে বটে।' বলতে বলতে সে বাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোতে তার দিকে তাকিয়ে দেবিকা দেখলেন, সন্ধ্যার কাপড় গিয়েছে ছিঁড়ে এবং তার হাতের স্থানে স্থানে রয়েছে রক্তাক্ত আঁচড়ের দাগ।

সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেবিকা বললেন, 'এসব কী সন্ধ্যা? তুমি কি কারুর সঙ্গে মারামারি করে আসছ?'

সন্ধ্যা বাড়ির দিকে পদচারণা করতে করতে বললে, 'আপাতত আমি কিছুই বলতে পারব না। আমাকে খানিকক্ষণ ভাবতে দিন।'

সে বৈঠকখানাঘরে গিয়ে একখানা সোফার উপরে বসে পড়ল।

দেবিকা সন্দেহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ তুমি রায়বাহাদুরের বাড়িতে গিয়েছিলে! রায়বাহাদুর আজ কি তোমার সঙ্গে কোনওরকম বাহাদুরি করেছেন?'

অধীর স্বরে সন্ধ্যা বললে, 'দোহাই পিসিমা, সেসব কিছুই নয়। দয়া করে আমাকে অল্পক্ষণ একটু একলা থাকতে দিন।'

দেবিকা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সন্ধ্যার ঠিক সামনেই একখানা চেয়ারের উপরে নিজের অঙ্গভার ন্যস্ত করে স্তব্ধভাবেই তিনি তার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

সন্ধ্যা বসে বসে ভাবতে লাগল, তার পিসি তো আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আসল কথা না শুনে কিছুতেই ছাড়বেন না। কিন্তু অরিন্দম যে তার মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। পিসির কাছে তাঁর সম্বন্ধে কোনও কথাই বলতে মানা। সে তার পিসিকে খুব চেনে। সওয়াল জবাবে তার পিসি হচ্ছেন যে-কোনও উকিল ব্যারিস্টারের মতো। অরিন্দমের নাম লুকিয়ে কোনও কোনও সত্য কথা না বলে আর উপায় নেই।

দেবিকা গম্ভীর স্বরে শুধোলেন, 'তারপর?'

অবশেষে সন্ধ্যা বললে, 'তারপর ব্যাপার হচ্ছে এই! আজ বৈকালে বিজনবাবুর কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পাই। তাঁর ইচ্ছা, রাত্রেই সাড়ে আটটা নাগাদ কারুকে কিছু না বলে আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কৌতূহলী হয়ে আমি গিয়েছিলুম তাঁর কাছে। অনেকক্ষণ একথা-সেকথার পর তিনি বললেন, এ-বাড়ির 'মর্টগেজ' নাকি তাঁর হাতে। তাঁর কাছ থেকে আপনি নাকি অনেক টাকা ধার করেছেন, আবার আরও টাকা ধার করতে চান। কিন্তু তিনি আর এক টাকাও ধার দেবেন না, উলটে আগেকার টাকার জন্যে আপনার নামে নালিশ করবেন। পিসিমা, এসব কথা কি সত্য?'

কঠিন কণ্ঠে দেবিকা বললেন, 'হ্যাঁ, এসব সত্য কথা।'

সন্ধ্যা বললে, 'সে কী পিসিমা? বিজনবাবুর কাছ থেকে আপনার টাকা ধার করবার দরকার কী? আমি তো বরাবরই জানি, আমার বাবা আমার জন্যে প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। তবুও আমার বাড়ি বাঁধা পড়ে কেন?'

ম্রিয়মাণ মুখে দেবিকা বললেন, 'বাছা, সে টাকায় আমাকে হাত দিতে হয়েছে।'

সন্ধ্যা বিপুল বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ভাবহীন মুখে দেবিকা বললেন, 'আজ ছয় বছর ধরে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে।'

—'কে এই কাজ করছে?'

—'সেটা জেনে তোমার কী হবে? তার চেয়ে আজ কী ঘটেছে তাই আমাকে বলো।'

এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সন্ধ্যা বিপদসূচক কণ্ঠে বললে, 'সে-ক্ষেত্রে আপাতত আমি তোমাকে যা বলতে চাই, তাই শোনো। আমার কোনও কথা তোমাকে বলবার আগে তোমার কথা আমি শুনতে চাই। আমার বাবার যে-টাকা তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল, তা নিয়ে তুমি কী করেছ? মাঝে মাঝে তুমি এখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যাও—কলকাতায় কি অন্য কোথায়, আমি তা জানি না।'

দেবিকা কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'থামো, থামো, আর কিছু বলতে হবে না।'

—'তাই নাকি?'

দেবিকা যদি তার কথা শুনে ভয় পেতেন কিংবা কেঁদে ফেলতেন, সন্ধ্যা নিশ্চয়ই তাহলে তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করত। কিন্তু দেবিকা সেরকম দুর্বলতা কোনওদিন প্রকাশ করেননি, আজও করলেন না। অপরাধী হয়েও তাঁর এই বেপরোয়া ভাব অসহনীয়। তখনই নিশ্চয় একটা ঝড় উঠত,

কিন্তু বাধা পড়ল অকস্মাৎ। ঘরের বাইরে শোনা গেল মোহনলালের কণ্ঠস্বর, তারপরেই ঘরের ভিতরে সশরীরে তার আবির্ভাব।

মোহনলাল বললে, 'বটে, বটে, বটে! তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের দুই যোদ্ধার মতো। হল কী, হল কী?'

সন্ধ্যা জোর করে মুখে হাসি এনে বললে, 'আধুনিক গোপাল ভাঁড়মশাই, কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি! কেবল আমাকে দেখে পিসিমার দুই চোখ ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠেছে।'

মোহনলাল বললে, 'হতেই পারে, হতেই পারে! তোমাকে দেখে আমারও দুই চোখ রসগোল্লার আকার ধারণ করতে চাইছে!'

সন্ধ্যা বললে, 'ছানাবড়া আর রসগোল্লার কথা এখন থাক। কিন্তু এই অসময়ে আপনি এখানে এমন হন্তদন্তের মতন এসে হাজির হয়েছেন কেন?'

মস্ত একটা হাঁ করে সন্ধ্যার মুখের দিকে দু-তিন মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মোহনলাল, তারপর বললে, 'তোমরা বুঝি কিছু শোনোনি? তা শুনবে কেমন করে? এখনও তো আসল কথা আমি তোমাদের বলিনি! তোমাদের ওই প্রতিবেশী রায়বাহাদুর বিজনকুমার গো! আমি খাওয়া-দাওয়ার পর একটু নৈশবায়ু ভক্ষণ করবার জন্যে বাইরে এসে পায়চারি করছিলুম, হঠাৎ রায়বাহাদুরের বাগানের ভিতরে উঠল মহা হই-চই। সশব্দে কারা ছুটোছুটি করছে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে! আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো 'হাউন্ডে'র বিকট গর্জন! ব্যাপারখানা যে কী, কিছুই বুঝতে পারলুম না! হয়তো তোমরাও এইসব বেয়াড়া আর বেসুরো চ্যাঁচামেচি শুনতে পেয়েছ, এই ভেবে আমি তোমাদের এখানে ছুটে এসেছি। কিন্তু সন্ধ্যা, তোমার অবস্থা দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, তুমিও যেন আজকে কোনও চিত্তোত্তেজক নাটকে অভিনয় করে এসেছ। তাই নয় কি, তাই নয় কি?'

মোহনলালের এই আকস্মিক আবির্ভাবে সন্ধ্যা নিজেকে খানিকটা সামলে নেবার সুযোগ পেলে! মোহনলাল এক নির্বোধ ব্যক্তি, ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই জানে না, কিন্তু সে যে তাদের বন্ধু, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। যে-কোনও একটা কথা বলে তার কৌতূহল চরিতার্থ করা খুবই সহজ। কিন্তু তার উপস্থিতিতে আজ সে আত্মসংবরণ করবার সুযোগ পেয়েছে, নইলে এখনই এখানে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারত।

সে বললে, 'বসুন মোহনলালবাবু। ভগবানের দোহাই, আমার দিকে এমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকবেন না। আজ এখানে কোনও অঘটনই ঘটেনি।'

মোহনলাল বললে, 'তাই নাকি, তাই নাকি? রায়বাহাদুরের ওখানে আজ যে-নাটকের অভিনয় হচ্ছে, তার কিছুই তুমি জানো না?'

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, 'কিছুই জানি না! আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম, হঠাৎ খেয়াল হল, একটা বালিয়াড়ির উপরে উঠতে হবে। কিন্তু খানিকটা ওঠবার পরই হঠাৎ পা ফসকে আমি পড়ে গেলুম, তারপর গড়াতে গড়াতে নীচে এসে পড়লুম। আমার বিশেষ কিছুই হয়নি, কেবল জামা কাপড় ছিঁড়ে আর হাত পা ছড়ে গিয়েছে।'

ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গিয়ে মোহনলাল পা ছড়িয়ে একটা সোফার উপরে হেলে পড়ল। তারপর বললে, 'বটে, বটে, বটে! তাহলে কোনও পাগলা আজ তোমার প্রেমে পড়েনি, তোমাকে হরণ করবার চেষ্টা করেনি?'

সন্ধ্যা বললে, 'নিশ্চয়ই নয়!'

মোহনলাল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তাই নাকি, তাই নাকি, তাই নাকি? বড়োই হতাশ হলুম, বড়োই হতাশ হলুম!'

দেবিকা এতক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে খানিক তফাতে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি সজাগ হয়ে বললেন, 'হয়েছে কী? এত গোলমাল কীসের?'

মোহনলাল তার চোখ থেকে 'মনক্‌ল'খানা খুলে রুমাল দিয়ে মার্জনা করতে করতে বললে, 'গোলমাল? গোলমাল নয় দেবিকাদেবী, হাটের হট্টগেল! রায়বাহাদুরের বাড়িতে। ঠিক বাড়িতে নয়, বাগানে। সেখানে বোধহয় আজকে একদল গুন্ডার 'গার্ডেন পার্টি'র আয়োজন হয়েছে। আপনি কি সে-খবর পাননি?'

তিক্তস্বরে দেবিকা বললেন, 'তোমাদের নির্বুদ্ধিতা আর আমি সহ্য করতে পারছি না! তোমাদের আজকের আচরণটা আমার কাছে বড়োই অদ্ভুত লাগছে। এতটা উত্তেজনার কারণ কী?'

—'কারণ কী, কারণ কী? শুনুন তাহলে—'

তপ্তকণ্ঠে দেবিকা বললেন, 'চুপ করো। তোমার কোনও কথাই আমি আর শুনতে চাই না। রাবিশ!'

—'বড়োই দুঃখিত হলুম, বড়োই দুঃখিত হলুম। আমি জানি, দেবিকাদেবী, আমার মগজে বুদ্ধিসুদ্ধি কিঞ্চিৎ অল্প, কাজেই রাবিশ ছাড়া আমি আর কিছুই বিতরণ করতে পারি না। আচ্ছা, আজ তাহলে বিদায় হই।' এই বলে ঘরের বাইরে চলে গেল মোহনলাল।

সন্ধ্যা মুখ ভার করে বললে, 'মোহনলালবাবুর সঙ্গে আজ তুমি বড়োই কর্কশ ব্যবহার করলে পিসিমা।'

দেবিকা বললেন, 'ভাঁড়ামি আমার ভালো লাগে না। তোমার বালিয়াড়ির উপর থেকে পড়ে যাওয়ার আজব গল্পটা কত সহজেই ও হজম করলে। ওর মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকত, তাহলে কাল তোমার কথা নিয়ে এখানে টিটিকার পড়ে যেত। এখন আসল ব্যাপারটা কী বলো তো!'

সন্ধ্যা নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। একঘণ্টা পূর্ণ হতে এখন তিরিশ মিনিট দেরি। তারপর সে মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, 'ব্যাপার এমন বিশেষ কিছুই নয়। বিজনবাবু আমাকে জানিয়েছেন, আমি তাঁকে বিবাহ না করলে টাকার জন্যে তিনি তোমার নামে নালিশ করবেন!'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে দেবিকা বললেন, 'এই কথা সে বলেছে? শুয়োরের বাচ্চা!'

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'পিসিমা!'

—'থামো, থামো! শুয়োরের বাচ্চাকে অন্য কোনও নামে ডাকা যায়? তুমিও তাকে ওই কথাই বললে না কেন? তুমি কী বলেছ শুনি?'

—'বিজনবাবুর কথা শুনে আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল! আমি তাঁকে কী বলব ভেবে ঠিক করতে পারিনি।'

—'তারপর?'

তারপর যা হয়েছিল তা বলতে গেলে অরিন্দমের কথা প্রকাশ করতে হয়। সন্ধ্যা বললে, 'পিসিমা, ওসব কথা এখন যেতে দাও। বিজনবাবুর কাছ থেকে তুমি টাকা ধার করেছ কেন, সেই কথাই আমি শুনতে চাই।'

বিরক্ত কণ্ঠে দেবিকা বললেন, 'সে কথা শুনে তোমার কী হবে?'

সন্ধ্যা দাঁত দিয়ে ওষ্ঠ দংশন করে বললে, 'কী রকম? তুমি আমার টাকা নষ্ট করেছ। তারপর আমার বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করেছ। এর পরেও সমস্ত কথা শোনবার অধিকার কি আমার নেই?'

—'সেসব কথা শুনে তোমার কোনও লাভ হবে না।'

—'এখন বিজনবাবু, যদি বাড়িখানা কেড়ে নেন, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে সেটা বুঝতে পারছ কি?'

পুরুষের মতো বক্ষে দুই হস্ত আবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে দেবিকা বললেন, 'অবস্থা বুঝে একটা কোনও ব্যবস্থা আমি করতে পারবই। তা নিয়ে তোমাকে বেশি মাথা ঘামাতে হবে না।'

রাগে ফুলতে ফুলতে সন্ধ্যা উঠে পড়ল এবং কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে ঘরের আর একদিকে গিয়ে দাঁড়াল।

দেবিকার সান্নিধ্য এখন তার কাছে আর প্রীতিকর নয়। মনে মনে সে অরিন্দমের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। নীরবতার ভিতর দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কাটল। তারপর সে আবার হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করলে। একঘণ্টা পূর্ণ হতে এখনও পনেরো মিনিট বাকি।

এতক্ষণ পরে দেবিকা আবার কথা কইলেন। বললেন, 'আজ তোমার কী হয়েছে সন্ধ্যা? খালি খালি ঘড়ি দেখছ কেন?'

—'সময় দেখবার জন্যে!' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে সন্ধ্যা।

—'সময় দেখবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ তো আর কখনও দেখিনি?'

—'এত ঘ্যানঘ্যানানি আমার আর ভালো লাগছে না পিসিমা, আমি নিজের ঘরে চললুম।' সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকে সে অধীর ভাবে এদিকে-ওদিকে পায়চারি করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে লাগল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। খানিক তফাতে দেখা যাচ্ছে যেন কালি দিয়ে আঁকা বিজনবাবুর বাড়িখানা। কিন্তু সেদিক থেকে এখন আর কোনওই সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আর-একটা জানলা দিয়ে দেখা যায়, ডাঃ সেনের বাংলোর কালো ছায়া। অন্ধকার ভেদ করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা আলোকোজ্জ্বল জানলা। তাহলে ডাঃ সেন এখনও জেগে আছেন। সন্ধ্যা স্থির করলে, বাকি সময়টা সে তাঁর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেবে। ঠিক এক ঘণ্টা পরে অরিন্দমবাবু যদি এখানে এসে তাকে খুঁজে না পান, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আগে ডাঃ সেনের বাসাতে গিয়ে হাজির হবেন।

কিন্তু সে একটু ইতস্তত করতে লাগল। ডাঃ সেন অপরিচিত ব্যক্তি নন বটে, কিন্তু তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়! এত রাত্রে হঠাৎ তাকে দেখে তিনি কী মনে করবেন?

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে সন্ধ্যা বুঝতে পারলে, তার পিসিমা উপরে উঠে আসছেন। পাছে আবার তাঁর পাল্লায় পড়তে হয়, সেই ভয়ে তার সমস্ত ইতস্তত ভাব ঘুচে গেল! বাড়ির পিছন দিকে আর একটা সিঁড়ি ছিল, সে পা টিপে টিপে এগিয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নীচে নেমে বাগানের খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রের ঠান্ডা হাওয়া তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে খানিকটা স্নিগ্ধ করে তুললে। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাওয়া গেল ডাঃ সেনের বাংলো। কড়া নাড়তেই ডাঃ সেন নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন।

ঘরের ভিতর থেকে আলোকরেখা এসে পড়ল সন্ধ্যার মুখের উপরে। ডাঃ সেন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'একী, সন্ধ্যাদেবী!'

সন্ধ্যা হেসে বললে, 'আমাকে দেখে আপনি বিরক্ত হলেন না তো? আমার মনটা আজ কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, তাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম। আমার উপস্থিতি আপনি সহ্য করতে পারবেন তো?'

ডাঃ সেন বললেন, 'আপনি এসেছেন, এটা তো আমার সৌভাগ্য! কিন্তু—কিন্তু, বাড়িতে আমি একেবারেই একলা।'

সকৌতুকে হেসে উঠে সন্ধ্যা বললে, 'ডাক্তাররা সকল সন্দেহের অতীত, নয় কি মিঃ সেন? আমি অঙ্গীকার করছি, আপনার সঙ্গে কোনও বাচালতাই করব না!'

ডাঃ সেন দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখন যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তাকে নিয়ে একটা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ডাঃ সেন একখানা চেয়ার টেনে এনে তার সামনে স্থাপন করলেন।

এ-কথা সে-কথার পর সন্ধ্যা হঠাৎ বললে, 'মিঃ সেন, শুনেছি আপনি একজন জীবতত্ত্ববিদ। মানুষদেরও নিয়ে আপনি তো গবেষণা করেন?'

—'মানুষও জীব। মানুষের কথা নিয়েও আমাকে মাথা ঘামাতে হয় বই কি!'

—'তাহলে বলুন দেখি, কমলপুরের এই নতুন আগন্তুক অরিন্দমবাবুর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী রকম?'

ডাঃ সেনের মুখে-চোখে একটা বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। তারপর তিনি সহজ স্বরেই বললেন, 'অরিন্দমবাবু? জীবরাজ্যের একটি চিত্তাকর্ষক নমুনা। এখনও তাঁর সম্বন্ধে আমার মতামত নিশ্চিত ভাবে বলতে পারব না, কারণ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে মাত্র একবার। তবে তিনি যে একজন অসাধারণ যুবক, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।' বলতে বলতে হঠাৎ সে-প্রসঙ্গ থামিয়ে ডাঃ সেন বললেন, 'সন্ধ্যাদেবী, যদি ইচ্ছা করেন তো, আপনার জন্যে এখনই স্বহস্তে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিতে পারি।'

—'ধন্যবাদ! কিন্তু এত রাত্রে আর চায়ের দরকার নেই।... হ্যাঁ, মিঃ সেন—বলতে পারেন, এখানে অরিন্দমবাবুর কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে কি?'

ডাঃ সেন স্থির, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সন্ধ্যার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে শুধোলেন, 'সন্ধ্যাদেবী, হঠাৎ ও-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন বলুন দেখি!'

—'অরিন্দমবাবু নিজেই বারংবার ওই বিপদের কথা বলেন। এখানে নাকি তাঁর কোনও শত্রু আছে। আপনাকেও তিনি সে-কথা বলেননি কি?'

এইবারে ডাঃ সেন জাগ্রত হয়ে উঠলেন। তিনি কথা কইতে লাগলেন যেন অত্যন্ত সাবধানে! বললেন, 'হ্যাঁ, অরিন্দমবাবু মাঝে মাঝে কী সব বিপদের কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিপদের কথা নিয়ে এখনও আমি মাথা ঘামাবার চেষ্টা করিনি, তবে একটা কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে। অরিন্দমবাবুর বিপদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী? তিনি কি আপনার বিশেষ বন্ধু?'

এইবারে সন্ধ্যাও কথা কইতে লাগল সাবধানে! বললে, 'অরিন্দমবাবুর সঙ্গে আমার নতুন পরিচয়। কিন্তু তাঁকে আমার ভালো লাগে।'

ডাঃ সেনের মুখের উপরে ফুটে উঠল একটা মৌন হাসির আভাস। তিনি দুইপদ এগিয়ে এসে সন্ধ্যার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সন্ধ্যাদেবী, রাগ করবেন না। আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, অরিন্দমবাবুকে আপনি কি ভালোবাসেন?'

সলজ্জভাবে মাথা নামিয়ে ফেললে সন্ধ্যা।

ডাঃ সেন বললেন, 'হয়তো আপনি তাঁকে সত্যিই ভালোবাসেন। হয়তো অরিন্দমবাবুও আপনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। আপনি যদি তাঁর সত্যিকার বন্ধুই হন, তাহলে তাঁকে মানা করে দেবেন, তিনি যেন আর আগুন নিয়ে খেলা না করেন।'

সন্ধ্যা বললে, 'তাহলে তাঁর বিপদের সম্ভাবনা আছে!'

—'বিপদকে তিনি নিজেই ডেকে আনতে চান। আগুন নিয়ে খেলাই হচ্ছে বিপজ্জনক। আমি এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

সন্ধ্যা আবার তার হাতঘড়ির দিকে তাকালে। এক ঘণ্টা পূর্ণ হতে এখনও ছয় মিনিট দেরি।

ষষ্ঠ

কুকুর এবং মুগুর

আগে অরিন্দম এবং তার পিছনে পিছনে রিভলভারধারী মদনলাল। এইভাবে তারা আবার প্রবেশ করলে রায়বাহাদুর বিজনকুমারের বসবার ঘরে।

বিজন চেয়ারের উপরে বসে ছিল, তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

অরিন্দম একগাল হেসে বললে, 'একরাত্রেই দুই-দুইবার রায়বাহাদুরের দর্শনলাভ? এ সৌভাগ্য অভাবিত! মাথাটা কেমন আছে মশাই? চিকিৎসার অতীত নয় তো?'

বিজন বললে, 'চিকিৎসার কথা পরে ভাবা যাবে। প্রবাদে আছে জানো তো?—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত! এইবার তোমার পালা।'

অরিন্দম বললে, 'চমৎকার!' তারপর পিছনদিকে ফিরে দেখলে, মদনলাল তখনও রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। বললে, 'প্রিয় মদনলালবাবু, আমি অবশ্য আগেই জানতুম, রহস্য গভীরতর হয়ে উঠলেই আপনার দেখা পেতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রহস্যটা কি এর মধ্যেই চরমে উঠেছে? না, আরও—'

বিজন বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি মুখ বন্ধ করো অরিন্দম। তোমার মুখরতা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

অরিন্দম বললে, 'মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কী মশাই? ধরতে গেলে আমি তো এখন শুরুই করিনি। এইবারে আমি একটি গল্প বলতে চাই। গল্পটা রায়বাহাদুরের কানে নতুন শোনাবে না বোধ হয়। আর মদনলালবাবুও আগেই তা শুনে ফেলেছেন। এক যে ছিল লোক, নাম তার সুখনলাল। সে ছিল এমন একজন লোকের দলভুক্ত, যাঁকে আমি বলি মহাত্মা কিন্তু লোকে বলে দুরাত্মা। সেই সুখনলাল বিশ্বাসঘাতক হয়ে পুলিশের কাছে দলপতিকে ধরিয়ে দিতে চায়। থানায় যাবার জন্যে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু থানায় না গিয়ে তাকে যেতে হল স্বর্গে বা নরকে। তার পরদিনেই রাজপথের উপর পাওয়া গেল তার মৃতদেহ, আর তার বক্ষে বিদ্ধ ছিল একখানা ছোরা। পুলিশ সেই দলপতির

নাম জানতে পারেনি বটে, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি। গল্পটা কেমন লাগল মদনলালবাবু? যদি 'এঙ্কোর' দেন, তাহলে গল্পটা আমি আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে পারি।'

বিজনের মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে তখন সেই পালোয়ান এবং আরও দু-জন গুন্ডার মতন দেখতে লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের কথা শুনছিল।

মদনলাল বললে, 'রায়বাহাদুর, লোকটা হাঁড়ির খবর জানে। খুব সাবধান, আবার যেন ও হাত ফসকে চম্পট দিতে না পারে।'

—'আমাকে হাঁড়ির খবর পরিবেশন করেছে কে, জানেন মদনলালবাবু? সুখনলালের অন্তিমকালে আমি দৈবগতিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ি। মরবার আগে সে আরও কী কী কথা আমাকে বলেছিল, এখানে তা জাহির করে লাভ নেই। কিন্তু তার শেষ কথা কী জানেন?— 'বাঘরাজ আছে কাঁথি জেলার কমলপুরে। সমুদ্রের কাছে সেই পুরোনো বাড়িতে—' এই পর্যন্ত বলেই সে মারা যায়। এখানে তো চার-পাঁচখানা পুরোনো বাড়ি আছে দেখছি। সুখন কোন বাড়িখানার কথা বলেছিল মদনলালবাবু?'

মদনলাল রিভলভার ভালো করে তুলে ধরে দাঁতে দাঁতে ঘষে বললে, 'এইবারে তোমার সব লীলাখেলা সাঙ্গ হোক।'

—'না!'

বিজন চিৎকার করে উঠে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ে মদনলালের রিভলভারসুদ্ধ হাত চেপে ধরে বললে, 'নির্বোধ! সন্ধ্যা এখানে এসেছিল, অরিন্দম তাকে এখান থেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছে। একে যদি এখানে মেরে ফেলা হয়, তাহলে সে কি চুপ করে থাকবে? তুমি আমাদের সকলকার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে চাও নাকি?'

প্রশংসাভরা কণ্ঠে অরিন্দম বললে, 'প্রিয় রায়বাহাদুর, আপনার যুক্তি অত্যন্ত অকাট্য।' প্রশান্তমুখে সে পিছনের টেবিলের উপরে বসে পড়ে নিশ্চিন্তভাবে নিজের পা দুটো দোলাতে লাগল।

বিজন বললে, 'এ আপদটাকে এমন উপায়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে, যাতে লোকে মনে করে দৈব-দুর্ঘটনা। মেয়েটার জন্যেই যত মুশকিল।'

মদনলাল বললে, 'মেয়েটারও মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ লাগবে?'

বিজন প্রায় গর্জন করে বললে, 'খবরদার, সন্ধ্যাকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না। বড়োকর্তা এখন কোথায়?'

—'খানিক পরেই তাঁর আসবার কথা।'

অরিন্দম বললে, 'এ একটা সুসংবাদ! তাহলে এখানেই বাঘরাজের সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগ্য আমার হবে? আপনারা জানেন না, মহামহিম বাঘরাজের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি কতখানি লালায়িত হয়ে আছি। কিন্তু তিনি পারদের মতো হাতের মুঠোর ভিতরে এসেও ধরা দেন না। তিনি থাকেন চোখের সামনে, কিন্তু তাঁকে চেনা যায় না।'

বিজন বললে, 'একেবারেই অত বেশি আশা কোরো না অরিন্দম। তবে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে হয়তো তুমি বাঘরাজের দেখা পেলেও পেতে পারো।'

অরিন্দম বললে, 'আপনার আশাকেও বেশি উচ্চগামী করবেন না রায়বাহাদুর! এ জীবনে বিপদকে নিয়ে আমি অনেক খেলা করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে মারতে পারেনি। বাঘরাজকে দেখেও আমি বোধহয় এ বাড়ি থেকে সসম্মানে বিদায় নিতে পারব।'

বিজন ফিরে তার লোকজনদের হুকুম দিলে, 'এর জামাকাপড়ের ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র কী পাওয়া যায় খুঁজে দেখ।'

অস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেল কেবল সেই ছোরাখানা এবং পকেটের ভিতরে পাওয়া গেল কেবল একটা দেশলাই ও একটা বড়ো সিগারেট কেস।

বিজন বললে, 'সিগারেট কেসটা অরিন্দমকে ফিরিয়ে দাও। অন্তিমকালে ধূমপানের আনন্দ থেকে ওকে বঞ্চিত করতে চাই না।'

অরিন্দম বললে, 'রায়বাহাদুরের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক!' এই সিগারেট কেসের ভিতরদিকে রীতিমতো একটু নূতনত্ব আছে। তার একটা দিক ক্ষুরের মতো ধারালো। কিন্তু সিগারেটের নীচে চাপা থাকে বলে সে অংশটা বাইরের কারুর চোখে পড়ে না।

বিজন ও মদনলাল খানিক তফাতে সরে গিয়ে ফিসফিস করে কী পরামর্শ করতে লাগল। তারা দুজনেই সশস্ত্র। পালোয়ান-অনুচরটা দাঁড়িয়ে আছে ঘর থেকে বেরুবার দরজার সামনে। সহজে তাকে আর দ্বিতীয়বার ফাঁকি দেওয়া চলবে না। আরও দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে বাগানের দিকে বেরুবার জানলাগুলোর নিকটে। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে অরিন্দম বুঝলে আপাতত ঘর থেকে অদৃশ্য হবার সব পথই বন্ধ। কাজে-কাজেই সে নিশ্চেষ্টভাবে টেবিলের উপরে বসে নিজের মনে ধূমপান করতে লাগল।

এবং মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতে লাগল নিজের হাতঘড়ির দিকে, সেটাও তার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নেয়নি। সন্ধ্যা চলে যাবার পর আধঘণ্টা কেটে গিয়েছে। তাকে ডাঃ সেনের কাছে খবর দিতে বলে অরিন্দম খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। ডাঃ সেন হচ্ছেন একজন বিখ্যাত ডিটেকটিভ, বাঘরাজকে আবিষ্কার করবার জন্যে ছদ্মবেশে এখানে অবস্থান করছেন। তাঁর কাছে ঋণী হবার ইচ্ছা তার মোটেই নেই, তবে বিশেষ দায়ে পড়লে তাঁর সাহায্য ছাড়া উপায় কী? আর আধঘণ্টা! আর আধঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলে সন্ধ্যা যাবে ডাঃ সেনের কাছে এবং ডাঃ সেন আসবেন বিজনের কাছে। আরও একজন এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে হচ্ছে রামফল, হাতে আছে যার প্রকাণ্ড পিস্তল!

হঠাৎ অরিন্দমের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। বাড়ির ভিতর দিকে কোথা থেকে আসছে যেন অতি মৃদু ঘণ্টাধ্বনি। তার একটু পরেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল একজন লোক। সে বিজনের কাছে গিয়ে তার কানে কানে কী বললে এবং বিজনও শশব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

মদনলাল পায়ে পায়ে অরিন্দমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অরিন্দম হাসতে হাসতে বললে, 'বুঝতে পারছি মদনলালবাবু, এক এবং অদ্বিতীয় বাঘরাজ এইবারে এই বাড়ির ভিতরে পদার্পণ করেছেন।'

অরিন্দমের আপাদমস্তকের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মদনলাল বললে, 'তুমি যে আমাদের কী জ্বালাতন করেছ, তুমি তা নিজেই বোধহয় জানো না। তোমার ভাগ্য খুব ভালো বটে, কিন্তু মনে রেখো, সৌভাগ্য চিরদিন স্থায়ী হয় না!'

—'ঠিক বলেছেন মদনলালবাবু। সৌভাগ্য অস্থায়ী। আপনার সৌভাগ্যক্রমে ব্যাংক এখনও আপনাদের নাগাল পায়নি। কিন্তু এ সৌভাগ্য আরও কতদিন স্থায়ী হবে বলে মনে করেন? শেষ পর্যন্ত ব্যাংকই কি জিততে পারবে না?'

মদনলাল স্থিরভাবেই দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু অরিন্দমের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার চক্ষে দেখলে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ চমক! অর্ধ-স্বগত স্বরে মদনলাল বললে, 'ব্যাংকের কথাও সুখনই বলেছে নিশ্চয়?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমি সব কথাই জানি! জানি না কেবল দুটি প্রশ্নের উত্তর। কে বাঘরাজ? তার লুটপাট, রাহাজানির টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে? তবে এ-দুটো প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাকে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না বোধহয়।'

মদনলাল বললে, 'ওঃ, নিজের উপরে তোমার দেখছি অটল বিশ্বাস!'

স্বপ্নালসচক্ষে যেন নিজের মনেই অরিন্দম বললে, 'কোনও কালে, কোনও জায়গায় কোনও একখানা স্টিমার বহু লক্ষ টাকার সোনার বার নিয়ে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে গোপনে ঘাটের কাছে এসে আর-একখানা স্টিমারের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ডুবে যায় কোনও ঝড়ের রাতে নির্জন সমুদ্রতীরে। দুর্ঘটনার কথা জানাজানি হবার আগেই রাতারাতি কয়েক ব্যক্তি একদল ডুবুরির সাহায্যে সেই সোনার বারগুলো উদ্ধার করে। কে তারা? বাঘরাজ, রায়বাহাদুর, না মদনলালবাবু? সেই সোনার থানগুলো গোপন করে রাখা হয়েছে কোথায়?'

মদনলাল বললে, 'এত সব দুশ্চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখনও তুমি যে বুড়িয়ে যাওনি, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য।' এই বলে সে বিরক্তমুখে খানিক তফাতে গিয়ে একখানা সোফার উপরে বসে পড়ল।

তারপরেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে বিজনকুমার। সে মদনলালের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে অত্যন্ত নিম্নস্বরে কী বলতে লাগল, তার কিছুই শোনা গেল না! কেবল তার শেষ কথাটা অরিন্দমের কানে এল—'বাঘরাজের হুকুম, ওকে মুক্তি দিতে হবে।' সঙ্গে-সঙ্গেই মদনলাল চিৎকার করে উঠল ক্রুদ্ধস্বরে।

অরিন্দম সবিস্ময়ে ভাবলে, এ আবার কী কথা? এত খবর সে রাখে, এত উপদ্রব সে করেছে, আর এত কাঠখড় পুড়িয়ে ওরা তাকে শেষকালে ছেড়ে দিতে চায়? কিন্তু কেন, কেন, কেন? এখানে লুকিয়ে আছে কী আশ্চর্য রহস্য? কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে অরিন্দমের মাথা যেন ঘুরতে লাগল।

বিজন অরিন্দমের সামনে এসে বললে, 'অরিন্দম, রাত ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আর উৎসব করা চলে না। এখন তুমি বাসায় ফিরে যেতে পারো।'

—'তার মানে?'

—'তার মানে হচ্ছে, তুমি এখন স্বাধীন, যেখানে খুশি যেতে পারো।'

বিজন খুব শান্ত ও সহজ স্বরেই কথা কইছিল বটে, কিন্তু অরিন্দম লক্ষ করলে, তার চক্ষে জ্বলছে নিষ্ঠুর হিংসার আগুন! বেশ বোঝা যায়, বাধ্য হয়ে সে আর কারও হুকুম তামিল করছে বটে, কিন্তু তার মনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ অন্যরকম। আর কিছু বোঝবার চেষ্টা না করে অরিন্দম বললে, 'বেশ, আপনারা যখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে চান, তখন আমার 'শ্রীমতী'কেও ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

বিজন হতভম্বের মতন বললে, ''শ্রীমতী' আবার কে?'

অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে একটা টেবিলের উপর থেকে তার প্রিয় ছোরাখানা তুলে নিয়ে বললে, 'এরই নাম রেখেছি আমি 'শ্রীমতী'।' বলতে বলতে ছোরাখানা আবার হাতে বাঁধা খাপের ভিতর পুরে ফেললে। তারপর আবার বললে, 'রায়বাহাদুর, আপনার আতিথেয়তাকে ধন্যবাদ! আজ খানিকটা সময় এখানে এসে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া গেল।'

বিজন চেষ্টা করে সহজ স্বরে বললে, 'অরিন্দম, আর এখানে দাঁড়িয়ে বকবক কোরো না। তোমার সৌভাগ্য এবারও তোমাকে ত্যাগ করলে না, কিন্তু এর পরে হয়তো ভাগ্যবিপর্যয় হতে পারে। অতএব তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ো, নইলে, হয়তো আমরা মত পরিবর্তন করব।'

অরিন্দম বললে, 'মত? কোনও মত নেই আপনাদের! তবলচি যে তালে তবলা বাজায় আপনারা নাচেন সেই তালেই। আপনারা নাচছেন বাঘরাজের কথায়, তা কি আমি বুঝতে পারিনি? অথবা এও হতে পারে আপনারা আমার রামফলের কথা ভেবে সাবধান হয়েছেন। সে হচ্ছে ভয়াবহ মানুষ। জাগ্রত হলে শয়তানও তাকে দেখে ভয় পাবে।'

মদনলাল বললে, 'কিন্তু আমরা শয়তান নই।'

—'হ্যাঁ, আপনারা অভিনয় করছেন ভগবানের ভূমিকায়! যাক, সে কথা। কিন্তু আমি যদি এখন থানায় গিয়ে খবর দিই?'

বিজন একটা চুরুট ধরিয়ে বললে, 'অরিন্দম, তুমি—'

অরিন্দম মেঝের উপরে সশব্দে পদাঘাত করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'অরিন্দম কী, বলুন অরিন্দমবাবু! আমি তো আপনাদের অসম্মান দেখাচ্ছি না! ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো কথা বলুন!'

—'বেশ অরিন্দমবাবু, আপনি যে পুলিশে খবর দেবেন না, আমি তা জানি। আমরা সবাই হচ্ছি খেলোয়াড়। খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি যে আপনার ভিতর আছে, এটা জেনেই আপনাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে! তার উপরে বহু লক্ষ টাকার লোভ! এর মধ্যে পুলিশ এলে আপনারও বিপদ, আমাদেরও বিপদ।'

অরিন্দম বললে, 'হুঁ! দেখছি আপনার ভিতরে পাকা খেলোয়াড়ের লক্ষণ আছে।'

—'আশা করি খেলাটা হবে আপনার মনের মতো।'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আলবত! আপাতত আপনি নির্ভাবনায় ঘুমোতে যেতে পারেন। আর বাঘরাজকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তাঁর দেখা না পেয়ে আমি বড়োই দুঃখিত হলুম।' অরিন্দম কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার বললে, 'হ্যাঁ, ভালো কথা! আমি সুখনলালের কথা ভাবছি। তার মৃত্যুর জন্যে একজন কারুকে ফাঁসি যেতে তো হবেই। যত দোষ বাঘরাজের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করবেন, নইলে তাঁর বদলে আপনাকেই হয়তো ফাঁসিকাঠে দোল খেতে হবে।'

বিজন বললে, 'আপনার ভয় নেই, আমরা খুব সাবধানেই থাকব।'

অরিন্দম বললে, 'চমৎকার, চমৎকার! আচ্ছা, বিদায় হলুম বন্ধু। ভালো করে ঘুমোবেন, আর ভালো ভালো স্বপ্ন দেখবেন। আমি কিন্তু ওই জানলা দিয়েই বাইরে যাব।'

বাড়ির ভিতর দিকে আনাচে-কানাচে কোনও উৎপাত লুকিয়ে থাকতে পারে, হঠাৎ আলো নিবে যেতে পারে, তারপর আরও যে কী হতে পারে, বলা তো যায় না।

বিজন বললে, 'দাঁড়ান, অরিন্দমবাবু। যাবার আগে একটা কথা শুনে যান।'

—'আজ্ঞা হোক।'

—'বাগানের ভিতরে গিয়ে ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে আর অপেক্ষা করবেন না। ঠান্ডা লাগবার ভয় আছে। নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা আছে। অপেক্ষা করা বৃথা। বাঘরাজ সত্যি- সত্যিই এখান থেকে চলে গিয়েছে।'

—'ধন্যবাদ। তাহলে নিশ্চয়ই আমি আর অপেক্ষা করব না। আর এখানকারও কেউ যেন

অকারণে পায়ে ব্যথা করে আমার বাড়ির কাছে বেড়াতে না যায়। কারণ আমি আর রামফল, রামফল আর আমি সারারাতেই পালা করে পাহারা দিই। সুতরাং সেখানে অতর্কিত আক্রমণের চেষ্টা বৃথা। নমস্কার।' জানলার ভিতর দিয়ে একটা লাফ মেরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। যে উপায়ে বাগানের ভিতরে ঢুকেছিল, অরিন্দম সেই উপায়েই আবার বাগানের বাইরে গিয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, প্রাচীরের উপর থেকে সে নিজের কোটটাও সংগ্রহ করতে ভুলল না। তারপর সে একবার এগিয়ে যায়, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে এবং অন্ধকারের মধ্যে সামনে ও পিছনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করে দেখবার চেষ্টা করে, এদিকে-ওদিকে কোনও শত্রুর অস্তিত্ব আছে কি না। এমন কোনও ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়, যার ফলে কাল সকালে এখানে পড়ে থাকতে পারে তার আড়ষ্ট মৃতদেহটা এবং যে দেহ দর্শন করে করোনার মত প্রকাশ করবেন যে, অরিন্দমের মৃত্যু হয়েছে কোনও দৈব-দুর্ঘটনায়।

কিন্তু কোনও বিপজ্জনক ঘটনা ঘটবার লক্ষণ দেখা গেল না। শান্তিপূর্ণ স্তব্ধ রাত্রি, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ বা চিহ্নমাত্র নেই।

অবশেষে সে বিজনের বাড়ি থেকে নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে পড়ল।

অরিন্দম নিজের মনেই সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আজব কাণ্ড, অভাবিত ব্যাপার! ওরা হাতে পেয়েও আমাকে ছেড়ে দিলে কেন? বিজনের বাড়ির ভিতরে আমাকে হত্যা করলে ওদের কুড়ুল মারতে হত নিজেদের পায়েই। কিন্তু বাড়ির বাইরেও অন্ধকার রাত্রে আমাকে একলা পেয়েও আমার প্রতি শত্রুদের এই আশ্চর্য উদাসীনতার কারণ কী? এর মধ্যে কি নতুন কোনও শয়তানি থাকতে পারে?'

আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই অরিন্দম দেখতে পেলে, ডাঃ সেনের বাংলোয় একটা ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। সে বাংলোর দরজার কাছে গিয়ে সজোরে কড়া নাড়তে লাগল।

সপ্তম

নূতন শয়তানি

ডাঃ সেন দরজা খুলে দিতেই অরিন্দম ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল বিনাবাক্যব্যয়ে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাঃ সেনের চক্ষে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা বিস্ময়ের চমক। তিনি বললেন, 'অরিন্দমবাবু, আপনাকে এখানে দেখবার প্রত্যাশা আমি করিনি। আজ যা প্রত্যাশা করা যায় না, বারবার ঘটছে সেই রকম ঘটনাই। ইতিমধ্যেই এখানে এসেছেন আর-একজন অপ্রত্যাশিত অতিথি।'

অরিন্দম বললে, 'বড়োই তেষ্টা পেয়েছে মিঃ সেন! আপনার এখানে লেমনেড কি আইসক্রিম সোডা পাওয়া যেতে পারে?'

—'নিশ্চয়। আরও বেশি কিছু পাওয়া যেতে পারে। বিয়ার, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি চাইলেও আমি জোগান দিতে পারি। কার কখন কী দরকার হয় বলা তো যায় না।'

ডাঃ সেনের কথা শুনতে শুনতে অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে তাঁর বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপর বলে উঠল, 'একী, সন্ধ্যাদেবী? আপনিও এখানে? আপনার কোনও অসুখ করেছে নাকি, তাই ডাঃ সেনের কাছে 'প্রেসক্রিপশান' লিখে নিয়ে যেতে এসেছেন?'

সন্ধ্যা কিছু বলবার আগেই ডাঃ সেন বললেন, 'সন্ধ্যাদেবীর অসুখ-বিসুখ কিছুই করেনি। উনি আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করবার জন্যে এসেছেন।'

—'না, না! সন্ধ্যাদেবী, আপনি কি—'

ডাঃ সেন উচ্চকণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। উনি খানিকটা গল্প-স্বল্প করতে এসেছেন।'

—'উত্তম, উত্তম! সন্ধ্যাদেবী, এর পরেও আমার আর-কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে না, কী বলেন?'

সন্ধ্যা তার মুখের দিকে তাকিয়েই বেশ বুঝতে পারলে, অরিন্দম জানতে চাইছে যে, হাঁড়ির খবর কতখানি সে প্রকাশ করে ফেলেছে? অল্প একটু মাথা নেড়ে সে বললে, 'আপনার আসতে যদি আর দু-এক মিনিট দেরি হত—'

বাধা দিয়ে অরিন্দম বলে উঠল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি! থাক, আর কিছু বলতে হবে না।'

ডাঃ সেন অরিন্দমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি কোনও যুদ্ধের পরে ভগ্নদূতের ভূমিকায় অভিনয় করতে এসেছেন। খালি আপনি নন, সন্ধ্যাদেবীকে দেখেও আমার সেই কথাই মনে হচ্ছে।'

অরিন্দম দুই ভুরু তুলে বললে, 'সন্ধ্যাদেবীর মুখে কি আপনি কিছুই শোনেননি?'

ডাঃ সেন বললেন, 'না, ওঁকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা আমার হয়নি। উনি যখন এখানে এলেন, আমি ভেবেছিলুম, আমাকে কোনও রোগের নিদান দেখতে হবে। কিন্তু সন্ধ্যাদেবী বললেন, উনি এসেছেন আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে। আমাকে সেই কথাই বিশ্বাস করতে হল। যদিও সন্ধ্যাদেবীর মুখ দেখে আমার সন্দেহ হল যে, সাধারণ গল্পের চেয়েও উনি যেন আমাকে আরও বেশি কিছু বলতে চান। তারপরেই আপনার এই অভাবিত আবির্ভাব।'

অরিন্দম আশ্বস্ত হয়ে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তারপর সন্ধ্যাদেবী, আপনি এখানে গল্প করতে এসেছেন? আপনার শ্রোতার সংখ্যা আর-একজন বাড়ল। নিন, এখন যত খুশি গল্প করুন।'

সন্ধ্যা তখন একটু ধাঁধায় পড়ে গেল। সে ভেবেছিল, ডাঃ সেন আর অরিন্দমবাবু হচ্ছেন দুজনেই দুজনের বন্ধু। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, এঁরা দুজনেই যেন দুজনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চান। ডাঃ সেনের দিকে সে তাকিয়ে দেখলে। তাঁর মুখের ভাব বিশেষ প্রসন্ন নয়।

অরিন্দম ডাঃ সেনকে যেন অধিকতর উত্ত্যক্ত করবার জন্যেই বললে, 'মিঃ সেন, আপনার কি কৌতূহল হচ্ছে? আমি কি সব কথা বলব?'

—'বলুন।'

দুষ্টামি-ভরা চোখে ডাঃ সেনের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বললে, 'ব্যাপারটা কী জানেন? ব্যাপারটা হচ্ছে এই—'

কৌতূহলী ডাঃ সেন আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের মাথা চুলকোতে চুলকোতে অরিন্দম বললে, 'ব্যাপার হচ্ছে—ধেৎ। প্রিয় মিঃ সেন, বিশ্বাস করবেন কি? সমস্ত ব্যাপারটাই আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছি! মজার কথা, নয়?'

ডাঃ সেনের মুখ দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে অরিন্দমের এই কৌতুকাভিনয়ের মধ্যে তিনি মজা খুঁজে পাননি কিছুমাত্র।

সন্ধ্যা এইবার মুখ খুললে। বললে, 'ব্যাপারটা কী জানেন মিঃ সেন? অরিন্দমবাবুর সঙ্গে আজ প্রায় সারা সন্ধ্যাটাই কাটিয়ে দিয়েছি। সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়ির উপরে গিয়ে উঠে—'

অরিন্দম বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'করেন কী, করেন কী সন্ধ্যাদেবী? শেষটা কি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে ফেলবেন?'

ডাঃ সেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'ধেৎ, আমি আর কোনও কথাই শুনতে চাই না।'

অরিন্দম বললে, 'মিঃ সেন, আমি বোধহয় আপনাকে বড়ো বেশি জ্বালাতন করছি? কিন্তু এজন্যে আপনিই তো দায়ী। আপনি যেভাবে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন, তাতে মনে হয় আপনি যেন ভাবছেন যে, হয় আমি কারুকে খুন, নয় ডাকঘরের টাকা লুট করে আসছি। কিন্তু সেসব কিছুই নয়। সন্ধ্যাদেবী আর আমি বালিয়াড়ির উপরে গিয়ে উঠেছিলুম, তারপর—'

সন্ধ্যা বললে, 'তারপর? আমি হঠাৎ পা ফসকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাই। আমার বেশি কিছু লাগেনি। কিন্তু একটা বেয়াড়া গর্তের ভিতর থেকে আমাকে উপরে টেনে তোলবার সময়ে অরিন্দমবাবুকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।'

দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে ডাঃ সেন কেবল বললেন, 'হুঁ।' তিনি শিশু নন, এত সহজে এই আজব কাহিনিটা তিনি যে হজম করতে পারবেন না, এটা তাঁর মুখ দেখেই বেশ বোঝা গেল।

আচম্বিতে সদর দরজার উপরে দুমদুম করে করাঘাত হতে লাগল।

অরিন্দম বললে, 'মিঃ সেন, আপনি দেখছি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এত রাত্রে আবার কোন অতিথি এসেছে? কারুর কি অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে? কেউ কি সন্তান প্রসব করবে?'

—'আমি কেমন করে জানব?' বলতে বলতে ডাঃ সেন বেরিয়ে গেলেন।

দরজা খোলার শব্দ হল। উচ্চকণ্ঠে কে শুধোলে, 'অরিন্দমবাবু এখানে আছেন কি?'

তারপরই শোনা গেল ভারী ভারী পায়ের শব্দ। তারপর ঘরের দরজার কাছে যে-মূর্তিকে দেখা গেল, তাকে চৌকিদার বলে চিনতে একটুও বিলম্ব হয় না।

অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে চৌকিদার বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এই তো আসামি! আমি ওকে চিনি।'

বলতে বলতে সে ঘরের ভিতর ঢুকে অরিন্দমের কাছে গিয়ে তার একটা কাঁধ চেপে ধরে বললে, 'আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম।'

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে অরিন্দম শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করলে, 'কী কারণে?'

—'চুরি আর মারপিটের জন্যে।'

—'বাপু চৌকিদার, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার নামে নালিশ করেছে কে?'

ঘরের ভিতরে আবির্ভূত হয়ে মদনলাল বললে, 'আমি। মিঃ সেন, এই আকস্মিক উপস্থিতির জন্যে আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন।'

ডাঃ সেন বললেন, 'কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

মদনলাল বললে, 'ব্যাপারটা হচ্ছে ওই। আজ রাত প্রায় এগারোটার সময় নীচের ঘরে বসে আমি বই পড়ছিলুম। হঠাৎ ঘরের ভিতরে দেখতে পেলুম অরিন্দম নামে এই লোকটাকে, ওর হাতে ছিল একটা রিভলভার। সে আমাকে শাসিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমি ওর উপরে লাফিয়ে পড়লুম। অরিন্দম বলবান ব্যক্তি, সহজেই সে আমাকে কাবু করে ফেলে আমার মাথার উপরে রিভলভারের হাতল দিয়ে জোরে আঘাত করলে। আমি অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপরে পড়ে

যাই। জ্ঞান হবার পর দেখি অরিন্দম ঘরের চারিদিকে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। রিভলভারের ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে থাকবার ভান করি। তারপর অরিন্দমের ভাব দেখে মনে হল, যার লোভে আমার বাড়িতে এসেছিল, তা সে খুঁজে পায়নি। অবশেষে সে যখন বাইরে বেরিয়ে গেল, আমি চুপিচুপি তার পিছু নিই। তারপর তাকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখে আমি থানায় গিয়ে খবর দিয়েছি। এই হল প্রকৃত ঘটনা।'

লাঠিটা মেঝের উপরে ঠুকে এবং অরিন্দমের কাঁধ ধরে আরও জোরে চেপে ধরে চৌকিদার বললে, 'লক্ষ্মীছেলের মতন থানায় চলো, নইলে মজাটা টের পাবে এখনই।'

অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে বললে, 'বাহবা, কী বাহবা! এইবারে আমার জামাকাপড় খুঁজে দেখা হোক, আমার কাছে কোনও রিভলভার আছে কি না।'

মদনলাল হেসে উঠে বললে, 'তুমি ভুলে সেটা আমার ঘরেই ফেলে এসেছিলে। এই দ্যাখো, আমি সেটাকে নিয়ে এসেছি।'

ডাঃ সেন রিভলভারটা মদনলালের হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, 'দেখছি এটা বেলজিয়ামে তৈরি। অরিন্দমবাবু, এটা কি আপনার?'

অরিন্দম মাথা নেড়ে বললে, 'পাগল! আগ্নেয়াস্ত্রকে আমি ঘৃণা করি। দুড়ুম-দড়াম আওয়াজ আমি পছন্দ করি না।'

—'শিগগির চলে এসো বলছি!' অরিন্দমের পিঠের উপরে চৌকিদার সজোরে একটা ধাক্কা মারলে।

অরিন্দমের গায়ে কেউ হাত তুললে সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে দুই হাতে চৌকিদারের দু-খানা হাত ধরে প্রবল এক মোচড় দিলে এবং একটান মেরে তাকে নিক্ষেপ করলে ঘরের আর এক প্রান্তে। চৌকিদার চিৎকার করে মেঝের উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল সশব্দে।

অরিন্দম শান্তভাবেই বললে, 'যে শান্তিতে থাকতে চায়, সে কখনও যেন আমার গায়ে হাত না তোলে। আর কখনও এমন কাজ কোরো না, বুঝেছ বাপু?'

চৌকিদার বিকৃতমুখে দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বললে, 'পুলিশকে আক্রমণ! তুমি গুরুতর সাজা পাবে।'

অরিন্দম তাকে ধমক দিয়ে বললে, 'চুপ করে থাকো। যখন আমরা কোনও কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তখন তুমি কথা কোয়ো। হ্যাঁ মদনলাল, এইবারে তোমার আজব রূপকথাটা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যখন তোমার ওখানে যাই, তখন কি তুমি একলা ছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার খুড়তুতো ভাই মোহনলালবাবু তখন কোথায় ছিলেন?'

—'সন্ধ্যাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।'

—'সন্ধ্যাদেবী, একথা কি সত্যি?'

—সন্ধ্যা বললে, 'হ্যাঁ, ওই সময়ে মোহনলালবাবু আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন বটে।'

—'উত্তম! তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন : আমার পিছনে পিছনে তোমার সঙ্গে আর কোনও লোক এসেছিল কী?'

—'আমি তোমার ওই সব বাজে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। বলছি তো, বাড়িতে আমি একলা ছিলুম।'

—'বেশ, এখন পথে এসো। নিজের মুখেই বলছ, বাড়িতে তুমি একলা ছিলে। তাহলে তোমার সাক্ষী কে? আমি যদি বলি, তুমি আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে, তারপর কথা কইতে কইতে হঠাৎ উঠে রিভলভারের হাতল দিয়ে আমাকে প্রহার করে আমার হাত- ঘড়িটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলে, তাহলে তুমি কী উত্তর দেবে? আর তোমার হয়ে সাক্ষ্যই বা দেবে কে? অতএব আমার বদলে এই চৌকিদারটা তোমাকেই বা ধরে নিয়ে যাবে না কেন?'

চৌকিদার বললে, 'আদালতে গিয়ে ওই সব কথা বোলো।'

মদনলাল বললে, 'আমার সুনামই এই অভিযোগ থেকে আমাকে রক্ষা করবে।'

অরিন্দম বললে, 'আমরা দু-জনে ধস্তাধস্তি করেছিলুম, নয়? আমার নিজের কাপড়-চোপড় দেখলে সকলেই সেই কথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু তোমার দেহে ধস্তাধস্তির চিহ্ন কোথায়?'

মদনলাল মুখ টিপে হাসতে হাসতে নিজের কোটের বোতামগুলো খুলে ফেললে। দেখা গেল, কোটের নীচে তার শার্টটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে।

অরিন্দম বুঝলে, মদনলাল প্রস্তুত না হয়ে এখানে আসেনি। তবু সে শুধোলে, 'আমি রিভলভারের হাতল দিয়ে তোমার দেহে কোথায় আঘাত করেছিলুম?'

—'মাথায়।'

ডাঃ সেন এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার মাথার একটা জায়গা উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে বটে। ওটা নিশ্চয়ই কোনও আঘাতের চিহ্ন।'

মদনলাল বিজয়ী বীরের মতো বুক ফুলিয়ে বললে, 'এই অপ্রীতিকর কথা-কাটাকাটি আমার আর ভালো লাগছে না। চৌকিদার, তোমার কর্তব্য পালন করো। কোনও ভয় নেই, আমার কাছে রিভলভার আছে। আসামি বাগ না মানলে আমি তা ব্যবহার করতে ইতস্তত করব না। যাও, ওর হাতে পরিয়ে দাও হাতকড়ি।'

হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে ঘরের দরজার সামনে হল অভাবিত একটা মূর্তির আবির্ভাব—তার হাতে একটা প্রকাণ্ড রিভলভার!

মূর্তি সুগম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'আরে, আরে, এসব কী কাণ্ড!'

সে হচ্ছে রামফল।

অষ্টম

সন্ধ্যা চায় অ্যাডভেঞ্চার

মদনলাল পিছন ফিরে দাঁড়াল সচমকে, তার মুখ দিয়ে বেরুল কেবল একটা অস্ফুট শব্দ। রামফল তার সেই মস্ত বড়ো রিভলভারটা একেবারে মদনলালের বুকের উপর ধরে বললে, 'চুপ করে দাঁড়াও। একটু নড়েছ কী গুলি করেছি! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা জাঁহাবাজ লোক!'

মদনলালের হাতে রিভলভার ছিল বটে, কিন্তু রামফলের উদ্যত রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অস্ত্রটা সে উপরে তুলে ধরতে ভরসা করলে না। মৃদুস্বরে বললে, 'শোনো বাপু—'

রামফল বাধা দিয়ে কর্কশ স্বরে বললে, 'ও বাপু-টাপু বলে আমাকে ভোলাতে পারবে না! ঠিক সময়ে এসে আমি তোমাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি। তোমার ওই খেলাঘরের পিস্তলটা এখনই মাটির ওপরে ফেলে দাও, নইলে—'

মদনলালের শিথিল মুষ্টি থেকে অটোমেটিকটা মাটির উপরে গিয়ে পড়ল সশব্দে এবং সাবধানের মার নাই ভেবে অরিন্দম হেঁট হয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে নিলে।

রামফল হুকুমের স্বরে বললে, 'এই চৌকিদার! সঙের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখনই পরিয়ে দাও তোমার লোহার বালা এই লোকটার হাতে।'

মদনলাল বললে, 'আগে আমার কথাই শোনো।'

নাক শিকেয় তুলে রামফল বললে, 'চোরের কথা আবার ভদ্দরলোক শোনে নাকি?'

অরিন্দম বললে, 'রামফল হে, তোমার ওই কামানটা নিয়ে তুমি অত নাড়াচাড়া কোরো না। এখন ভিতরে এসে দাঁড়াও। এই একটু আগেই আমি ভাবছিলুম, কেমন করে তোমার কাছে খবর পাঠানো যায়।'

—'যে আজ্ঞে হুজুর!' বলেই রামফল খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অরিন্দম বললে, 'আমাকে ভ্রমক্রমে শনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু মদনলালবাবু কিছুতেই আমার কথা মানবেন না। যাক, এখন এই অনাহূত অতিথির পরিচয় শুনুন। এর নাম হচ্ছে শ্রীরামফল। আগে ছিল ফৌজে, এখন গুলি খেয়ে পা খোঁড়া করে আমার কাছে কাজ করছে। আপনারা এই রামফলকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে, আজ রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটের সময় আমি বাসাতেই ফিরে এসেছিলুম। তারপর ঠিক যখন বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট, সেই সময় আবার আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।'

অরিন্দম রামফলের মুখে ফিরেও দেখলে না, কারণ সে যে কী বলবে তা সে জানে। কিন্তু ডাঃ সেন তাকিয়ে দেখলেন, রামফলের মুখের উপরে একটা বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

রামফল বললে, 'হ্যাঁ, আপনি তো ঠিক কথাই বলছেন। কে বলে আপনি বাসায় যাননি?'

অরিন্দম বললে, 'মদনলালবাবুকে আজ রাত্রে কে আক্রমণ করেছিল? ওঁর বিশ্বাস, আমিই সেই ব্যক্তি।'

রামফল অবহেলাভরে বললে, 'এ হচ্ছে ডাহা আজগুবি কথা!'

মদনলালের দিকে ফিরে অরিন্দম বললে, 'আশা করি এইবারে আমার কাছে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। প্রিয় মদনলালবাবু, এখন আপনি স্বীকার করবেন তো, আপনাকে যে আক্রমণ করেছিল, আপনি তার মুখ পর্যন্ত দেখতে পাননি? আপনি মিথ্যা সন্দেহে আমাকে এই ব্যাপারের মধ্যে জড়াতে চান। তাই নয় কি?'

তারা পরস্পরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। অরিন্দমের মনের কথা বোঝা কঠিন নয়। সে বলতে চায়, কোনও রকমে মুখরক্ষা করে মদনলাল এখন এখান থেকে সরে পড়লেই ভালো হয়। মদনলালও বুঝতে পারলে যে, ঘটনাক্ষেত্রে সে একলা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না বলে নিজের মামলাকে যথেষ্ট দুর্বল করে ফেলেছে। তার উপরে রামফল যদি আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, তার মনিব ঘটনার সময় বাসাতেই ছিল তাহলে তার কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। বাঘরাজ যেই-ই হোক, মামলাটা যে সেই-ই সাজিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিজনকুমারের বাড়িতে অরিন্দমের কোনও বিপদ হলে তারা নিজেরাই বিপদে পড়তে পারত। সেইজন্যে এই উপায়েই অরিন্দমকে এখন কিছুকালের জন্যে ঘটনাক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু অরিন্দম বন্দি হল না; ব্যর্থ হল বাঘরাজেরই ফন্দি।

মদনলাল মনে মনে সব বুঝলে বটে, কিন্তু বাইরে তার মুখের কোনও মাংসপেশি একটুও সংকুচিত হল না। তবে তার দুটো চোখের দৃষ্টি হচ্ছে রীতিমতো বিষাক্ত।

সে প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'স্বীকার করছি, আমারই ভ্রম হয়েছে। কী জানেন, যে- ডাকাতটা আজ আমাকে আক্রমণ করেছিল, চোখের তলা থেকে তার আধখানা মুখ ছিল রুমাল দিয়ে ঢাকা। তার একটু আগেই অরিন্দমবাবুকে সেইখানে আমি বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলুম, তাই সন্দেহ জেগেছিল তাঁরই উপরে। আসল অপরাধী কে, আমি তা জানি না। আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।'

একটা কৃত্রিম ভারিক্কে চালে অরিন্দম বললে, 'উত্তম। আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জুর হল।'

মদনলাল শ্রান্তস্বরে বললে, 'মিঃ সেন, সন্ধ্যাদেবী, এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আপনারাও আমাকে মার্জনা করবেন। এখন আমি বিদায় হচ্ছি।'

সকৌতুকে অরিন্দম বললে, 'সে কী! সে কী! অন্ধকারে আড়ালে-আবডালে হয়তো সেই পাষণ্ড দস্যুটা এখনও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। অতএব আপনার এই অটোমেটিকও সঙ্গে রাখুন।'

সর্পের মতো ক্রুর দৃষ্টিতে অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে মদনলাল ব্যঙ্গভরে বললে, 'ধন্যবাদ। আমার জন্যে আপনাকে আর অত বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। ও রিভলভারটা না পেলেও আমার চলবে।'

মদনলালকে প্রস্থানোদ্যত দেখে চৌকিদার ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'এসব কী ব্যাপার? আপনি যে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু এখানে পুলিশকে আক্রমণ করা হয়েছে, তার কী হবে?'

অরিন্দম গম্ভীর স্বরে বললে, 'কোনও নির্দোষ লোককে অপরাধী বলে গ্রেপ্তার করতে এলে তার মাথা কি তখন ঠিক থাকে? মদনলালবাবু নিশ্চয়ই আমার কথায় সায় দেবেন? আর দ্যাখো চৌকিদার, মদনলালবাবুর ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো। এখানে বাজে গোলমাল না করে তুমি সুড়সুড় করে মদনলালবাবুজির সঙ্গে সঙ্গে যাও। উনি নিশ্চয়ই তোমাকে খুশি করে তোমার ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। দেবেন নাকি মদনলালবাবু?'

মদনলাল আবার অরিন্দমের মুখের উপর একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অত্যন্ত অমায়িকভাবে বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়ই! আজকের এই ভ্রমের জন্যে আমিই দায়ী। চৌকিদার, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

—'একেই বলে আদর্শ ভদ্রতা। হে চৌকিদার, তুমি যদি এখনও এখানে অপেক্ষা করো, তাহলে মদনলালবাবু তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবেন।'

তারা দুজনেই ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অরিন্দম তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার ঘরের ভিতর ফিরে এসে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'মিঃ সেন, দারুণ তৃষ্ণা! কিঞ্চিৎ চা, অথবা একটা লেমনেড—অর্থাৎ যে-কোনও পানীয়! আমার আবদার শুনে আপনার রাগ হবে না তো?'

ডাঃ সেন অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আজ যেভাবে আপনি শত্রুদের বিষদাঁত ভেঙে দিলেন, সেটা স্মরণীয় হওয়া উচিত। অতএব আজ আপনি চা, লেমনেড, বিয়ার, হুইস্কি, কি ব্র্যান্ডি—যে-কোনও পানীয়ের উপরে দাবি করতে পারেন। বলুন কী চান?'

অরিন্দম দুই ভুরু কপালের উপর দিকে তুলে কৃত্রিম বিরক্তির স্বরে বললে, 'এসব কী বলছেন? হুইস্কি, ব্র্যান্ডি! দেখছেন না এখানে সগৌরবে বিরাজমান জনৈক মহিলা?'

খিলখিল করে হেসে উঠে এতক্ষণ পরে সন্ধ্যা তার মুখ খুললে, 'ঠিক কথা! এখানে একজন মহিলা উপস্থিত আছেন বটে। কিন্তু অরিন্দমবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এটা হচ্ছে 'ককটেলে'র যুগ। আর এখানে যিনি উপস্থিত আছেন, তিনি হচ্ছেন অতি আধুনিক মহিলা।'

অরিন্দম মুচকি হেসে বললে, 'তাহলে মিঃ সেন, আপনি এক 'ট্যাঙ্কার্ড' বিয়ার এনে দিলেই আজকের মতো আমার তৃষ্ণা মিটে যেতে পারে।'

ডাঃ সেন বললেন, 'উত্তম। কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাদের এই রামফলটি যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির হলেন কোন ইন্দ্রজালে?'

অরিন্দম বললে, 'ইন্দ্রজাল-টাল কিছুই নয়। রামফল হে, এই ভদ্রলোককে বলো তো, হঠাৎ অত্যন্ত অভদ্রের মতো তুমি একটা কামান হাতে করে এখানে এসে হাজির হয়েছ কেন?'

রামফল বললে, 'আপনি তো জানেন কর্তা, রাত্রি হলে খাওয়া-দাওয়ার পর বাসার বাইরে এসে খানিকটা ঘোরা-ফেরা না করলে আমার ঘুম হয় না। ঘুরতে ঘুরতে আজ আমি খানিকটা বেশি এগিয়ে এসেছিলুম। অন্ধকারের ভেতরে এই বাড়ির আলো দেখে কেন জানি না, এইদিকেই আমি এগিয়ে এলুম। এখানে এসেই শুনলুম গরম গরম কথাবার্তা। তারপর জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই দেখতে পেলুম আমাদের কর্তাকে। তারপর—আরও কিছু বলতে হবে কি?'

ডাঃ সেন বললেন, 'কিছু না, কিছু না! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। তোমার কথা বিশ্বাস করাই উচিত। অতএব তুমি ওইদিক দিয়ে এগিয়ে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বোসো। ওখানে তোমার জন্যেও হাজির হবে যে-কোনও রকম পানীয়।'

রামফল রিভলভারটা বুকের কাছে চেপে ধরে সোজা হয়ে সৈনিকের মতো পদবিক্ষেপ করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

খুশি-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বললে, 'আমার রামফলের তুলনা নেই।'

ডাঃ সেন বললেন, 'খালি রামফল কেন, আজ আরও কোনও কোনও অতুলনীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করে আমি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করলুম!'

অরিন্দম বিয়ারের গেলাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগল, কোনও কথা বললে না। অল্পক্ষণ পরে সে আর সন্ধ্যা সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলে।

বাইরে এসে দুজনে নীরবে পাশাপাশি এগিয়ে চলল, রাত তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ।

সন্ধ্যাদের বাড়ির ফটকের কাছে এসে অরিন্দম বললে, 'নমস্কার সন্ধ্যাদেবী। আজ তবে আসি। কিন্তু কাল সকালে একবার আপনার দেখা পাব কি?'

—'নিশ্চয়!'

—'তাহলে সকালের প্রাতরাশ সেরেই আমি আপনাদের এখান চলে আসব।'

হঠাৎ সন্ধ্যার মনে পড়ে গেল দেবিকাদেবীর কথা। তার পিসি হয়তো কৌতূহলী হয়ে অরিন্দমকেও একথা-সেকথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। সে বললে, 'আচ্ছা অরিন্দমবাবু, কাল সকালে আমিই যদি আপনার ওখানে যাই, আপনি তাহলে কিছু মনে করবেন না তো?'

—'কিছু মনে করব মানে? তাহলে তো আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাব। সেই কথাই ভালো, কালকের দুপুরের আহারটাও দয়া করে আমার ওখানেই সেরে আসবেন। আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরুতে পারবেন বলুন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমি রামফলকে পাঠিয়ে দেব!'

একটু বিস্মিত হয়ে সন্ধ্যা বললে, 'রামফলকে পাঠাবার দরকার আছে?'

অরিন্দম গম্ভীরভাবে বললে, 'অত্যন্ত দরকার। বাঘরাজের মন ভীষণ সন্দিগ্ধ। হয়তো সে এখন আপনাকেও বিপজ্জনক বলে ধরে নিয়েছে। রামফল আপনার সঙ্গে থাকলে আমি কতকটা আশ্বস্ত হব।'

—'বেশ, সাড়ে দশটা নাগাদ আমি বাড়ি থেকে বেরুতে চাই।'

—'সন্ধ্যাদেবী, আমার আর একটি অনুরোধ আছে।'

—'বলুন।'

—'রাত্রে ঘরের ভিতর থেকে দরজায় খিল দিয়ে শোবেন। কেউ ডাকলে খিল খুলে দেবেন না—এমনকি আপনার পিসিমা ডাকলেও নয়! অবশ্য এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটবে বলে আমি মনে করি না, তবু বলা তো যায় না। কেমন, আমার কথা রাখবেন তো?'

—'তা রাখব, কিন্তু আপনি আমাকে বড়োই ভয় দেখাচ্ছেন।'

—'আমি বাঘরাজের কথা ভাবছি। হয়তো বাঘরাজও আমার কথাই ভাবছে। কিন্তু অরিন্দমকে কেউ কোনও দিন একই পদ্ধতিতে দুইবার আক্রমণ করতে পারেনি। রামফল ছাড়া আর কেউ কোনও চিঠি আনলেও বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করবেন কেবল আমাকে, রামফলকে আর হয়তো ডাঃ সেনকেও। আপনি ভাবছেন হয়তো আমি খুব লম্বা হুকুম দিচ্ছি, কিন্তু জেনে রাখুন, অদূর ভবিষ্যতেই সমূহ দুর্যোগের সম্ভাবনা। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি রীতিমতো সাহসিনীর মতো কাজ করেছেন। আবার কোনও বিপদ হলে মাথা ঠিক রাখতে পারবেন তো?'

—'আমি চেষ্টা করব।'

সন্ধ্যা ফটকের ভিতরে ঢুকল এবং অরিন্দম তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে নিজের বাসার দিকে। খানিক দূর অগ্রসর হয়েই সে দেখতে পেলে, একটা ঝোপের পাশে আগুনের ফিনিক। আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তি। আরও কয়েক পা এগিয়ে বোঝা গেল যে রামফল সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

অরিন্দম বললে, 'বাঘরাজ কী চায়, কে জানে? কাল সকালে যদি দেখা যায়, কোনও খানাডোবার ভিতরে পড়ে আছে আমাদের দুজনের মৃতদেহ, তাহলে বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানিকে কেউই ধরতে-ছুঁতে পারবে না। অতএব খুব সাবধান রামফল, খুব সাবধান!'

কিন্তু পথের মধ্যে কোনও অঘটনই ঘটল না, নিরাপদেই তারা বাসায় গিয়ে পৌঁছুতে পারল এবং সে-রাত্রেও কেউ তাদের শান্তিভঙ্গ করবার চেষ্টা করলে না।

পরদিনের প্রভাত। অরিন্দম তার প্রাতঃকৃত্য—অর্থাৎ ব্যায়াম প্রভৃতি সেরে খাবার ঘরে ঢুকে দেখলে, টেবিলের উপরে প্রাতরাশের সরঞ্জাম রেখে রামফল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অরিন্দম বললে, 'রামফল, আর এক ঘণ্টা পরেই তুমি জমিদারবাড়ির দিকে যাত্রা কোরো। তোমার সঙ্গে আসবেন সন্ধ্যাদেবী!'

যথাসময়েই সন্ধ্যার আবির্ভাব। অরিন্দম হাস্যমুখে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, মনে হচ্ছে আপনাকে যেন একযুগ দেখতে পাইনি। খবর কী?'

—'খবর শুভ। রাত্রে কিছুই ঘটেনি।'

—'কিন্তু কিছু ঘটলেও ঘটতে পারত। আমি যখন বয়েজ স্কাউট ছিলুম তখন এই শিক্ষাই পেয়েছিলুম যে, সর্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত। কিন্তু সন্ধ্যাদেবী, আপনাকে আজ কী সুন্দরই দেখাচ্ছে!'

লজ্জিতভাবে দৃষ্টি নত করে সন্ধ্যা বললে, 'আমি এখানে আত্মপ্রশংসা শুনতে আসিনি।'

—'তাহলে শুনুন অন্য কোনও কোনও কথা—' অরিন্দম তার কাছে ধীরে ধীরে বর্ণনা করতে লাগল, বাঘরাজের বিচিত্র অবদান। কোথায় সে ব্যাংক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করেছে, কোথায় সে প্রায় অর্ধকোটি টাকার সোনার থান হস্তগত করেছে এবং কোথায় সে তার পাপকর্মের অন্যতম সঙ্গী সুখনলালের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। সুখনলাল যতটুকু আভাস দিয়ে যেতে পেরেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে এই কমলপুরেই বাঘরাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। এ-ব্যাপারটা নিয়ে সে নিজেও যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছে এবং এখান-ওখান থেকে অল্পবিস্তর তথ্যও সংগ্রহ করেছে। তার ধ্রুব বিশ্বাস, বাঘরাজের গুপ্তধন আছে এই কমলপুরের মধ্যেই। কিন্তু কোনখানে গেলে যে তার সন্ধান পাওয়া যাবে, এ-কথা সে জানে না। তবে এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়, গুপ্তধনের কথা সে যখন জানতে পেরেছে, আর তার সন্ধানেই এখানে হাজির হয়েছে, তখন গুপ্তধন নিয়ে বাঘরাজ নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই এখান থেকে আবার অদৃশ্য হবার চেষ্টা করবে। বাঘরাজকে প্রতিভাবান বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। পুলিশের ও আর-সকলের চোখে ধুলো দিয়ে অত টাকার একটি বৃহৎ স্তূপ নিয়ে কেমন করে যে সে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। আবার এত টাকা নিয়ে সে অন্য কোথাও নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়তে চায়! বাঘরাজ অরিন্দমকে চেনে এবং তাকে একজন অত্যন্ত চতুর ও দুঃসাহসিক ব্যক্তি বলে মনে করে। কালই অরিন্দমকে মৃত্যুমুখে পড়তে হত, কেবল সন্ধ্যার উপস্থিতির জন্যেই সে রক্ষা পেয়েছে। তারপরেও সে তাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে পথ থেকে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, এ-কথা সন্ধ্যা জানে! কিন্তু কেন? বেশ বোঝা যায়, অরিন্দম পুলিশের হেফাজতে থাকলে সে অনায়াসেই সেই অবসরে গুপ্তধন নিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে পারবে। বাঘরাজের বাম হাত আর ডান হাত হচ্ছে বিজন আর মদনলাল। এদের দুজনের দিকেই এখন তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে।

সন্ধ্যা বললে, 'মদনলালবাবু তলে তলে এতসব কাণ্ড করেন, মোহনলালবাবু তার কিছুই খবর রাখেন না। আর খবর রাখবেনই বা কেমন করে? তিনি হচ্ছেন একটি ফোতোবাবু, সর্বদাই নিজের সাজপোশাক নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সরল, কিন্তু নিরেট বোকা। এত আবোল-তাবোল বকেন যে, পিসিমা পর্যন্ত কাল রাত্রে তাঁর উপর দারুণ চটে গিয়েছিলেন। কাল বিজনবাবুর বাড়িতে আপনার প্রাণ নিয়ে যখন টানাটানি হচ্ছিল, তিনি তখন আমাদের বাড়িতে আড্ডা জমিয়ে আবোল-তাবোল বকতে এসেছিলেন।'

অরিন্দম চিন্তিত মুখে বললে, 'চুলোয় যাক মোহনলালবাবুর কথা। এখন আপনাকে আমি আর যা বলতে চাই মন দিয়ে শুনুন। বিজন আর মদনলাল এখন বেশ বুঝতে পেরেছে যে, আপনার সঙ্গে আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছে। তারা জানে, আমি নিজের জীবন বিপন্ন করেও আপনাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলুম। বিশেষ বন্ধু না হলে কেউ তা করে না। সুতরাং আমি যে তাদের গুপ্তকথা আপনার কাছে এতক্ষণে প্রকাশ করে দিয়েছি, এটাও নিশ্চয়ই তারা অনুমান করেছে। অতএব এই নাট্যাভিনয়ে তারা

আপনাকেও একজন প্রধান অভিনেত্রী বলেই মনে করবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই, এর পরে আমাদের কী করা উচিত?'

সন্ধ্যার দিকে অরিন্দম এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ল যে, যাতে করে তার মুখ সে আরও ভালো করে দেখতে পায়। তার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দিলে, সে যা বলছে তা হচ্ছে গুরুতর কথা।

সন্ধ্যা কোনও জবাব দিলে না দেখে অরিন্দম আবার বললে, 'আচ্ছা, আমিই না হয় ওই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আপনার এখন কমলপুর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।'

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, 'কেন?'

—'অবিলম্বেই বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে আমার একটা ভয়াবহ সংঘর্ষ অনিবার্য। কাজেই তারা কেবল আমাকে নয়, আপনাকেও পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। বাঘরাজদের গুপ্তকথা যারা জানে, তাদের কারুকেই তারা ক্ষমা করবে না। আপনার বিপদ হতে পারে সন্ধ্যাদেবী, সমূহ বিপদ হতে পারে?'

সন্ধ্যা দুই ভুরু কুঁচকে কঠিন স্বরে বললে, 'তাদের ভয়ে আমাকে ভয় পেয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে, আপনি কি এই কথাই বলতে চান?'

অরিন্দম বললে, 'না সন্ধ্যাদেবী, আমি আপনাকে ভয় পেতে বলছি না। তবে আমার কী মনে হয় জানেন? এইসব রক্তারক্তি আর হানাহানির মাঝখানে নারীদের থাকা উচিত নয়।'

সন্ধ্যা সোজা হয়ে বসে বললে, 'কেন উচিত নয়? নারীরা দুর্বল, না, অরিন্দমবাবু? নারীরা দুর্বল, নারীরা ভয় পায়, নারীদের সাহস নেই! গতযুগ পর্যন্ত নারীরা এইসব অপবাদ বোবার মতো সহ্য করে এসেছে। বর্তমান কালের নারীরা এসব অপবাদ সত্য বলে মানতে প্রস্তুত নয়—আর আমি হচ্ছি বর্তমান যুগেরই মেয়ে।'

অরিন্দম বললে, 'দেখছি আপনার ঘটে বুদ্ধির অস্তিত্ব নেই।'

সন্ধ্যা শ্লেষভরা কণ্ঠে বললে, 'প্রিয় মহাশয়, আমাকে বোকা বানাতে চাইলেও আমি ধৈর্য হারাব না। আপনি ভাবছেন আমাকে বোকা বলে গালাগালি দিলে আপনার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক তুলে দেব? আপনার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে বাঘরাজদেরও শুভদৃষ্টি আমার ওপর পড়বে না। কিন্তু আমাকে এর চেয়ে ঢের বেশি কড়া গালাগাল দিলেও আপনার সঙ্গ আমি ত্যাগ করব না। যারা মাইল-কয়েক দূরে বাগানে বা পাড়াগাঁয়ে চড়িভাতি করতে গিয়ে ভাবে, মস্ত একটা অ্যাডভেঞ্চার করা হল, আমি সে-দলের মেয়ে নই অরিন্দমবাবু। আমি চাই বিপদ, আমি চাই উত্তেজনা, আমি চাই ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গ! ছেলেবেলা থেকে কত স্পোর্টসে যোগ দিয়েছি, দশ মাইল সাঁতারে দু-বার প্রথম স্থান অধিকার করেছি, শিখেছি ছোরা আর লাঠিখেলা, এখনও করি নিয়মিত ব্যায়াম। রাশি রাশি অ্যাডভেঞ্চারের কেতাব পড়েছি, আর পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে আমি যেন দুঃসাহসী সব নায়কদের সঙ্গে-সঙ্গেই বর্তমান আছি। আজ আমার সামনে অপেক্ষা করছে সেই রকমই কোনও অ্যাডভেঞ্চার। অরিন্দমবাবু, আপনি ভাবছেন এমন সুযোগ আমি ত্যাগ করব? কখনও না, কখনও না!'

অরিন্দম মুগ্ধনেত্রে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে। মনে মনে তার ইচ্ছা হল, এখনই নিজের বাহুবেষ্টনের মধ্যে সন্ধ্যার ওই সুকুমার তনুলতা গ্রহণ করে এবং তার গোলাপরঙিন ওষ্ঠাধরে চুম্বন করে তাকে দেয় অভিনন্দন। কিন্তু আপাতত সেই মহৎ ইচ্ছাটা কোনওক্রমে দমন করে সে বললে,

'জীবনে আমি অনেক বোকা মেয়ে দেখেছি! তাদের বোকামি অসহনীয়। কিন্তু আপনার বোকামি কেবল সহনীয় নয়, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক—অত্যন্ত আনন্দদায়ক।'

সন্ধ্যা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, 'বুঝলুম। কিন্তু তার পরের কথাটা কী?'

সন্ধ্যার দুই কাঁধের উপরে দুই হাত রেখে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে অরিন্দম বললে, 'বন্ধু, পরে আর কোনও কথা নেই, আছে কেবল কাজ। অতঃপর কমলপুরে যে-নাটকের অভিনয় চলবে, তাতে নায়ক হব আমি আর নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করবেন আপনিই। কিন্তু মাভৈঃ! নায়িকা বিপদে পড়লে নায়ক নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার না করে ছাড়বে না।'

অরিন্দমের গণ্ডদেশে একটি মৃদু চপেটাঘাত করে সন্ধ্যা বললে, 'ধন্যবাদ।'

নবম

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে

অরিন্দম শুধোলে, 'তারপর?'

সন্ধ্যা বললে, 'আমিও একটি গল্প বলতে পারি। গল্পটা শুনেছি আমি কাল রাত্রে।' তারপর কাল রাত্রে দেবিকাদেবী তার কাছে যেসব কথা স্বীকার করেছিলেন, সে তা ধীরে ধীরে খুলে বললে।

অরিন্দম খুব মন দিয়ে তার কাহিনি শ্রবণ করলে। তারপর দুই ভুরু উপরে তুলে বললে, 'আশ্চর্য ব্যাপার! দেবিকাদেবীকে কীসের জন্যে ভয় দেখিয়ে বিজন টাকা আদায় করেছে? তিনি ভয় পাবেন কেন? অতীতে তিনি কি কোনও লজ্জাকর কাজ করেছেন? যৌবনেও তিনি যে সুন্দরী ছিলেন না, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়। সুতরাং তাঁর জীবনে গুপ্ত 'রোমান্স' থাকবার কথা নয়। সন্ধ্যাদেবী, আপনি তাঁর সম্বন্ধে আরও কী জানেন?'

সন্ধ্যা বললে, 'বিশেষ কিছুই নয়। এইটুকু কেবল জানি, বিধবা হবার পর তিনি নানাদেশি হয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন! বাবার মৃত্যুর আগে আমি তাঁর নামমাত্র জানতুম, কখনও তাঁকে চোখে দেখবার সুযোগও পাইনি। আমার বাবা মৃত্যুর কিছুদিন আগে উইলে অভিভাবিকারূপে তাঁরই নাম করে যান। পিসিমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বাবা মারা যাবার পরে।'

—'তাহলে হয়তো তিনি যখন নানা দেশে প্রবাস যাপন করতেন, তখনই তাঁর জীবনে কোনও না কোনও 'রোমান্সে'র ব্যাপার ঘটেছিল। আর বিজন তাকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে আপনার পিসিমার বিরুদ্ধে!'

সন্ধ্যা সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'পিসিমার জীবনে 'রোমান্স'—মরুভূমিতে গোলাপফুল! কী যে বলেন অরিন্দমবাবু!'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অরিন্দম বললে, 'রোমান্সের কথা থাক, এখন বাস্তব জগতে ফিরে আসা যাক। আচ্ছা সন্ধ্যাদেবী, কমলপুরে কোন কোন বাড়ি খুব বেশি পুরাতন? আমি আগে সবচেয়ে পুরাতন বাড়ির কথাই জানতে চাই। সুখনলাল মরবার আগে সংক্ষেপে বাঘরাজের ঠিকানা জানাবার জন্যে কোনও পুরোনো বাড়ির উল্লেখ করেছিল। এমন কোনও বাড়ি এখানে আছে কি?'

কিছুমাত্র চিন্তা না করেই সন্ধ্যা বললে, 'আছে অরিন্দমবাবু। একেবারে সমুদ্রের ধারে। অনেকদিন আগে ওখানে এক সরকারি কর্মচারীর আস্তানা ছিল। তাঁকে আমি কখনও দেখিনি, কারণ আমার জন্মাবারও অনেক আগে তিনি ওখানে বাস করতেন। শুনেছি লোকে তাঁকে নিম্‌কিকা দারোগা বলেই ডাকত। তিনি কাজ করতেন লবণ বিভাগে। সমুদ্রের জল এক জায়গায় ডাঙার ভিতর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেইখানেই সেই বাড়িখানা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমার জন্মাবারও আগে থেকে বাড়িখানা খালি পড়ে আছে। কেউ সেখানে থাকতে চায় না, কারণ সেখানা হানাবাড়ি বলে বিখ্যাত। তার চেয়ে পুরোনো বাড়ি এখানে আর নেই।'

অরিন্দম ভাবতে ভাবতে বললে, 'হানাবাড়ি? অনেকদিন খালি পড়ে আছে! নির্জন সমুদ্রতট! নিশ্চয়ই রাত্রে ভয়ে জনপ্রাণী সেদিকে যায় না। এ হচ্ছে দুরাত্মাদের পক্ষে আদর্শ বাড়ি। সন্ধ্যাদেবী, বাড়িখানা কোন দিকে?'

সন্ধ্যা বললে, 'এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে।'

একলাফে অরিন্দম দাঁড়িয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে সাগ্রহে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওই তো উত্তর-পশ্চিম দিক। এখান থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমস্তটা দেখা যায়, মাঝখানে কোনও বালিয়াড়ি বা বনজঙ্গল নেই। উত্তম!' তারপর সে টেবিলের টানার ভিতর থেকে একটা দূরবিন বার করলে—অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবিন। জানলার ধারে গিয়ে দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে খানিকক্ষণ সে উত্তর-পশ্চিম দিকটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, একখানা বড়ো বাড়ি আমার চোখের উপরে ভাসছে। আসলে দোতলা বাড়ি, কিন্তু ছাতের উপরে তেতলায় একখানা ছোটো ঘর আছে। বাড়িখানা যে খুব পুরাতন, দেখলেই তা বোঝা যায়। নিশ্চয়ই বহুকাল তার সংস্কার হয়নি। বাড়ির দেওয়ালের গায়ে জায়গায় জায়গায় রয়েছে অশথ কি বটগাছ। বাড়ির চারিদিকে আছে দেওয়াল, কিন্তু স্থানে স্থানে তাও ভেঙে পড়েছে।'

সন্ধ্যা বললে, 'হ্যাঁ। ওই বাড়ির কথাই আমি বলছি।'

তারপর দূরবিনের মুখ সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়েই চমকে উঠল অরিন্দম। মিনিট খানেক নীরবে কী লক্ষ করলে, তারপর দূরবিন নামিয়ে সন্ধ্যার কাছে ফিরে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, দূরবিনটা নিয়ে আপনিও একবার সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন। তীর থেকে খানিক দূরে সমুদ্রের উপরে একখানা জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে!'

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, 'জাহাজ! আজ ভোরবেলায় নিজেদের বাড়ির ছাদের উপরে আমি পায়চারি করছিলুম। কিন্তু ওদিকে চেয়ে আমি জাহাজ-টাহাজ কিছুই দেখতে পাইনি।'

সে-ও দূরবিন দিয়ে যথাস্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, 'হ্যাঁ, জাহাজই বটে। অর্থাৎ মস্ত বড়ো একখানা মোটর লঞ্চ। ওখানা নিশ্চয়ই ভোরবেলায় ওখানে ছিল না, পরে এসেছে।'

অরিন্দম বললে, 'কিন্তু কেন এসেছে? এখানে কি নিয়মিতভাবে জাহাজ-টাহাজ আনাগোনা করে?'

—'না। সমুদ্রের উপরে কালেভদ্রে দেখা যায় কোনও জাহাজ।'

অরিন্দম বললে, 'এর মানে কী? সন্ধ্যাদেবী, আপনি কি আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন? মোটর লঞ্চখানা ঠিক সরাসরি ওই পোড়ো বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে? গভীর রাত্রে জাহাজ থেকে বোটে নেমে কেউ বা কারা যদি ওই পোড়ো বাড়ির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চায়, তাহলে

কোনওই অসুবিধা হবে না, এমনকি বাইরের লোকের চর্মচক্ষুও সে-দৃশ্য দেখতে পাবে না।'

সন্ধ্যা বিস্মিত ভাবে বললে, 'আপনি কী বলতে চান অরিন্দমবাবু?'

হাতের সিগারেটের দগ্ধাবশেষটা ছাইদানে নিক্ষেপ করে অরিন্দম বললে, 'আচম্বিতে ওখানে একখানা মোটর লঞ্চের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্দেহজনক। আমার বিশ্বাস, বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানি পরিপূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে। অরিন্দম হচ্ছে তাদের কাছে দুরাত্মার চেয়েও নিম্নশ্রেণির জীব। সেই রাবিশ অরিন্দমই আজ এখানে তাদের গুপ্তকথা জানতে পেরে সশরীরে এসে হাজির হয়েছে। ওদের পক্ষে এটা মোটেই সুসংবাদ নয়। অতএব যথাসময়ে সাবধান হয়ে ওরা নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়তে চায়। ওই মোটর লঞ্চের আবির্ভাবের কারণ কী জানেন সন্ধ্যাদেবী? গভীর রাত্রের অন্ধকারে আজ এখানে মহাপ্রস্থানের পালা অভিনীত হবে। বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানির গুপ্তধন আজ ওই পোড়ো বাড়ি থেকে ওই মোটর লঞ্চের ভিতরে সরিয়ে ফেলা হবে। ব্যর্থ হয়ে যাবে পাপাত্মা অরিন্দমের সমস্ত বাহাদুরি!'

সন্ধ্যা অবাকমুখে কিছুক্ষণ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'অরিন্দমবাবু, আপনার পেশা কী? আপনি কি গোয়েন্দা?'

অরিন্দম সকৌতুকে খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, 'নিশ্চয়ই আমি গোয়েন্দা নই! গোয়েন্দা হচ্ছেন ডাঃ সেন! তিনিও বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও কোনও সূত্র খুঁজে পেয়ে ছদ্মবেশে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি বাঘরাজদের গ্রেপ্তার করে সমস্ত গুপ্তধন উদ্ধার করতে চান। আমিও তাই চাই, তবে আইনের মর্যাদা রাখবার জন্যে সমগ্র গুপ্তধনের উপরে আমি কোনও দাবি করব না। কিন্তু অতঃপর দ্রষ্টব্য হবে এই,—আমি জিতব না ডাঃ সেন জিতবেন?'

সন্ধ্যা বললে, 'কিন্তু আপনি তো বললেন না অরিন্দমবাবু, আপনার পেশা কী?'

এইবারে অরিন্দম সমুচ্চ কণ্ঠে হাস্য করে বললে, 'আমার পেশা কী? আমার হচ্ছে এক অদ্ভুত পেশা! এই পেশা অবলম্বন করে কেউ যে বিশেষ লাভবান হতে পারে এখন পর্যন্ত লোকে তা জানে না।'

—'কিন্তু সে পেশাটা কী অরিন্দমবাবু?'

—'চোরের উপর বাটপাড়ি করা। আমিই প্রথমে আবিষ্কার করেছি এই পেশা। অপরাধীদের পেশা চুরি, ডাকাতি, খুন করা। পুলিশের পেশা চোর, খুনি, ডাকাতদের গ্রেপ্তার করা। আর আমার পেশা হচ্ছে, অপরাধী বা পুলিশ কারুকেই আমি সাহায্য করব না। আমি পুলিশের বিরুদ্ধে যাই না, কিন্তু অপরাধীরা আমাকে পরম শত্রু বলে মনে করে। কেন জানেন? কে কোথায় অপরাধ করছে বা করবে আমি আগে থাকতে তলে তলে সেই খবর নেবার চেষ্টা করি, আর আমার সেই চেষ্টা বিফল হয় না। যথাসময়ে অপরাধীদের সামনে হাজির হয়ে আমার প্রাপ্য আমি আদায় করতে চাই। তাদের বলি, হয় তোমাদের লুঠের মালের অর্ধাংশ আমাকে দাও, নয়তো পুলিশের কাছে খবর পাঠিয়ে ষোলোআনা থেকেই তোমাদের বঞ্চিত করব,—আর সেই সঙ্গে তোমরা সবাই যাবে জেলখানায় নয়তো দুলবে ফাঁসিকাঠে। বন্ধু, সাধারণ লোকের কল্পনাতীত হলেও এ হচ্ছে চমৎকার একটি পেশা। অপরাধী না হয়েও অন্যের অপরাধের সাহায্যে নিজে লাভবান হওয়া। তারপর এর মধ্যে আছে চমৎকার 'রোমান্স'! একদিকে আছে পুলিশ, আর-একদিকে আছে অপরাধীর দল। এই দুই দলেরই মাঝখানে হঠাৎ আমি আবির্ভূত হয়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করে

সরে পড়ি। হিতোপদেশ হয়তো এই নীতি সমর্থন করবে না, কিন্তু আপনার মত কী সন্ধ্যাদেবী?'

সন্ধ্যা বললে, 'এক্ষেত্রে আমার মতামত কিছুই নেই। তবে যেখানে 'রোমান্স', সেইখানেই আমি থাকতে চাই। ওই মোটর লঞ্চখানা দেখেই আপনি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছেন। এইবারে আপনি কী করবেন বলুন দেখি?'

অরিন্দম টেবিলের একটা প্রান্তের উপরে বসে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'আমি কী করব? শুনুন তবে। আমি অনুমান করছি, আজ রাত্রে ওই পোড়ো বাড়িতে এবং মোটর লঞ্চে অসাধারণ কোনও অভিনয় হবে। বারে বারে নৌকোয় করে ওই পোড়ো বাড়ি থেকে খেপে খেপে গুপ্তধন যাবে মোটর লঞ্চের ভিতরে। ওই গুপ্তধনের খানিক অংশ আমি নিজেই অধিকার করতে চাই। কোনও বিপদকেই আজ আমি গ্রাহ্য করব না। আমি জানি ওই পোড়ো বাড়ির কাছাকাছি ডাঙার উপরে বহু সাবধানী চক্ষু আজ কোনও অনাহূত অতিথির জন্যে অপেক্ষা করবে। কিন্তু আজ রাত্রে আমি স্থলচর হব না, হব জলচর। সাঁতারের পোশাক পরে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে আমি যাব ওই পোড়ো বাড়ির দিকে। সমুদ্রের ভিতর থেকে কোনও বিপদ আসতে পারে, বাঘরাজদের দল এটা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারবে না। তারপর? তারপর কী হবে, আমি জানি না। তবে চিরদিনই অবস্থা বুঝে আমি ব্যবস্থা করে আসতে পেরেছি। এবারও পারব বলেই মনে করি।'

অরিন্দম টানতে লাগল সিগারেট। সন্ধ্যা মৌনমুখে খানিকক্ষণ টেবিলের উপর থেকে এটা-ওটা-সেটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অরিন্দমবাবু, আজকের রাত্রের অভিযানে আমি হব আপনার সঙ্গিনী!'

অরিন্দম মুখের সিগারেটটা হাতে করে নিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে বললে, 'তার মানে? আপনি হবেন আমার সঙ্গিনী? আজ রাত্রে ঘটতে পারে অনেক কাণ্ডই, হানাহানি, খুনোখুনি এবং আরও অনেক কিছুই! আর আমি যাব জলপথে, সাঁতার কেটে!'

সন্ধ্যা হেসে উঠে বললে, 'অরিন্দমবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি দশ মাইল সাঁতার কেটে দুইবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। এখান থেকে দেড় মাইল সাঁতার কাটা আমি অত্যন্ত সহজ বলেই মনে করি। আমিও আজকে আপনার সঙ্গে সমুদ্রে জলে ঝাঁপ দিতে চাই।'

অরিন্দম সবিস্ময়ে বললে, 'তুমি—না, না, আপনি! আমার সঙ্গে সাঁতার কেটে যাবেন আপনি?'

মধুর হাস্য করে সন্ধ্যা বললে, 'কেন যাব না? আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই, তাহলে আপনি কি আমাকে বাধা দেবেন?'

—'নিশ্চয় দেব!'

সন্ধ্যা এগিয়ে এসে অরিন্দমের সামনে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু কেন, কেন, কেন? আপনি বাধা দিতে চান, এর কারণ কী?'

অরিন্দম টেবিলের উপর থেকে গাত্রোত্থান করে কোনও কথা না বলে আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বাইরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার ফিরে সন্ধ্যার সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'এর কারণ কী জানতে চাও সন্ধ্যা? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি ইচ্ছা করি না তোমাকে কোনও বিপদের মাঝখানে দেখতে। আমি তোমাকে ভালোবাসি বন্ধু, আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

সন্ধ্যা কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল নীরবে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অরিন্দমবাবু, ঠিক ওই কারণেই আপনার সঙ্গে থাকতে চাই আমি!'

অরিন্দম বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'ঠিক ওই কারণেই? কী কারণে?'

সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'কারণ? কারণ, আমিও আপনাকে ভালোবাসি। এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? আজ থেকে আমিও আপনার সহগামিনী হতে চাই। আপনার বিপদ হবে আমারও বিপদ। হে অদ্বিতীয় নির্বোধ ব্যক্তি, আপনি যদি বুঝেও কিছু না বুঝতে চান, তাহলে আমি কী করতে পারি বলুন?'

সন্ধ্যার দুইখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে গ্রহণ করে অরিন্দম অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'তবে তাই হোক সন্ধ্যা। সুখে আর দুঃখে তোমাকে যদি চিরসঙ্গিনীরূপে পাই, তাহলে আমি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হতে চাই না।'

দশম

বাঘরাজের আবার চিহ্ন

আহারাদির পর দুজনে আবার বসবার ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে।

অরিন্দম বললে, 'এখনও ভেবে দ্যাখো সন্ধ্যা, সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগে ভালো করে ভেবে দ্যাখো, সাঁতার দিতে তুমি পারবে তো? এখনও বলছি, আমার অনুরোধ, এ গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা কোরো না! আমার এই একটিমাত্র অনুরোধও কি তুমি রক্ষা করবে না?'

সন্ধ্যা জোরে মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বললে, 'ওই একটিমাত্র অনুরোধ ছাড়া আপনার সব অনুরোধই আমি রক্ষা করব।'

অরিন্দম হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, 'পাহাড় যদি নড়তে না চায়, মহম্মদও তাকে নাড়াতে পারবেন না। বেশ, তারপর কাজের কথাই হোক। অন্তত দুটি বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো। প্রথমটি হচ্ছে এই : দেবিকাদেবীর সম্বন্ধে রহস্যটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। আমি বাইরের লোক, তার উপরে পুরুষমানুষ। আমার পক্ষে তাঁকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা অসম্ভব। এ ভার তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।'

সন্ধ্যা বললে, 'আচ্ছা, আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করে দেখব।'

অরিন্দম বললে, 'লক্ষ্মীমেয়ে! তারপর আর-একজনের কথা নিয়েও মাথা না ঘামালে চলবে না। আমি ভূতপূর্ব-বিচারক স্যার বীরেন্দ্রনাথের কথা বলছি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব সামান্য। তিনি এখন অবসর নিয়েছেন বটে, কিন্তু এখানকার নাট্যাভিনয়ের মধ্যে তিনি কোনও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন কি না! সেটা না জানলে আমাদের চলবে না। এখানে এসে আজ পর্যন্ত বাঘরাজের দেখাই তো পেলুম না। অনেককেই তো দেখছি, কিন্তু তার মধ্যে বাঘরাজ কোন জন? 'রাজার' কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়।'

—' 'রাজা' আবার কে?'

—'উপাধি তার বটব্যাল। 'রাজা' তার ডাকনাম। স্যার বীরেন্দ্রনাথ যখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন তাঁরই হুকুমে রাজার সাত বছর জেল হয়। রাজা হচ্ছে ভয়ানক লোক। কিছুদিন পরে সে জেল

ভেঙে পালায়, আর পালাবার আগে কয়েদিদের কাছে শাসিয়ে যায়, স্যার বীরেন্দ্রনাথের রক্ত দর্শন না করে ছাড়বে না। স্যার বীরেন্দ্রনাথ এখন কমলপুরের বাসিন্দা, কিন্তু রাজা এখন কোথায় আছে? ধরো রাজাই যদি হয় বাঘরাজ?'

সন্ধ্যা বললে, 'রাজা হচ্ছে দাগি অপরাধী। কমলপুরে থাকলে লোক কি তাকে চিনতে পারত না? অন্তত স্যার বীরেন্দ্রনাথ তার অস্তিত্বের কথা জানতে পারতেন।'

—'তুমি জানো না সন্ধ্যা, 'রাজা'র মেক আপ করবার শক্তি এমন অদ্ভুত যে, তার কাছে যে কোনও বিখ্যাত অভিনেতাও এ বিষয়ে নিজেকে শিশু বলে মনে করবে। আর মস্তিষ্ক তার এমন শক্তিশালী যে, অনায়াসেই সে বাঘরাজের আসন গ্রহণ করতে পারে। ...প্রসঙ্গক্রমে হঠাৎ রাজার কথা এসে পড়ল, কিন্তু এখন স্যার বীরেন্দ্রনাথের কথাই হোক। তিনি তোমাকে কী রকম চোখে দেখেন?'

সন্ধ্যা বললে, 'আমি তাঁকে 'দাদু' বলে ডাকি, আর তিনিও ডাকেন আমায় 'দিদি' বলে।'

—'সুসংবাদ! স্যার বীরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তোমার কী কর্তব্য হবে, সেকথা পরে বলব। অতঃপর আজকের রাত্রের কর্তব্যের কথা শোনো। তুমি আমার সঙ্গে যখন অগাধ জলে না ভেসে ছাড়বে না, আর আজকে যখন আমাদের যাত্রা করতে হবে জলপথেই, তখন উপরকার জামাকাপড়ের তলায় একটা সাঁতারের পোশাক পরে তোমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে যথাসময়েই। আর এই জিনিসটা তোমার কোমরবন্ধে বেঁধে রেখো।' অরিন্দম টেবিলের কাছে গিয়ে একটা টানার ভিতর থেকে বার করলে একটি ছোটো রিভলভার আর একটা ছোট্ট থলি বা ব্যাগ। তারপর থলির ভিতরে রিভলভারটা পুরে বললে, 'এই থলিটা হচ্ছে 'ওয়াটার প্রুফ'। তুমি জলে ঝাঁপ খেলেও রিভলভার ভিজবে না। নাও। হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি কখনও রিভলভার ছুড়েছ?'

সন্ধ্যা হেসে বললে, 'অরিন্দমবাবু, শুনেছেন তো আমি একটা গেছো মেয়ে! লাঠি খেলা, ছোরা খেলা শিখেছি, অল্পস্বল্প রিভলভার ছুড়তেও কি শিখিনি বলে মনে করেন?'

সন্ধ্যার দুই কাঁধের উপরে দুই হাত রেখে স্থির দৃষ্টিতে তার চোখের পানে চেয়ে অরিন্দম বললে, 'বীরনারী, মার্জনা করো আমার সন্দেহকে।'

সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এইবার আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। তাহলে আজ রাত্রে কখন এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব?'

—'আটটা নাগাদ। ততক্ষণ পর্যন্ত খুব সাবধান! বাঘরাজ আর বাঘের বাচ্চাদের তুমি চেনো না। যে-কোনও মুহূর্তে তারা যে-কোনও অভাবিত কাণ্ড করতে পারে। আমার এই কথাগুলো তুমি ভালো করে মনে রেখো। চেনা আর অচেনা কোনও মানুষকেই এতটুকুও বিশ্বাস কোরো না। কোনও ছোটোখাটো ঘটনাকেও তুচ্ছ বলে মনে কোরো না। তোমার চারিদিকেই অজানা সব ফাঁদ থাকতে পারে, কিন্তু নভেলের নির্বোধ নায়িকার মতো যেন প্রথম ফাঁদের ভিতরই পদার্পণ কোরো না।'

বাড়ির সদর দরজার কাছে এসে দুজনে আবার সামনাসামনি হয়ে দাঁড়াল। দুজনেই দুজনের হাত ধরে চেয়ে রইল পরস্পরের মুখের দিকে।

তারপর সন্ধ্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'প্রিয়তম, আমার কেমন ভয় করছে। নিজের জন্যে নয়, তোমার জন্যে। বোধহয় প্রেমের ধরনই এই। বিপদের এই বেড়াজালের ভিতরে রাত আটটা পর্যন্ত তোমাকে আমি না দেখে কেমন করে থাকব?'

অরিন্দম গাঢ় দৃষ্টিতে সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে, 'আমি হচ্ছি দুর্ভেদ্য দুর্গের

চেয়েও নিরাপদ। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী আমার কোষ্ঠী বিচার করে বলেছেন, নব্বই বৎসর বয়সে নিজের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে আমি ত্যাগ করব অন্তিম নিশ্বাস। তারপর তুমি কি মনে করো, তোমার মতন বন্ধুকে লাভ করবার আগে আমি গিয়ে পড়ব বাঘরাজের মালের ভিতরে? নয়, নয়, কখনও নয়!'

তারপর সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তারা আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলে। এই সময়ের মধ্যে তারা যে কী করলে আর কী যে করলে না, সে সংবাদ বাইরে প্রচার করবার দরকার নেই। যাঁরা প্রেমিক, যাঁরা হৃদয় হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁরা অনায়াসেই না বললেও আসল ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারবেন। আর যাঁরা তা পারবেন না, তাঁদের ব্যাখ্যা করে কিছু বলবারও আবশ্যক নেই।

সন্ধ্যা পা চালিয়ে দিলে নিজের বাড়ির দিকে এবং চলতে চলতে ভাবতে লাগল নানাকথা।

তার পিসিমার সম্বন্ধে অরিন্দমবাবুর এতখানি কৌতূহল কেন? তাঁকে কি তিনি সন্দেহ করেন? কিন্তু কী রকম সন্দেহ? তিনি কি মনে করেন তার পিসিমাও এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত আছেন? বাঘরাজ কমলপুরে বিদ্যমান, সে নিজেও কমলপুরের সকলকে চেনে, কিন্তু তাদের মধ্যে বাঘরাজের মতো কোনও লোক থাকতে পারে বলে তার মনে হয় না। তার পিসিমার প্রকৃতিও যথেষ্ট সন্দেহজনক ও রহস্যময়! অতীত জীবনে দেশে দেশে তিনি কেন যে ঘুরে বেড়াতেন, তারও কোনও কারণ আবিষ্কার করা যায় না। নিজের অতীত জীবনের কোনও কথাই তিনি তার কাছে খুলে বলেননি। এক বাড়িতে বাস করেও সে যেন তার পিসিমার কাছ থেকে অনেক তফাতে পড়ে আছে। হয়তো অরিন্দমবাবুর বিশ্বাস, 'বাঘরাজ'—এই ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করে আছেন তার পিসিমা দেবিকাদেবীই।

এই পর্যন্ত ভেবেই সন্ধ্যার বুকের কাছটা কেমন যেন শিউরে উঠল! তবে কি সে বাস করছে বাঘরাজের সঙ্গে এক বাড়িতেই! বিজনবাবু খুব সম্ভব দেবিকাদেবীর আসল গুপ্তকথা জানেন। আর সেই কথা প্রকাশ করে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েই তার পিসিমার কাছ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আদায় করেন।

এইসব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা যখন নিজের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল, তখন তার মন রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছে।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সে বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু দরজা ঠেলে বুঝলে, ভিতর দিক থেকে তা বন্ধ। সন্ধ্যা দরজার উপরে করাঘাত করলে।

ভিতর থেকে দেবিকাদেবীর কর্কশ কণ্ঠে শোনা গেল, 'কে?'

—'আমি সন্ধ্যা।'

দেবিকাদেবী বললেন, 'আমি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত। তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না।'

—'পিসিমা তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

—'এখন আমার কোনও কথা শোনবার সময় নেই। তুমি উপরে নিজের ঘরে যাও। আমার কাজ শেষ হলে পর আমি নিজে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

সন্ধ্যা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এই লুকোচুরির কারণটা কী? কী নিয়ে পিসিমা এতটা ব্যস্ত হয়ে আছেন? তার মন অত্যন্ত কৌতূহলে পূর্ণ হয়ে উঠল, সে পা টিপে টিপে বাড়ির বাইরেকার বাগান দিয়ে বৈঠকখানার জানলাগুলোর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু 'ফ্লোরে'র উপর বৈঠকখানাঘর,

বাগানে দাঁড়িয়ে উঁচু জানলা পর্যন্ত মুখ পৌঁছোয় না। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে শুনতে পেলে, দেবিকাদেবী ও আর-একজন পুরুষমানুষ নিম্নস্বরে কথাবার্তা কইছে।

পুরুষের কণ্ঠস্বর বলছে, 'এই মোড়কের ভিতরে যে গুঁড়ো আছে, তা হচ্ছে নিরাপদ। আজ বৈকালে এই গুঁড়োটা লুকিয়ে তুমি সন্ধ্যার চায়ের পেয়ালায় ফেলে দিয়ো। চা পান করবার পর সে এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে যে, কাল সূর্যোদয়ের আগে আর চোখ খুলতে পারবে না। তুমি তাকে এই ঘরের কোনও সোফার উপরে শুইয়ে রেখো, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যাকে নিয়ে আমি স্থানান্তরে চলে যাব।'

দেবিকাদেবী বললেন, 'ওসব খুনোখুনির ব্যাপারে আমি নেই।'

—'বিশ্বাস করো, সন্ধ্যার মতো সুন্দরী মেয়েকে আমি খুন করব না। কাল সকালে জাগবার পরে কেবল তার মাথাটা খানিকক্ষণ ধরে থাকবে।'

দেবিকাদেবী বললেন, 'শয়তান!'

—'বেশ আমি না হয় শয়তান, কিন্তু তুমি এতটা সাধু হলে কবে থেকে? আমার কাছে তোমার সাধুতার অভিনয় ফলপ্রদ হবে না। এখন যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। সন্ধ্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই।'

—'অসম্ভব।'

—'কেন অসম্ভব? পাত্র হিসাবে আমি কি অযোগ্য? আমি সুচতুর, বিদ্বান, স্বাস্থ্যবান—আর সবচেয়ে যা লোভনীয়, আমি হচ্ছি ধনবান। আমি যৌবনের সীমা পার হয়ে এসেছি বটে, কিন্তু লোকে এখনও আমাকে দেখে যুবক বলেই মনে করে। সন্ধ্যাকে আমি ভালোবাসি, তাই বৃদ্ধ হবার আগে তাকে বিবাহ করতে চাই।'

—'পাগল!'

—'আমাকে পাগল বলছ কেন?'

—'হাঁ, আমি তোমাকে আবার পাগল বলেই ডাকব। এই যে তুমি টাকার এত জাঁক দেখাচ্ছ, তবে তুচ্ছ বিশ হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে বলে এত ইতস্তত করছ কেন?'

—'একটুও ইতস্তত আমি করব না, যদি সন্ধ্যাকে আমার হাতে তুলে দাও। সে সজ্ঞানে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যাবে না, তাই তাকে আমি অজ্ঞান করেই এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।'

—'ও কথা রাখো। তোমরা খেপে খেপে আমার কাছ থেকে কত টাকা আদায় করেছ, তা কি তোমার মনে আছে?'

—'মনে আছে, সব মনে আছে। যখন টাকার দরকার হয়েছিল, তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। এখন সন্ধ্যাকে আমার দরকার হয়েছে, তাই তোমার কাছ থেকে তাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। আপত্তি করবার সাহস তোমার আছে? জানো, আমি যদি মুখ খুলি, তাহলে তোমার অবস্থাটা হবে কী রকম?'

দেবিকা ধীরে ধীরে বললেন, 'জানি না। তবে একথা জানি যে, আজ কয়েক বৎসর ধরে তুমি আমার জীবনকে করে তুলেছ বিষময়। এ জীবন আর আমার সহ্য হচ্ছে না। পুলিশের কাছে তোমার কথা যদি ফাঁস করে দিই, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে।'

লোকটা চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, 'তোমার প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই, এখন আমি উঠলুম। কিন্তু যাবার সময় শেষবারের মতো বলে যাই,—আমার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করলে কিছুতেই তুমি নিস্তার পাবে না। আমি যা আদেশ দিলুম, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন কোরো।' তারপরই ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল।

কে এই আগন্তুক? সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বাড়ির সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং তারপর দেখলে, আগন্তুক এর মধ্যেই দ্রুতপদে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে।

তাকে ভালো করে দেখবার বা চেনবার অবসর সে পেলে না, কারণ সেই মুহূর্তেই দেবিকাদেবীও বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সে স্যাঁৎ করে সরে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। এবং সেইখান থেকেই উঁকি মেরে বিপুল বিস্ময়ে দেখলে, দেবিকার হাতে রয়েছে একটা বন্দুক।

দেবিকা বন্দুকটা তুলে ধরলেন এবং স্থির হস্তে টিপে দিলেন বন্দুকের ঘোড়া।

বন্দুকের গর্জনে সাড়া পড়ে গেল পাখিদের ভিতরে। সন্ধ্যা সভয়ে দেখলে, আগন্তুক টলটলায়মান অবস্থায় ফটক পেরিয়ে কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে লুটিয়ে পড়ল ভূমিতলে।

সমস্ত লুকোচুরি ভুলে সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল দেবিকাদেবীর পাশে। তারপর আর্তস্বরে শুধোলে, 'ও কে পিসিমা? তুমি কী করলে?'

অত্যন্ত সহজ স্বরে দেবিকা বললেন, 'বোধহয় আমি ওকে খুন করতে পেরেছি। তুমি চুপ করে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি দেখে আসি।' তিনি হন হন করে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দেখলেন, মাটির উপরে লম্বমান একটা মূর্তি, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে তার দুটো আড়ষ্ট চোখ!

দেবিকা বন্দুকটা মাটির উপরে স্থাপন করে হেঁট হয়ে মূর্তির বুকের উপরে হাত দিয়ে অনুভব করলেন, তার হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে কি না।

তারপরেই সন্ধ্যা শুনতে পেল নারীকণ্ঠে তীব্র এক আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলে, দেবিকাদেবী দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাতে নিজের মুখ চেপে ধরলেন। সন্ধ্যা বেগে ছুটে গেল ফটকের কাছে—তারপর ভীত চক্ষে দেখতে পেলে, দেবিকার দুই হাতের আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা! সেখানে নেই তৃতীয় ব্যক্তির চিহ্নমাত্র!

দেবিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ও ভান করে মড়ার মতো পড়েছিল। আমি বোকার মতো বন্দুকটা মাটির উপরে রাখতেই সে আমাকে ধরে ফেললে—তার হাতে ছিল একখানা ছোরা!'

রুদ্ধশ্বাসে সন্ধ্যা বললে, 'তারপর?'

দেবিকা মুখের উপর থেকে হাত নামিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখো!'

সন্ধ্যার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে খেলে গেল একটা শিহরন! দেবিকার কপালের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত রয়েছে রক্তে পরিপূর্ণ একটা ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন!

সন্ধ্যা প্রচণ্ড ক্রোধে অভিভূত হয়ে বললে, 'কোন দিকে গেছে সেই পাষণ্ডটা? আমি তাকে দেখতে চাই।'

কিন্তু সে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতেই দেবিকা দৃঢ়মুষ্টিতে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললেন, 'বোকামি কোরো না বাছা! ওর পিছন পিছন যাওয়া মানেই হচ্ছে আত্মহত্যা করা। 'আর কখনও এমন কাজ করবে না'—এই কথা বলতে বলতে সে বেগে ছুটে চলে গিয়েছে।'

—'কে সে?'

—'সবাই তাকে 'বাঘরাজ' বলে জানে! আমার মুখের উপরে রেখে গিয়েছে সে তার থাবার

চিহ্ন! আমি ভগবানের নামে শপথ করছি, দেখে নেব—তাকে আমি দেখে নেবই নেব! তাকে লুটিয়ে পড়তে হবে আমার পায়ের তলায়! ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে, তাকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে আমার কাছে—তাকে—'

—'পিসিমা, পিসিমা—'

ক্রুদ্ধ ও রক্তাক্ত কোনও বন্য জীবের মতো সন্ধ্যার দিকে ফিরে দেবিকা গর্জন করে বলে উঠলেন, 'চলে যাও।'

—'পিসিমা, ওই লোকটাই কি ভয় দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে?'

—'চলে যাও!'

—'ওরই নাম কি বাঘরাজ?'

তীব্রস্বরে দেবিকা বললেন, 'আর আমাকে জ্বালাতন কোরো না! এখান থেকে চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও!'

সন্ধ্যা আর কোনও কথা কইতে ভরসা করলে না।

একাদশ

বাঘের বাচ্চাদের কাণ্ড

সে-রাত্রে আকাশে ছিল সপ্তমীর আধখানা চাঁদ।

ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করে অরিন্দম বললে, 'সমুদ্রের ধারে খোলা জায়গায় সপ্তমীর চাঁদের আলোতেও খানিকটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। সন্ধ্যা, আজ চন্দ্রকেও বন্ধু বলে মনে হচ্ছে না। অন্তত তার মুখে মেঘের ঘোমটা থাকলেও খানিকটা আশ্বস্ত হতুম।'

সন্ধ্যা বললে, 'সাঁতার কেটে আমরা যখন হানাবাড়ির সামনেকার ওই মোটর লঞ্চের কাছে গিয়ে পৌঁছোব, ততক্ষণে চাঁদ বোধহয় মিলিয়ে যাবে।'

তাদের দুজনেরই পরনে তখন কালো রঙের সাঁতারের পোশাক এবং দুজনেরই কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা আছে দুটো 'ওয়াটারপ্রুফ' ব্যাগ।

অরিন্দম বললে, 'ঘড়ির কাঁটা রাত নয়টার কাছাকাছি গিয়েছে। আজ দিনের বেলায় দূরবিন দিয়ে আমি দেখেছি, হানাবাড়ির কাছ থেকে একটা মোটর বোট বারবার ওই মোটর লঞ্চখানার দিকে আনাগোনা করেছে। এর মানে কী জানো সন্ধ্যা? ওরা গুদাম সাবাড় করছে।'

—'গুদাম সাবাড় করছে?'

—'হ্যাঁ, অর্থাৎ বাঘরাজের গুপ্তধন গিয়ে উঠছে মোটর লঞ্চের ভিতরে। আজ রাতেই ওরা বোধ হয় কমলপুরের মায়া ত্যাগ করবে। চলো, আর দেরি করা নয়। রামফল?'

রামফল দরজার কাছেই ছিল, ডাক শুনে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

—'রামফল! রাত বারোটার ভিতরে আমি যদি বাসায় ফিরে না আসি, তাহলে তুমি ডাঃ সেনের কাছে গিয়ে সব খবর দিয়ো!'

—'যে আজ্ঞে।'

অরিন্দম ও সন্ধ্যা বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ি থেকে সমুদ্রের জলের কাছে যেতে গেলে বেশ খানিকটা পথ পার হতে হয়। তারা দুজনে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাদের চলতে হল না। আচম্বিতে একটা আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন এবং আর্তকণ্ঠের চিৎকার শুনে দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা সচমকে বললে, 'কে গুলি ছুড়লে, আর কেই-বা আর্তনাদ করলে অরিন্দমবাবু?'

—'আমিও সেই কথাই ভাবছি সন্ধ্যা! মনে হচ্ছে, শব্দ দুটো এসেছে যেন দূরের ওই বালিয়াড়ির কাছ থেকে। এখানে বাঘরাজের শত্রু আছে মাত্র দুজন—আমি আর ডাঃ সেন। তবে কী—' বলতে বলতে অরিন্দম থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর আবার বললে, 'সন্ধ্যা, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি চুপিচুপি গিয়ে ব্যাপারটা কী দেখে আসি।'

সন্ধ্যা বললে, 'একযাত্রায় পৃথক ফল হয় না বন্ধু! আমিও সঙ্গে যাব।'

অরিন্দম এর মধ্যে বুঝে নিয়েছে সন্ধ্যার আসল প্রকৃতি। যখন গোঁ ধরেছে তখন নিশ্চয়ই সে তার সঙ্গ আজ ছাড়বে না। অতএব তর্কাতর্কি করে সময় না কাটিয়ে সে বললে, 'বেশ, তাহলে এসো। কিন্তু ব্যাগের ভিতর থেকে রিভলভারটা বার করে নাও। আর তোমাকে আসতে হবে আমার পিছনে পিছনে।'

চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে করতে অরিন্দম অগ্রসর হল দ্রুতপদে। কিছুক্ষণ পরেই তারা সেই বালির ঢিপিটার কাছে এসে পড়ল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ভালো করে নজর চলে না বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সেখানে নেই জনপ্রাণীর অস্তিত্ব।

কিন্তু সেখানে ছিল একটা সন্দেহজনক ঝোপ। অরিন্দম নিজের রিভলভার প্রস্তুত রেখে সেই ঝোপের ভিতরটা একবার পর্যবেক্ষণ করতে গেল।

সে যখন ঝোপের খুব কাছে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ ঝোপটা দুলে দুলে উঠল! অরিন্দম কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'কে আছ ঝোপের ভিতরে? বেরিয়ে এসো। নইলে এখনই আমি গুলি ছুড়ব।'

হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, 'বটে, বটে, বটে! আর গুলি ছুড়ো না বাবা, আমি গুলিখোর নই—আমার পক্ষে একটা গুলিই যথেষ্ট!' বলতে বলতে ঝোপের ভিতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল এক মূর্তি।

সন্ধ্যা বলে উঠল, 'কে আপনি? গলা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি আমাদের মোহনলালবাবু।'

মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, 'ঠিক ধরেছ, ঠিক ধরেছ! মনে হচ্ছে আমি যেন সন্ধ্যার সঙ্গেই কথা কইছি।'

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনলালবাবু, এখানে গুলি ছুড়লে কে? আর চেঁচিয়েই বা উঠল কে?'

মোহনলাল একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'গুলি ছুড়েছিল কে, তা আমি শপথ করে বলতে পারব না। তবে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম যে আমি, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারি।'

—'চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আপনি?'

—'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! গুলি খেলে মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চেঁচিয়ে উঠতে বাধ্য হয়।'

—'আপনি কি আহত?'

—'কতকটা তাই বটে। গুলি খেয়ে প্রথমটা আমি আচ্ছন্নের মতন হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু এখন সে-ভাবটা সামলে নিতে পেরেছি।'

—'কিন্তু এ কীর্তি কার? বাঘরাজের?'

—'তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে বাঘরাজের নাম তুমিও শুনেছ? বেশ, বেশ, বেশ! তবে হলপ করে বলতে পারি, বাঘরাজ আমাকে মারবার জন্যে রিভলভার ছোড়েনি। নিশ্চয়ই এ তার চ্যালা-চামুণ্ডার কাজ! তাদের আমি দেখতেও পেয়েছি—দুজন লোক। কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় তাদের চিনতে পারিনি।'

অরিন্দম শুধোলে, 'লোকদুটো গেল কোন দিকে?'

—'লম্বা দৌড় মারলে ওই হানাবাড়ির দিকে।'

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনলালবাবু, দেখি আপনার কোথায় লেগেছে? এ কী! ঝাপসা আলোয় এতক্ষণ দেখতে পাইনি, আপনার মাথার উপর থেকে মুখ বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে যে!'

মোহনলাল বললে, 'এ নিয়ে তুমি বেশি মাথা ঘামিয়ো না সন্ধ্যা। গুলিটা আমার মাথার ওপরটা অল্প একটু ছুঁয়ে চলে গিয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলুম, আমার খুলিটাই বুঝি ফট করে ফেটে গেল, কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছি আমার খুলির সঙ্গে গুলির সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি।'

অরিন্দম বললে, 'মোহনলালবাবু, এইখানে বসে পড়ুন। আপনার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই।'

মোহনলালের কোনও আপত্তিই সে শুনলে না, জোর করে তাকে সেখানে বসিয়ে তার মাথায় বেঁধে দিলে ব্যান্ডেজ। যে কাজে সে আজ বেরিয়েছে, যে-কোনও মুহূর্তে অনেক কিছুরই দরকার হতে পারে। তার ব্যাগের ভিতরে ছিল দরকারি সব সরঞ্জামই।

মোহনলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বড়োই মজার কথা, বড়োই মজার কথা!'

সন্ধ্যা বললে, 'এই আবার আপনি ভাঁড়ের মতো কথা কইতে শুরু করলেন। মজার কথা আবার কী?'

মোহনলাল সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'বলো কী, বলো কী? মজার কথা নয়? চোখের সামনে আমি কী দেখছি! বাবু অরিন্দম আর বিবি সন্ধ্যা অঙ্গে ধারণ করেছেন সাঁতারের পোশাক! আজব ব্যাপার আজব ব্যাপার! বাংলা দেশের শ্রীমান আর শ্রীমতীরা আজকাল কি বিলাতের সায়েব-মেমের মতো সাঁতারের পোশাক পরে জলবিহার করতে যায়! আমি তো বিলাতেও গিয়েছি। কিন্তু সেখানেও সায়েব-মেমদের তো এমন অসময়ে সমুদ্রযাত্রা করতে দেখিনি! বেশ, যান অরিন্দমবাবু। কিন্তু খুব সাবধান, ওই হানাবাড়ির সামনেকার সমুদ্রের জল বিভীষিকাময়! লোকে বলে, রাত্রে ওখানে শ্রীযুক্ত প্রেত আর শ্রীযুক্তা প্রেতিনির দল জলকেলি করে বেড়ায়। কিন্তু সবই হচ্ছে আজব ব্যাপার, আজব ব্যাপার! অতঃপর আমি নিজের বাড়ির দিকে ধাবমান হলুম—নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার!' বলতে বলতে সেখান থেকে সে হন হন করে চলে গেল।

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনলালবাবু ভাঁড়ামি করেন বটে, তবে মানুষ হিসাবে উনি মন্দ লোক নন। কিন্তু এই অসময়ে উনি এখানে এসেছিলেন কেন? আর কেনই বা উনি আক্রান্ত হলেন?'

অরিন্দম বললে, 'বাঘরাজের জন্যে ওঁর মনেও কৌতূহল জেগেছে বোধহয়। কানাঘুষোয় সম্ভবত উনি কোনও কোনও কথা শুনেছেন। উনি মদনলালের নিজের ভাই না হলেও তাঁর সঙ্গে এক-বাড়িতেই থাকেন। হয়তো দৈবগতিকে উনি কোনও গোপনীয় খবর জানতে পেরেছেন। এখানে ওই রহস্যময় মোটর-লঞ্চখানার আকস্মিক উপস্থিতির কারণও উনি জেনে ফেলেছেন দৈবগতিকে। তাই নির্বোধের

মতো শখের গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে হানাবাড়ির দিকে যাত্রা করেছিলেন। বাঘরাজ যে এখানে আনাচে-কানাচে প্রহরী মোতায়েন করে রেখেছে এতটা উনি আন্দাজ করতে পারেননি। ফলে রহস্যের চাবি খোঁজবার জন্যে সন্তর্পণে মোহনলালবাবুর এদিকে আগমন, আর সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের উত্তপ্ত গুলি-ভক্ষণ! আমি এইটুকু পর্যন্ত অনুমান করতে পেরেছি, কিন্তু এসব ভেবে এখন আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি পদচালনা করো, আমাদের এখন অগাধ জলে সাঁতার কাটতে হবে।'

দ্বাদশ

কে বাঘরাজ?

সমুদ্রের ঢেউরা তখন আধা-চাঁদের আলোয় রচনা করছিল মানিকমালা। জল-জগতে বসেছে গানের জলসা, জলতরঙ্গ সংগীতে মুখরিত হয়ে উঠছে ছন্দে ছন্দে মধুর আনন্দ। মানুষের পৃথিবী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে পরম শান্তির কোলে। সেইসব দেখতে দেখতে এবং শুনতে শুনতে সমুদ্রের তরঙ্গবহুল আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করলে অরিন্দম ও সন্ধ্যা।

প্রথম খানিকক্ষণ তারা কেউ কারুর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করলে না। তারপর অরিন্দম শুধোলে, 'সন্ধ্যা, কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?'

সন্ধ্যা বললে, 'কষ্ট নয় অরিন্দমবাবু, আপনার প্রশ্ন শুনে আমার রাগ হচ্ছে। আগেই তো বলেছি, আমি হচ্ছি জলের পোকা, সাঁতার দিয়ে দশ-বারো মাইল অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারি। ওরকম বাজে প্রশ্ন আর করবেন না।'

অরিন্দম হেসে বললে, 'বেশ, তা আর করব না। তবে তোমাকে আমি জলের পোকা বলে ভাবতে পারব না। বরং আমি তোমাকে 'মার-মেড' অর্থাৎ মৎস্যনারী বলে ডাকতে পারি। তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

সন্ধ্যা কোনও উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ডুব মেরে জলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে অরিন্দমকে ছাড়িয়ে খানিক তফাতে গিয়ে আবার ভেসে উঠল জলের উপরে।

অরিন্দম বললে, 'সন্ধ্যা, নিরস্ত হও। আজ আমরা সাঁতার প্রতিযোগিতায় আসিনি। তুমি একলা বেশি দূর এগিয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমাদের যেতে হবে একসঙ্গেই, দরকার হলে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব।'

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবতার ভিতর দিয়ে। তাদের চারিদিকে তখন তরঙ্গ-দলের কলরব ছাড়া শোনা যাচ্ছে না আর কোনও রকম ধ্বনি।

পাশাপাশি ভেসে যেতে যেতে অরিন্দম বললে, 'আমরা মোটর লঞ্চের খুব কাছে এসে পড়েছি। লঞ্চের ভিতরে আলো জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছ তো?'

—'হ্যাঁ অরিন্দমবাবু। কিন্তু হানাবাড়ির দিকে চেয়ে দেখুন। বাড়িখানা খুব অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার কোথাও আলো জ্বলছে না।'

—'তার মানে, বাড়ির সবাই এখন লঞ্চের উপরে এসে উঠেছে। ওদের তোড়জোড় সব বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কোনও কথা নয়।'

দুজনে সাঁতার কাটতে লাগল আবার মৌনমুখে। সন্তরণে সন্ধ্যার নিপুণতা দেখে অরিন্দম মনে

মনে বিস্ময় অনুভব করলে। সে যেন বিনা চেষ্টায় জলচর প্রাণীর মতো স্বাভাবিকভাবেই জল কেটে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে!

অরিন্দম সন্ধ্যার কানে কানে বললে, 'বন্ধু, তুমি আমার চেয়েও ভালো সাঁতারু।'

সন্ধ্যা বললে, 'অভিনন্দনের জন্যে ধন্যবাদ! কিন্তু আমরা লঞ্চের খুব কাছেই এসে পড়েছি। একটা আলোর সামনে দিয়ে একটা মূর্তি এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। হয়তো লঞ্চের উপরে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে।'

—'হতেও পারে। আর-একটু এগিয়েই আমাদের আরও হুঁশিয়ার হতে হবে। তারপর গোটা-কয়েক ডুব সাঁতার দিয়ে আমাদের পৌঁছোতে হবে একেবারে লঞ্চের পাশে।'

আর কিছুক্ষণ পরেই তারা গিয়ে হাজির হল যথাস্থানে।

চাঁদ তখন বিদায় নিয়েছে। চারিদিকে দুলছে অন্ধকারের যবনিকা। এবং সেই যবনিকা ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসছে লঞ্চের কয়েকটা আলোর শিখা। সেখানেও জলকল্লোল ছাড়া পাওয়া যায় না জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ।

সন্ধ্যার কানে কানে অরিন্দম বললে, 'এরকম স্তব্ধতা অস্বাভাবিক। বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানি এর মধ্যেই কি নিদ্রাদেবীর আশ্রয়গ্রহণ করেছে? মোটর লঞ্চখানা আজ রাত্রে কি এইখানেই অবস্থান করবে? এই দুটো প্রশ্নেরই কোনও সঙ্গত উত্তর মনে আসছে না।'

অরিন্দমের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা বললে, 'হয়তো তারা এখানে আসেনি, কমলপুরেই আছে।'

—'কিন্তু তুমি মোহনলালবাবুর মুখেই শুনলে তো তাঁর উপরে গুলিবৃষ্টি করে দুটো লোক এইদিকেই ছুটে এসেছে। আর লঞ্চের ভিতরে কেউ যে এখনও জেগে চলাফেরা করছে এটাও তো একটু আগে তুমি নিজের চোখেই দেখেছ।'

—'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না অরিন্দমবাবু।'

—'আর কিছুই বোঝবার দরকার নেই। আমরা যে-কোনও বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। এখন লঞ্চের উপরে ওঠা নিয়েই কথা। কিন্তু এখানে উপরে ওঠবার কোনও অবলম্বনই খুঁজে পাচ্ছি না। লঞ্চের পিছন দিকে চলো, সেখানে একখানা 'জলিবোট' বাঁধা থাকলেও থাকতে পারে।'

অরিন্দমের অনুমান মিথ্যা নয়। লঞ্চের পিছন দিকে বাঁধা ছিল একখানা 'জলিবোট'। দুজনেই তার উপরে উঠে বসল। তারপর সেখান থেকে লঞ্চের উপরে গিয়ে উঠতে তাদের কোনওই বেগ পেতে হল না। সেখানে একটা আলো জ্বলছিল। দুজনেই এদিকে-ওদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বুঝলে, তাদের সাদরে বা অনাদরে অভ্যর্থনা করতে পারে এমন কোনও লোকই সেখানে হাজির নেই। এ যেন জনশূন্য জলযান! এই বিজনতা সন্দেহজনক বলে মনে হয়।

তারা আপন আপন রিভলভার বাগিয়ে ধরে পা টিপে টিপে অগ্রসর হল। ডান দিকের রেলিং ও বাঁ দিকের কেবিনের মাঝখানের পথ দিয়ে তারা খুব ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। সেখানে কোনও আলো নেই, এবং আকাশের আবছায়ামাখা আলোতে যেটুকু দেখা গেল, সেখানেও কোনও মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

প্রথমেই বাঁ দিকে যে-ঘরটা পাওয়া গেল, তার দরজাটা খোলা। বাহির থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালনা করেও অরিন্দম ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না। একটু পরেই আর একটা ঘরের

---

* তখনও বাজারে হাজার টাকার নোট চলতি ছিল।

ভিতর থেকে উজ্জ্বল আলোর একটা আভাস এসে পড়েছে বাইরের দিকে। হয়তো ওই ঘরে কারুর দেখা পাওয়া যাবে মনে করে সন্ধ্যার হাত ধরে অরিন্দম আবার অগ্রসর হল।

কিন্তু দুই পা এগুতে না এগুতেই অত্যন্ত অতর্কিতে কারা এসে তাদের উপরে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাধা দেবার জন্যে অরিন্দম কোনও চেষ্টা করবার আগেই তারা কঠিন ভাবে তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে। সন্ধ্যাকেও দুই দিক থেকে চেপে ধরলে দুজন লোক। পরমুহূর্তে সেখানটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সমুজ্জ্বল আলোকে।

ভূপতিত অবস্থাতেই অরিন্দম দেখলে, অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে দুজন লোক। তারা হচ্ছে বিজনকুমার এবং মদনলাল।

অরিন্দমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিজন হুকুম দিলে, 'ওর হাত পা সব ভালো করে বেঁধে ফ্যালো, যেন একটুও নড়তে না পারে। ওদের অস্ত্র শস্ত্র সব কেড়ে নাও। সন্ধ্যাকে বাঁধতে হবে না, দুজনে ওর দু-হাত চেপে ধরে থাকো। তারপর ওদের নিয়ে এসো আমার কামরায়। এসো মদনলাল।' তারা দুজনে সেখান থেকে চলে গেল।

অরিন্দমের সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলে চারজন লোক তাকে কাঁধে করে তুলে ধরে এগিয়ে চলল। তার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা, তারও দুই দিকে দুজন লোক।

তারপর একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে তারা অরিন্দমকে মেঝের উপরে শুইয়ে দিলে, এবং সন্ধ্যাকেও দাঁড় করিয়ে দিলে ঘরের এক কোণে।

একটা বেতের টেবিলের সামনে দু-খানা চেয়ারের উপরে বসেছিল বিজন ও মদনলাল।

টেবিলের উপরে রক্ষিত চুরোটের বাক্স থেকে সযত্নে একটা সিগার বেছে নিয়ে বিজন মহা-কৌতুকে হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর সে হাসি থামিয়ে বললে, 'ওহে অরিন্দম, তুমি হচ্ছ বেলেখেলার খেলোয়াড়। তুমি যে আজ রাত্রে এখানে হানা দিতে আসবে, সেটা আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পেরেছিলুম। এই যে আজকে এখানে মোটর লঞ্চের আবির্ভাব, আর হানাবাড়ি থেকে এখানে বারবার মোটর বোটের আনাগোনা, এসব হচ্ছে টোপ। আমরা জানতুম, এই দৃশ্য তোমার নজর এড়াবে না, আর তারপরেই তুমি আবার হবে আমাদের অনাহূত অতিথি। এতটু আন্দাজ করবার মতন বুদ্ধি আমাদের আছে। আর আমাদের আন্দাজ যে মিথ্যে নয়, এখনই তো হাতেনাতে তা প্রমাণিত হয়ে গেল।'

অরিন্দম একটুও দমলে না, বেশ প্রফুল্লভাবেই বললে, 'তারপর রায়বাহাদুর, তারপর? তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে?'

বিজন বললে, 'কিন্তু সন্ধ্যা যে তোমার সঙ্গিনী হয়ে এত সহজে আমার হাতের মুঠোর ভেতরে আসবে, এটা অবশ্য আমি অনুমান করতে পারিনি। আজ দেখছি আমার বরাত খুব ভালো। একসঙ্গে শত্রুনিপাত আর পত্নীলাভ।'

সকৌতুকে হেসে উঠে অরিন্দম বললে, 'তুমি কি ভাবো রায়বাহাদুর, তোমার আজকের এই বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যা তোমার গলায় সাগ্রহে পরিয়ে দেবে বরমাল্য?'

—'সে-কথা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, এখন তুমি নিজের চরকায় তেল দেবার চেষ্টা করো। এখানে এসেছে তোমার জীবন্ত দেহ। কিন্তু একটু পরেই এখান থেকে সমুদ্রের ভিতরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে তোমার মৃতদেহটাকেই।'

কামরার দেওয়ালে একটা ঘড়ি ছিল, অরিন্দম সেইদিকে দৃষ্টিপাত করলে। রাত বারোটা বাজতে

এখনও আধঘণ্টা দেরি। কথা আছে, রাত বারোটার সময় সে বাসায় গিয়ে হাজির না হলে রামফল যাবে ডাঃ সেনকে সব খবর জানাতে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে ডাঃ সেন এখানে যে রাত একটার আগে হাজির হতে পারবেন, এমন মনে হয় না। সুতরাং এখনও বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাজে কথা কয়ে সময় কাটানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

সে বললে, 'আমাকে এমন করে শুইয়ে না রেখে বসিয়ে দিতে আপত্তি আছে কী?'

বিজন তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'কোনও আপত্তিই নেই, তুমি এখন একটি নির্বিষ সর্প ছাড়া আর কিছুই নও।' তার ইঙ্গিতে দুজন লোক এগিয়ে এসে অরিন্দমকে দেওয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে।

দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে অরিন্দম বললে, 'সবই তো বুঝলুম। বাঘের বাচ্চাদেরও দেখছি। কিন্তু চোখের সুমুখ থেকে স্বয়ং বাঘরাজ এখনও অদৃশ্য হয়ে আছেন কেন?'

আবার হা হা করে হেসে উঠে বিজন বললে, 'বাঘরাজ, বাঘরাজ! তুমি বাঘরাজকে দেখতে চাও? বাঘরাজ হচ্ছি আমিই!'

অরিন্দম মুখ টিপে হেসে বললে, 'রায়বাহাদুর, তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম প্রেমালাপ হয়, সেদিন তুমি যে বাঘরাজের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে, সে কথা আমি এর মধ্যেই ভুলে যাইনি।'

বিজন বললে, 'ওহে নির্বোধ, তোমার কাছে যে অত সহজে ধরা দেব, তেমন গাড়ল আমি নই। তোমার চোখে ধুলো দেবার জন্যেই আমি গিয়েছিলুম ঘরের বাইরে। আমিই হচ্ছি বাঘরাজ।'

সন্ধ্যা বললে, 'যাকে দেখলে নেংটি ইঁদুর বলে মনে হয়, সেইই নিজের নাম রেখেছে বাঘরাজ? একথা শুনলে বনের যে-কোনও বাঘ লজ্জায় ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে।'

বিজন মুখভঙ্গি করে বললে, 'সবুর করো সন্ধ্যা, সবুর করো। তোমাকে শায়েস্তা করবার মন্ত্র আমার জানা আছে।'

সন্ধ্যা বললে, 'আমাকে শায়েস্তা করবে তুমি, একথা শুনেও আমার হাসি পাচ্ছে!'

বিজন উত্তরে কী বলতে যাচ্ছিল, মদনলাল বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তোমাদের এই প্রেমের কলহ এখন বন্ধ করো। রাত ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্পত্তি এখন লঞ্চের ভিতরে এসেছে। আমাদের গুপ্তকথা যারা জানে, তারাও আমাদের বন্দি হয়েছে। অতঃপর আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, অরিন্দমের মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করা। কিন্তু—'

অরিন্দম বললে, 'প্রিয় মদনলাল, আমার মুখ বন্ধ করলেও তোমরা নিষ্কৃতি পাবে না। তোমাদের অধিকাংশ গুপ্তকথা যে জানে, এমন আর-একজন লোকও কমলপুরে বাস করে।'

মদনলাল চমকে উঠে বললে, 'তার মানে?'

বিজন হঠাৎ চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, 'তুমি কার কথা বলছ? দেবিকাদেবী? মোটেই নয়! আমাদের আসল গুপ্তকথা দেবিকাদেবী কিছুই জানেন না।'

ঘড়ির দিকে চেয়ে অরিন্দম বললে, 'ওটা তোমার কথার কথা। দেবিকাদেবী তোমাদের অনেক খবরই রাখেন। কিন্তু আমি দেবিকাদেবীর কথা বলছি না।'

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বিজন ও মদনলাল একসঙ্গে বলে উঠল, 'তবে?'

—'আমি বলছি ডাঃ সেনের কথা।'

মদনলাল অট্টহাসি হেসে উঠল এবং বিজনকুমারও হাসতে হাসতে প্রায় চেয়ারের উপরে গড়িয়ে পড়ল।

মদনলাল বললে, 'সেই মাথাপাগলা ডাঃ সেন? যে ঝোপে-ঝাপে প্রজাপতি খুঁজে খুঁজে বেড়ায়?'

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বিজন বললে, 'অরিন্দম, আমি ভেবেছিলুম আজ গুলি করে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব, কিন্তু এখন দেখছি তোমার কথা শুনে হেসে হেসে নিজেই আমি খুন হব।'

অরিন্দম বললে, 'তুমি যদি বাঘরাজ হও, তাহলে তোমার বুদ্ধির ঘটে মা ভবানী বিরাজ করছেন কেন? ডাঃ সেন কে, তাও তুমি জানো না?'

বিজন বললে, 'নিশ্চয়ই জানি। সে হচ্ছে একটা কেঁচোর মতো নিরাপদ প্রাণী!'

অরিন্দম হাসতে হাসতে বললে, 'আজ পর্যন্ত তোমাদের এই অজ্ঞতা দেখে বেশ বুঝতে পারছি, ডাঃ সেন নিজের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। ডাঃ সেন যে কে, তা জানো? তাঁর আসল নাম আমি প্রকাশ করতে চাই না, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ।'

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে তুলে বিজন বললে, 'ডাঃ সেন ডিটেকটিভ!'

—'হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন পুলিশের একজন করিৎকর্মা অফিসার। তিনি ছদ্মবেশে কমলপুরে এসে বাস করছেন তোমাদের জন্যেই। আমি এখানে আসবার আগেই তাঁর কাছে তোমাদের সব খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাকে হত্যা করলেও তোমরা তাঁর হতে থেকে নিস্তার পাবে না। এতক্ষণে বোধহয় পুলিশবাহিনী তৈরি হচ্ছে, জলপথে এখান দিয়ে পালালেও তোমরা আর পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পাবে না। কারণ, বেশিদূর যেতে না যেতেই এই জলপথেই তোমরা ধরা পড়বে সদলবলে।'

বিজন এবং মদনলালের মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। তারা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতো।

তারপর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারটা ভস্মাধারের মধ্যে নিক্ষেপ করে হঠাৎ বিজন বললে, 'মদন, বাইরে চলো, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।' বাইরে বেরিয়ে গেল তারা দুজনে।

অরিন্দম একবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে নিলে। সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, এই অসহায় অবস্থায় তার কিছুই করবার শক্তি নেই, তার উপরে চারজন লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে তার প্রত্যেক ভাব ও ভঙ্গি।

ঘরের আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যা। যদিও এরা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেনি, কিন্তু তার এক একখানা হাত ধরে দুইপাশে দাঁড়িয়ে আছে দুইজন লোক।

সন্ধ্যা বললে, 'অরিন্দমবাবু আপনি—'

একজন লোক বাধা দিয়ে কর্কশ স্বরে বললে, 'চুপ! রায়বাহাদুরবাবু যতক্ষণ বাইরে থাকবেন, ততক্ষণ তোমরা কেউ একটাও কথা কইতে পারবে না।'

খানিকক্ষণ পরে বিজন ও তার পিছনে পিছনে মদনলাল ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

বিজন বললে, 'অরিন্দম, আমরা পরামর্শ করে বুঝলুম, তোমার আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা উচিত নয়।'

অরিন্দম হাসিমুখে বললে, 'সাধু, সাধু!'

—'এখন কী ভাবে তুমি মরতে চাও বলো দেখি? ছোরার আঘাতে, না রিভলভারের গুলিতে, না ওই হাত পা বাঁধা অবস্থায় তোমাকে সমুদ্রের ভিতরে নিক্ষেপ করা হবে?'

সন্ধ্যা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, 'কাপুরুষ!'

বিজন একবার হা হা করে হেসে উঠল। তারপর বললে, 'সুন্দরী সন্ধ্যা, তুমি যদি আমাকে আরও দু-চারটে বাছা বাছা গালাগাল দিতে চাও, তাহলেও আমি আপত্তি করব না। ফাঁসির আগেও

অপরাধীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। তুমি ফাঁসি যাবে না বটে, কিন্তু তুমিও আর বাঁচবে না। তোমাকে বিবাহ করবার সুযোগও আমাকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হচ্ছে। পুলিশ যখন খবর পেয়েছে, তখন আমাদের নিজেদের মাথার উপরেও যে খাঁড়া ঝুলছে, এটা বেশ বুঝতে পারছি। মঞ্চের উপরে তোমার উপস্থিতি হবে আমাদের পক্ষে একেবারেই মারাত্মক।'

সন্ধ্যা দীপ্তচক্ষে বললে, 'নরকের কীট, আমি তোদের ভয় করি না।'

বিজন তার লোকজনদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'অরিন্দমকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ওর গায়ে খুব একটা ভারী জিনিস বেঁধে ওকে সমুদ্রের ভিতরে ফেলে দাও। সন্ধ্যাকেও ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঠিক ওই ভাবেই সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দাও। বাইরের কোনও লোক লঞ্চে উঠেও যেন ওদের কোনও চিহ্নই দেখতে না পায়।'

মদনলাল বললে, 'তাহলে আমি গিয়ে লঞ্চখানার নোঙর তুলে নিতে বলি? আর এখানে থাকবার দরকার কী?'

বিজন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। মদনলাল দরজার দিকে অগ্রসর হল। চারজন লোক ধরাধরি করে অরিন্দমকে মেঝের উপর থেকে টেনে তুললে।

ঠিক সেই সময়ে জোরে জোরে পা ফেলে, সকলকে অবাক করে দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে মোহনলাল। তার দুই হাতে দুটো রিভলভার!

মোহনলাল বললে, 'হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছ কী? রায়বাহাদুর, তোমার গুপ্তঘাতকের গুলিতে বাঘরাজ মরেনি। আমি তার প্রেতাত্মা নই, আমি হচ্ছি জীবন্ত বাঘরাজ!'

ত্রয়োদশ

তারপর?

বাঘরাজ বললে, 'অরিন্দমবাবু, শেষ পর্যন্ত আপনারই জয়! হয়তো ভগবানের ইচ্ছাই তাই। আপনার উপরে আমার আর কোনও রাগ নেই। হয়তো আমি জিতলেও জিততে পারতুম, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে আমাকে আজ পরাজয় স্বীকার করতে হল! আর আমার যুদ্ধ করবার ক্ষমতা নেই—অদৃষ্ট আমার বিরুদ্ধে। এখন আমি শ্রান্ত, বড়োই শ্রান্ত!'

অরিন্দম বললে, 'মোহনলালবাবু, আমাকে কি এইরকম হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই আপনার কথা শুনতে হবে?'

বাঘরাজ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, 'উত্তেজিত হয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলুম, আমাকে মার্জনা করবেন।' তারপর গলা তুলে বললে, 'অরিন্দমবাবুর হাত-পায়ের দড়ি এখনই কেটে দেওয়া হোক। এ ঘরে থাকব খালি আমরা চারজন—অরিন্দমবাবু, সন্ধ্যা, বিজন আর আমার স্নেহশীল দাদা মদনলাল। বাকি সবাই এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

নীরবে তার আজ্ঞা পালন করে, অরিন্দমের বন্ধনরজ্জু কেটে দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলে বাকি লোকগুলো।

বাঘরাজ বললে, 'অরিন্দমবাবু, এ জীবনে সাধুতার জন্যে গর্ব করবার সৌভাগ্য আমার হবে না। কিন্তু এই যে বিজন আর মদন, এরা হচ্ছে আমার চেয়েও পাপাত্মা। নরকেও ওদের স্থান নেই! ওরা

ছিল আমার হাতের খেলার পুতুল। কিন্তু খেলার পুতুলরাও আজ খেলোয়াড়ের চেয়ে প্রধান হয়ে উঠতে চায়। আমার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্যে, ওরা আজ আমাকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওদের বধ করবার জন্যেই ভগবান আজ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। খুব সংক্ষেপে এই হল আমার কাহিনি। সন্ধ্যা, আমি তোমাকে ভালোবাসতুম। কিন্তু এখন বুঝছি তোমার যোগ্য পাত্র হচ্ছেন অরিন্দমবাবুই। আশা করি ওঁকে নিয়ে তুমি জীবনে সুখী হতে পারবে। আমি জানি, ওঁর লোভ আছে জলের ভিতর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া আমার সোনার থানগুলোর উপরে। ওঁকে আমি হতাশ করব না। তোমার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সেই সোনার থানগুলো আমি পাঠিয়ে দেব যথাস্থানে যথাসময়ে। অরিন্দমবাবু, আপনার বাগদত্তা বধূকে নিয়ে আপনি অনায়াসেই বাইরে যেতে পারেন। তারপর 'জলিবোটে' করে তীরে গিয়ে পৌঁছোতে আপনার বেশি দেরি লাগবে না। এখন শেষ হিসাব-নিকাশ করবার জন্যে আমাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। নমস্কার অরিন্দমবাবু! আর সন্ধ্যা, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি! হ্যাঁ, আর একটা কথাও জেনে যাও, বাড়িতে গিয়ে তোমার পিসিমাকে আর দেখতে পাবে না। যাকে তুমি পিসি বলে জানো, সে নারী নয়, পুরুষ! তার উপাধি বটব্যাল, আর ডাকনাম হচ্ছে 'রাজা'! যখন কাশীধামে সত্যিকার দেবিকাদেবী হঠাৎ মারা যান, তখন এই 'রাজা' বা বটব্যাল তার বাসাতেই ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিল। তোমার পিসি যে দিন মারা যান, ঠিক তার পরদিনেই তোমার বাবাও পরলোকে গমন করেন। দেবিকাদেবীকে তোমার সম্পত্তির 'অছি' করা হয়েছে শুনে সে আবার ছদ্মবেশ গ্রহণ করে তোমার পিসি সেজে কমলপুরে এসে হাজির হয়! 'রাজা'র কেবল অদ্ভুত ছদ্মবেশ গ্রহণ করার শক্তিই ছিল না, জাল জালিয়াতিতেও তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে দেবিকাদেবীর হাতের লেখা পর্যন্ত অবিকল নকল করতে পারে। 'রাজা'র গুপ্তকথা জানতুম আমি আর বিজন। সেই গুপ্তকথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে দেবিকার বেশধারী 'রাজা'র কাছ থেকে আমরা অনেক টাকা আদায় করেছি। আসলে আমরা নিয়েছি তোমার টাকাই। সে জন্যেও তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমার বিবাহে যে যৌতুক দিতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্তের মতো।'

সন্ধ্যা অত্যন্ত অভিভূতের মতো বললে, 'আমার পিসিমাকে—না সেই 'রাজা'কে আর দেখতে পাব না কেন?'

বাঘরাজ বললে, 'এখানে আসবার আগে 'রাজা'কে জানিয়ে দিয়ে এসেছি, আজ আমি হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ভেঙে দেব। কিন্তু এখন তোমরা এখান থেকে যাও, আমার হাতে অনেক কাজ।'

অরিন্দম বললে, 'মোহনলালবাবু, এর পরে আমার আর কোনওই বক্তব্য নেই। এখন 'শ্রীমতী'কে উদ্ধার করেই আমি এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করছি।' সে ঘরের কামরার এক কোণে ছুটে গেল। সেইখানেই মেঝের উপরে পড়ে ছিল কোষবদ্ধ 'শ্রীমতী'। তাকে তুলে নিয়ে সে আবার সন্ধ্যার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে বললে, 'নমস্কার, মোহনলালবাবু।'

ললাটের উপরে দুই হাত তুলে বাঘরাজও বললে, 'নমস্কার, অরিন্দমবাবু!'

দ্রুম, দ্রুম!

দুই হাত শূন্যে ছড়িয়ে বাঘরাজ চিত হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বক্ষ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এল রাঙা রক্তের ধারা! যে সময়ে বাঘরাজ দুই হাত কপালে ছুঁইয়ে অরিন্দমকে নমস্কার করছিল, সেই সুযোগ গ্রহণ করে বিজন তাকে গুলি করেছে।

চোখের পলক ফেলবার আগেই অরিন্দম ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, বিজন আবার রিভলভার

তোলবার উপক্রম করছে। কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে কোষ থেকে নির্গত হল 'শ্রীমতী' এবং চকমকিয়ে বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে বিদ্ধ হল বিজনের দক্ষিণ বাহুর মধ্যে! বিজন আর্তনাদ করে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে মেঝের উপরে পড়ে গেল রিভলভারটা। অরিন্দম একলাফে এগিয়ে গিয়ে রিভলভারটাকে মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে আবার বিজনের দিকে লক্ষ্যস্থির করলে।

ঠিক পরমুহূর্তেই, কেউ কোনও কথা কইবার আগেই বাইরে শোনা গেল তুমুল কোলাহল! চিৎকার উঠল—'পুলিশ! পুলিশ!' চারিদিকে শোনা গেল অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ।

দরজার কাছে আবির্ভূত হল একটা মূর্তি। আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'পুলিশের অনেকগুলো নৌকো এসে চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

তারপরেই সবাই শুনতে পেলে, একদল লোকের জুতোপরা ভারী ভারী পায়ের শব্দ এইদিকেই এগিয়ে আসছে।

দরজার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রথম মূর্তিটা। সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে আবির্ভূত হল একজোড়া লোক—ডাঃ সেন এবং রামফল!

মেঝের দিকে তাকিয়ে মহা বিস্ময়ে ডাঃ সেন বলে উঠলেন, 'এ কার মৃতদেহ? মোহনলালবাবুর?'

—'মোহনলালবাবু নয় মিঃ সেন, বাঘরাজ! কিন্তু বাঘরাজের আগে যাদের মরা উচিত ছিল, তারা এখনও এই পৃথিবীতে সশরীরেই বর্তমান!' অরিন্দম অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিলে বিজন আর মদনলালকে।

তারা সশরীরে বর্তমান বটে, কিন্তু তাদের মুখ হচ্ছে মড়ার মতো সাদা!

তার পরের দৃশ্য বর্ণনা করবার দরকার নেই; বুদ্ধিমান পাঠকরা তা অনুমান করে নিতে পারবেন অনায়াসেই।*

---

*আংশিক ভাবে পাশ্চাত্য আখ্যান অবলম্বনে।